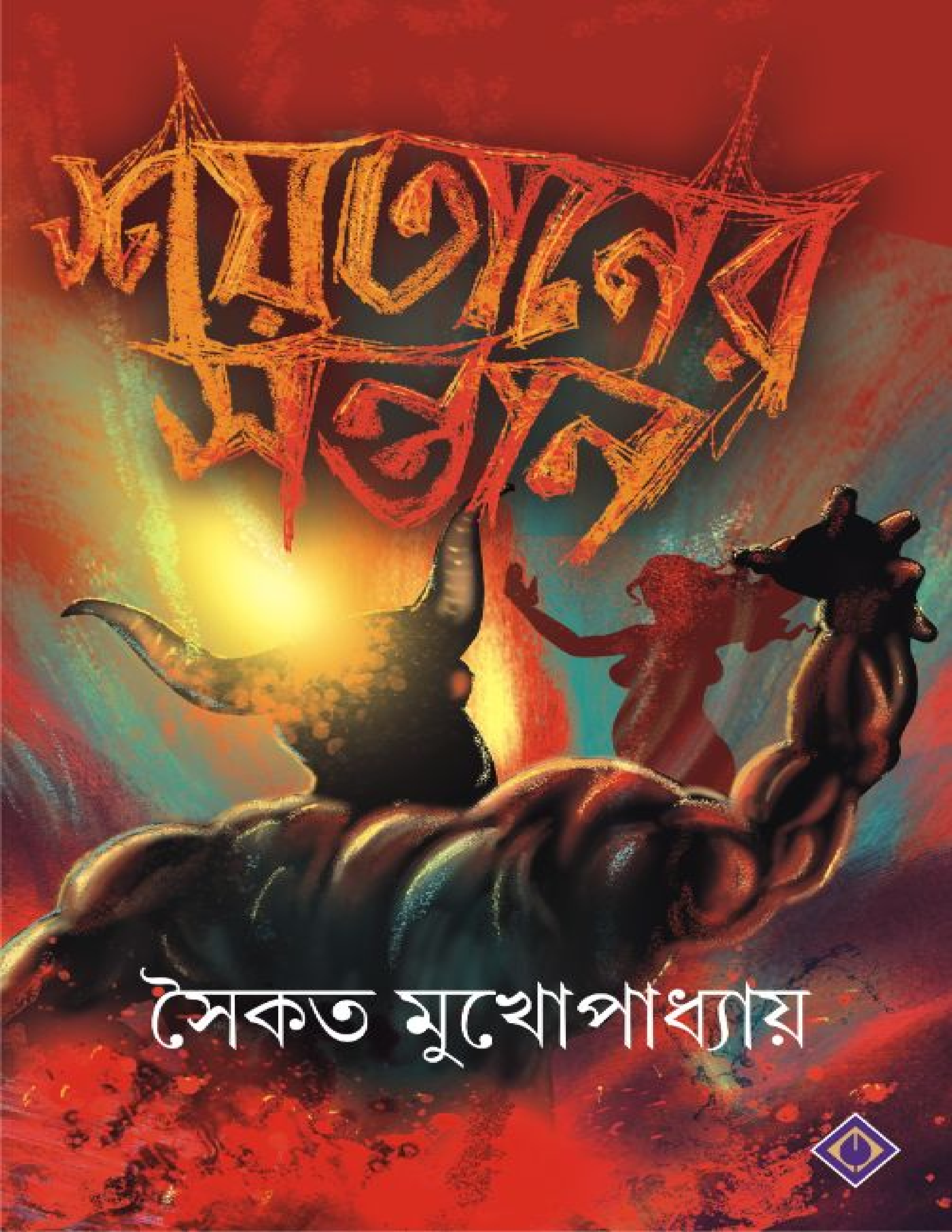
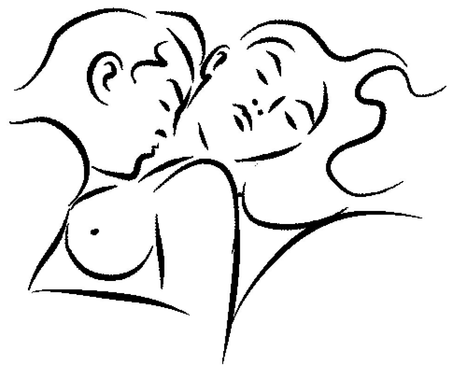

সৈকত মুখোপাধ্যায়

# শয়তানের সন্তান

সৈকত মুখোপাধ্যায়

# শয়তানের সন্তান

এবং পতঙ্গ সঙ্গম



একজোড়া আতঙ্কের উপন্যাস

পত্রভারতী®

www.patrabharati.com

পত্রভারতী®

**প্রথম প্রকাশ** ফেব্রুয়ারি ২০২২

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী®, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

**প্রচ্ছদ** সৌজন্য চক্রবর্তী
**অলংকরণ** ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য



SHOITANER SONTAN
Dark Fantasy Novels *by* Saikat Mukhopadhyay
Published by PATRA BHARATI®
at 3/1 College Row, Kolkata 700009
+91-33-22411175, 9433075550
info@patrabharati.com
patrabharatibooks 9830806799

ISBN 978-81-8374-678-6

প্রয়াত সাহিত্যিক
অনীশ দেবের
স্মৃতির উদ্দেশে

## পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বই

বয়স্ক সাহিত্য
ঈশ্বরের নষ্ট ভ্রূণ
নাইটির প্রতি বারমুডা

কিশোর সাহিত্য
ফুটিডাঙায় ফাটাফাটি
অর্কিড রহস্য
মাই ডিয়ার মিকি

# অসম্ভবের বীজ

এই সংকলনে দুটো উপন্যাস রয়েছে—শয়তানের সন্তান আর পতঙ্গ সঙ্গম। এর মধ্যে পতঙ্গ সঙ্গম লিখেছিলাম বেশ কয়েকবছর আগে। তবু সেটি এতদিন বই হয়ে বেরোয়নি। কারণ, সে অপেক্ষা করছিল তার সঠিক জুড়িদারের জন্যে। হ্যাঁ, অবশেষে গত পুজোয় তার সেই জুড়িদার এল, যার নাম শয়তানের সন্তান। এবং দুটি উপন্যাস এবারে এক-মলাটের মধ্যে পাশাপাশি ঘর বাঁধল।

কেন এতদিন অপেক্ষা করতে হল? কী ছিল পতঙ্গ সঙ্গম উপন্যাসে, যা তাকে আমার অন্য সব লেখালেখির থেকে এতটাই আলাদা করে দিয়েছিল?

তাহলে বলি, উপন্যাসটা লিখবার সময় আমি এক ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেছিলাম। আমারই কল্পিত চরিত্ররা আমাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এখান থেকে সেখানে। কাচকল বস্তির অন্ধকার ঘর থেকে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির রহস্যময় রিসার্চ-ল্যাবরেটরিতে; স্টিল প্ল্যান্টের নারকীয় স্ল্যাগ-ব্যাঙ্ক থেকে বাতিল-বেশ্যার ঘরে।

ঘটনাগুলোও কেমন যেন এক অবশ্যম্ভাবিতায় ঝড়ের গতিতে ঘটে চলেছিল। লিখতে-লিখতেই দেখছিলাম, মানব-মনের অধিকার নিচ্ছে নৃশংস প্যারাসাইট! আপাতভাবে বিনা কারণেই কেউ আত্মহত্যা করছে! অ্যাসিডে পুড়ে যাচ্ছে কারুর আধখানা মুখ, গুলিতে টুকরো হয়ে যাচ্ছে কারুর পা। এর কোনোকিছুই আমি আগে থেকে ভাবিনি। অথচ সবশেষে কী নিখুঁতভাবে সবকিছুই গিয়ে একটা অন্ধকার বিন্দুতে মিশে গেল।

এ এক আশ্চর্য ঘোর, একজন লেখকের জীবনে যা মাত্র কয়েকবারই আসে। যে ঘোরের মধ্যে তার কল্পনা হয়ে ওঠে চরমতম দুঃসাহসী। যা কখনও হয়নি, হবার নয়, তাকেই তখন সে ঘটিয়ে দিতে পারে। জানতাম, ইচ্ছে করলেই এই আত্মসম্মোহনকে ডেকে আনা যায় না। তার জন্যে লেখককে অপেক্ষা করতে হয়।

আমিও অপেক্ষা করলাম। তারপর আবার এক অনুরূপ অসম্ভবের বীজ মাথায় এল। কোথা থেকে এল, কীভাবে এল জানি না। এবার আর প্যারাসাইট নয়, নারী-শরীরের দখল নিল আদিম অপদেবতা।

পতঙ্গ সঙ্গমের সঙ্গে এই শয়তানের সন্তান আরো কিছু জায়গায় মিলে গেল। আখ্যানের পরতে-পরতে যে অন্ধকার জমল, তার খোঁজে এবারেও আমাকে কোনো আমাজনীয় অরণ্যে যেতে হল না, ঢুকতে হল না কোনো মধ্যযুগীয় স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দুর্গে। সেবার যেমন দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের আলো-আঁধারিতে নরকের দরজা খুলে গিয়েছিল, তেমনই এবার তা খুলে গেল এই কলকাতারই ট্যাংরা কসাইখানার পেছনে এক পরিত্যক্ত সেরামিকের কারখানার অন্দরে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ আঞ্চলিক উপাদান দিয়েই তৈরি হয়ে গেল সার্বজনীন আতঙ্কের একখানি উপন্যাস।

কী বলব এই দুটো উপন্যাসকে? ডার্ক-ফ্যানটাসি? বায়ো-থ্রিলার? ক্রশ-জঁর?

না, আমি কিছুই বলব না। কারণ নিজের লেখায় লেবেল লাগানো লেখকের কাজ নয়। ওটা সমালোচকদের অভিরুচি। একজন লেখক হিসেবে বরাবরই যা চেয়ে থাকি, এই দুটো উপন্যাস লেখার সময়ও সেটুকুই চেয়েছিলাম। এরা যেন পাঠককে আনন্দ দিতে পারে; প্রথম থেকে শেষ অবধি যেন পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখতে পারে। তার বেশি কিছু নয়। পেরেছি কিনা, সেটা আপনারাই বলবেন। যদি পেরে থাকি, তাহলে আমার প্রতীক্ষা এবং পরিশ্রম সার্থক।

পরিশেষে একটাই কথা বলার। প্রায় আটমাস আগে আমার প্রিয় অগ্রজ এবং প্রণম্য অভিভাবক অনীশ দেব লোকান্তরিত হয়েছেন। চলে যাবার কয়েকদিন আগেও এই লেখাদুটি সম্বন্ধে আমাকে তিনি কিছু পরামর্শ

দিয়ে গিয়েছিলেন। এই দুটি কাহিনির কোনো-কোনো অংশে তাঁর সেই অন্তিম সংশোধন-চিহ্ন প্রচ্ছন্ন রইল। এই শেষ। আর কখনো কোনো লেখার পাণ্ডুলিপি নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারব না, 'দাদা, একটু দেখে দিন।'

চোখের জলের সঙ্গে এই বইটি তাই অনীশদাকেই উৎসর্গ করলাম।

সৈকত মুখোপাধ্যায়

১২ ডিসেম্বর ২০২১

# সূচিপত্র





# শয়তানের সন্তান

## এক

আমার নাম রুদ্র। রুদ্রনাথ এক্কা। জোসেফ রুদ্রনাথ এক্কা। বয়স একুশ।

এক্কা না হয়ে টেক্কা হলেও কোনো তফাত হতো না। আসলে হওয়া উচিত ছিল ফক্কা। তার কারণ আমি একজন বাস্টার্ড, যাকে বাংলায় বলে বেজন্মা। বেজন্মাদের বাপের পদবি জানা থাকে না; আমারও ছিল না। ব্যাপটাইজ করার সময় আমাদের হোমের রেক্টর, ফাদার স্যামুয়েল, বরাবরের মতন যা-হোক একটা খ্রিস্টান নাম আর মদেশিয়া পদবি দিয়ে আমাকে দেগে দিয়েছিলেন।

যেটাকে 'হোম' বলছি, সেটা আসলে অরফ্যানেজ, মানে অনাথ আশ্রম। রঘুপুরের এই অরফ্যানেজটা চালায় পুরুলিয়ার লুথেরান মিশন। আমার মতন যারা এখানে মানুষ হয়, তাদের জন্ম আশেপাশের বেশ্যাপাড়ায়। কোনো বেশ্যা যদি কচি-বাচ্চা রেখে মারা যায়, তাহলে সেখানকার দালাল বা মাসিরাই বাচ্চাটাকে অনাথ-আশ্রমে জমা করে দিয়ে যায়। তাছাড়া আর কী-ই বা করবে? তবে বাচ্চাটা যদি ছেলে হয় তাহলেই অরফ্যানেজ অবধি পৌঁছয়। মেয়ে হলে মাসিরা নিজেদের কাছে রেখে দেয়। বড় হলে লাইনে নামায়।

আপনাদের কাছে এসব কথা শকিং লাগছে কিনা জানি না, আমার লাগে না। কারণ জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এরকমই দেখছি, শুনছি। যে-বয়সে মানুষের মনে লজ্জা-ঘৃণা পাপ-পুণ্যের ধারণা জন্মায় তার ঢের আগে থেকেই আমরা মানে হোমের ছেলেরা জানি যে, আমাদের মায়েরা লছিপুরের ঢালে শরীর বেচত এবং আমাদের বাপের ঠিক নেই। ফলে তার জন্যে আমরা লজ্জা বা ঘেন্না পেতে শিখিনি।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে রঘুপুরের অরফ্যানেজটাকেই আমার ঘরবাড়ি বলে জানতাম। রেক্টর স্যামুয়েল মণ্ডল, মনিটর মাইকেলদা, ক্যান্টিনের জুলিয়া ওঁরাও সকলেই ছিলেন কনভার্টেড ক্রিশ্চিয়ান। সকলেই এই আশেপাশের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া কিম্বা বর্ধমান জেলার আদি বাসিন্দা। দারুন হাসিখুশি, শিক্ষিত, সুন্দর মানুষজন সব। তেমনই সুন্দর ক্যাম্পাস ছিল আমাদের। অজস্র শাল সেগুন ইউক্যালিপটাস-গাছে ভরা বাগানের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল স্কুল, লাইব্রেরি, ডিসপেন্সারি আর বয়েজ হোস্টেল। ছোট একটা চার্চও ছিল একদিকে।

পাশেই আলাদা একটা কম্পাউন্ডের মধ্যে ছিল নার্সারি-সেকসন। ওখানে সদ্যোজাত বাচ্চা থেকে ছ'বছর বয়স অবধি ছেলেরা থাকত। আমিও জীবনের প্রথম ছ'টা বছর ওখানেই কাটিয়েছিলাম।

রোববার কিম্বা পরবের দিনগুলোতে নার্সারির গেটে দেশি-বিদেশি গাড়ি এসে দাঁড়াত। আমাদের পেট্রনদের গাড়ি। ওদের অনুদানেই মিশন চলে। বেশিরভাগই সাদা চামড়ার সাহেব-মেম। জাপানিও ছিলেন বেশ কয়েকজন। এদেশিয়ও ছিলেন—তবে তাঁরা সংখ্যায় কম। পেট্রনরা নার্সারির বাচ্চাদের জন্যে জামা-কাপড়, খেলনা, টফি-লজেন্স আর ফ্রুটস নিয়ে আসতেন। তাঁরা চলে যাওয়ার পরে জুলিয়াদিদির হাত থেকে আমরা বড়রাও খাবারের ভাগ পেতাম।

এই যে সবটাই পাস্ট টেন্সে লিখছি, তার কারণ, আমি তিন বছর আগেই ওই হোম থেকে বেরিয়ে এসেছি।

'তিন-বছর আগে' মানে তখন আমার আঠেরো-বছর বয়স। ক'দিন পরে হায়ার-সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেব আর তারপরেই হোম থেকে কলকাতায় চলে যাবো—এইরকমই ঠিক ছিল। আঠেরো-বছর বয়সের পর আর রঘুপুরের হোমে কাউকে রাখা হয় না—কলকাতায় লুথেরান ওয়ার্ল সার্ভিসের যে কলেজ আছে সেখানে পড়াশোনা করতে পাঠানো হয়। যাদের হাতের কাজ কিম্বা মেশিনপত্রের দিকে ঝোঁক আছে তাদের জন্যে সেরকম ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাও ওরাই করে দেন। তারপর যাও, নিজে চরে খাও। সিস্টেমটা এরকমই।

কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া হল না। তার আগেই আমার কুষ্ঠরোগ ধরা পড়ল। সেই ধরা পড়ার গল্পটাও বেশ মজার। সেটা ছিল শীতকাল। তীব্র ঠান্ডা পড়েছিল সেবার। তারমধ্যেই সন্ধেবেলায় খেলার মাঠ থেকে ফিরে পায়ে জল ঢালছিলাম। পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন আমাদের রেক্টর, ফাদার স্যামুয়েল। কিছুক্ষণ দেখার পর

উনি জিগ্যেস করলেন, তোমার শীত করছে না রুদ্র? খালি পায়ে এইভাবে মগের পর মগ জল ঢেলে চলেছ যে।

আমি বললাম, না তো। মনে হচ্ছে জলটা পায়ে লাগছেই না।

স্যামুয়েল স্যারের ভুরুদুটো কুঁচকে গেল। উনি কাছে এসে আমার কপালে হাত ছোঁয়ালেন। বললেন, হুঁ, বেশ টেম্পারেচার রয়েছে, অথচ পায়ে ঠান্ডা জল লেগে শীত করছে না। এতো অবাক ব্যাপার। তুমি সিক রুমে চলে যাও। আমি লিখে দিচ্ছি।

সেই শুরু। তারপর তো ব্লাড-টেস্ট। কনফারমেশন। হোম থেকেই আমাকে তড়িঘড়ি শর্বরী মোড়ের কুষ্ঠ আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অনাথ আশ্রম থেকে কুষ্ঠ আশ্রম। কপালটা ভাবুন একবার!

পুরোপুরি কপালের ব্যাপার নাও হতে পারে। কারুর কারুর শরীরে কুষ্ঠরোগের জীবাণু বহু-বছর ঘুমিয়ে থাকার পরে মাথাচাড়া দেয়। ভেবেছিলাম, যে-মায়ের কাছ থেকে আদর পাইনি, তার কাছ থেকেই হয়তো কুষ্ঠের জীবাণুটা পেয়েছি; আঠেরোবছর লেগেছে তাদের জেগে উঠতে।

ভুল ভেবেছিলাম। ওটা ছিল আসলে এক অভিশাপ। গল্পটা পুরোটা শুনলে বুঝতে পারবেন।

শর্বরী মোড়ের লেপ্রসী-সেন্টারে ডক্টর শিপ্রা ঘোষের আন্ডারে টানা দু-বছর চিকিৎসা হল আমার। রোগমুক্ত হলাম। শরীরের অন্য কোথাও রোগ ছড়ালো না, কিন্তু ওই যে পায়ের পাতা দুটোয় প্রথম অ্যাটাক করেছিল, ও দুটো বাঁচানো গেল না।

দুটো পায়ের দশটা আঙুল গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে গেল।

শিপ্রাদি ডাক্তার হিসেবে যত ভালো, দিদি হিসেবে তার চেয়েও ভালো। কি যে ভালোবেসে ফেলেছিলেন আমায় সে বলবার নয়। মাঝে-মাঝেই ইয়ার্কি মেরে বলতেন, তোর এই ফিল্মস্টারের মতন চেহারাটা যে বাঁচাতে পারলাম রুদ্র, এটাই আমার ক্রেডিট।

আসলে আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই ওসব বলতেন, কারণ যতই আমার গায়ের রঙ ফরসা হোক, নাক মুখ কাটা কাটা হোক, হাইট হোক ছ'ফুট—পায়ে তো আঙুল নেই। লেপ্রসি-সেন্টার থেকে কিনে দেওয়া মোটা চামড়ার গোল-গোল জুতো পরে টলমল করে হাঁটি। একটা ল্যাংড়া ছেলেকে ফিল্মস্টারের সঙ্গে তুলনা করার আর কী কারণ থাকতে পারে?

ঠিক দু-বছরের মাথায় বুঝতে পারলাম, আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব ওই লেপ্রসি-সেন্টার থেকে পালাতে হবে। আমি আর চেক-আপের রিস্ক নিতে পারব না। আমার শরীরে এমন কিছু একটা ঘটে চলেছে যেটা কাউকে জানানোর মতন নয়। ডাক্তারকেও নয়। শিপ্রাদিকে বললাম, আমি তো সেরে গেছি। এবার আমাকে ছেড়ে দিন।

শিপ্রাদি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, চলে যাবি? তা যেতেই পারিস। সত্যিকথা বলতে কি আমিও সেরকমই ভাবছিলাম। তা, কোথায় যাবি কিছু ঠিক করেছিস?

আমি বললাম, ফাদার স্যামুয়েলকে একবার ফোন করে দেখবেন?

শিপ্রাদির মুখটা করুণ হয়ে গেল। উনি বললেন, করেছিলাম। ওঁরা তোকে ফিরিয়ে নেবে না। তোর নামে এককালীন কিছু সাহায্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। দু-লাখ টাকা। বলেছেন, ওই টাকায় যেন তোর রিহ্যাবিলিটেশনের ব্যবস্থা করে দিই। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, সবেমাত্র গত সপ্তাহেই সেরকম একটা ব্যবস্থা হয়েছে। আচ্ছা, তুই কি বিরাজ কাপালি বলে কাউকে চিনতিস?

আমি ঘাড় নাড়লাম। সত্যিই অমন অদ্ভুত নামের কাউকে আমি চিনতাম না।

শিপ্রাদি বললেন, আশ্চর্য তো! উনি কিন্তু তোর ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্টেড। একদম বিশেষ করে তোর ব্যাপারেই। প্রথমে রঘুপুর অরফ্যানেজে তোর খোঁজ করেছিলেন। তারপর সেখান থেকে ট্রেস করতে-করতে

এখানে পৌঁছেছেন। উনি আসেননি শুনলাম উনি ক্রিপলড। চলাফেরা করতে পারেন না। ওঁর ম্যানেজার এসেছিলেন। তিনি বললেন, মিস্টার কাপালি তোকে নিজের কোম্পানিতে কাজ দিতে চান।

শিপ্রাদিকে বললাম, আপনি জিগ্যেস করলেন না, হঠাৎ আমাকেই কেন?

শিপ্রাদি বললেন, জিগ্যেস করিনি কে বলল তোকে? করেছিলাম। তাতে ম্যানেজারমশাই বললেন, মিস্টার কাপালি এরকম অনেক দুঃস্থ ছেলেকেই পুনর্বাসন দিয়ে থাকেন। তবে কাজটা এমন যে, শুধু অনাথ হলেই হবে না। তাদের একইসঙ্গে লম্বা চওড়াও হতে হবে। তুই যেহেতু এই দুটো শর্তই পূরণ করছিস তাই...

আমি শিপ্রাদির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, আমাকে ওরা দেখল কোথায়?

শিপ্রাদি এইবার একটু রেগে গেলেন। বললেন, কেন? তুই কি পর্দার আড়ালে থাকিস নাকি? ম্যানেজারবাবু নিশ্চয় কখনো রঘুপুরের হোমের বাগানে তোকে বাঁদরামি করতে দেখেছিলেন। তখনই ফাদার স্যামুয়েলের কাছে তোর খোঁজখবর নিয়েছিলেন। হতে পারে না এরকম?

আমি ভয়ে ভয়ে ঘাড় হেলালাম—হতেই পারে। বুঝতে পারছিলাম, আপাতত যেটুকু খড়কুটো পাই, তাই আঁকড়ে ধরে আমার এখান থেকে বেরিয়ে পড়া উচিত। তাই শিপ্রাদিকে জিগ্যেস করলাম, আর কি বললেন পাটালি স্যারের ম্যানেজার?

পাটালি নয়, কাপালি। বললেন, আমি পারমিসন দিলে ওরা তোকে নিয়ে যাবে। ওদের কোম্পানিতে কাজ দেবে; থাকার জায়গা-টায়গা নিয়েও চিন্তা করতে হবে না। মানে এককথায় যাকে বলে 'রিহ্যাবিলেট' করে দেবেন তোকে।

তারপর শিপ্রাদি আমাকে জিগ্যেস করলেন, যাবি, কাপালি স্যারের ওখানে?

বললাম, অবশ্যই যাব। কিন্তু কোথায় যেতে হবে? আর যাবই বা কীভাবে?

শিপ্রাদি বললেন, সে ওদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। আমি বললেই ওরা তোকে এখান থেকে নিয়ে যাবে। যেতে হবে কলকাতায়। তাহলে আমি ওদের খবর পাঠাচ্ছি, কেমন? সামনের সোমবারে তোর রিলিজ লিখে দেব।

আজকেই সেই সোমবার। ভোর ছ'টার মধ্যে ব্যাগ-ট্যাগ, কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে কুষ্ঠাশ্রম থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে দেখলাম পুরো পৃথিবীটাই যেন একটা উপাসনালয় হয়ে রয়েছে। ফুলের গন্ধ, সোনালি রোদ, পাখির গান। যেন একটু আগেই ঈশ্বর এখান দিয়ে হেঁটে গেছেন। এত কনফিডেন্স পেলাম, কী বলব।

পুরোনো আমলের একটা ফিয়াট গাড়ি নিয়ে গেটের বাইরে বিরাজ কাপালির ড্রাইভার আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। যিশুর নাম নিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম। শুনতে পেলাম শিপ্রাদি পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলছেন, ওষুধগুলো কিন্তু নিয়ম করে খাবি রুদ্র। সেরে গেছিস ভেবে বন্ধ করবি না। চোখে জল চলে এল। আবারও মনে হল, ঈশ্বর এই কুষ্ঠাশ্রমের ক্যাম্পাসের মধ্যেই থাকেন। ঈশ্বর নন, ঈশ্বরী।

চেনা জায়গা ছাড়িয়ে যেতেই কিন্তু আমার সব কনফিডেন্স উবে গিয়ে মনের ভেতরে একটা উদ্বেগ কাজ করতে শুরু করল। উদ্বেগটা ওই চাকরি নিয়েই। কেমন চাকরি—আমি সামলাতে পারব কিনা—সেসব কিছুই তো এখনো জানলাম না। ড্রাইভার-সাহেবের সঙ্গে একটু খেজুর করে কথা বার করবার চেষ্টা করলাম, লাভ হল না। ভদ্রলোক খেজুরের আঁটির চেয়েও কঠিন। তবে গাড়ি যখন আসানসোলের কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন ড্রাইভার-সাহেবের মোবাইলটা বেজে উঠল, উনি স্টিয়ারিং-এ একটা হাত রেখেই কলটা রিসিভ করলেন। দু-একবার হ্যাঁ স্যার, না স্যার বলে পেছনদিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, ধরুন। স্যার আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

ফোনটা কানে নিয়ে বললাম, হ্যালো।

রুদ্র বলছ? আমি বিরাজ কাপালি বলছি ভাই।

গলার স্বরটা অসম্ভব স্নিগ্ধ। আর তেমনি আন্তরিক। শুনেই মন ভালো হয়ে গেল। বললাম, বলুন স্যার।

কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? আমি প্রশান্তকে বলে রেখেছি, তোমরা আসানসোলে ব্রেকফাস্ট করে নেবে। আর ও তোমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেটা আমারই একটা প্রোজেক্ট। ওখানে তোমার থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছি। আজ সারাদিন বিশ্রাম নাও। আমি পরে তোমার সঙ্গে দেখা করে কাজের কথা বলে নেব, কেমন?

আচ্ছা স্যার।

ওখানে যারা রয়েছে, তারা অ্যাকচুয়ালি আউটসাইডার। কিছুদিনের জন্যে ওদের থাকতে দিয়েছি। তবে ওরা মানুষ ভালো। তবু বলছি, ওদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা কোরো না। পরে তোমাকে ডিটেলে সব বলব।

আচ্ছা স্যার।

উনি বললেন, মুশকিল হচ্ছে, ওই পুরো এরিয়াটায় মোবাইলের টাওয়ার পাওয়া যায় না। তাই এখনই কথা বলে নিলাম। আচ্ছা রাখছি তাহলে? চলো, বেস্ট অফ লাক।

থ্যাঙ্কিউ স্যার।

আমি ফোনটা প্রশান্তবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিলাম। ওঁর ওইটুকু কথাতেই একটু আগের সেই উদ্বেগ পুরোটাই কেটে গেল। বেশ ফুরফুরে মন নিয়ে আসানসোল-বাইপাসের ধারে একটা পাঞ্জাবি ধাবায় আচার দিয়ে আলুর পরোটা আর মালাই চা খেলাম। তারপর আবার জার্নি শুরু করে, শেষমেষ দুপুর একটা নাগাদ আমাদের গন্তব্যে পৌঁছলাম।

গাড়ি থেকে নেমে কিন্তু পুরো ভ্যাবলা বনে গেলাম। এই তো কুড়ি-মিনিট আগে ভিড়ে-ঠাসা শেয়ালদা স্টেশন পার হলাম। তারপর রাস্তার ধারের সাইনবোর্ডগুলো দেখে মনে হয়েছিল বেলেঘাটা বলে একটা জায়গার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সেটাও খুবই জমজমাট জায়গা ছিল। কিন্তু তারপর একটা খালের পাশ দিয়ে দু-একটা মোড় নিতেই এ কোন আশ্চর্য জায়গায় এসে পড়লাম! শিয়ালদা স্টেশনের এত কাছে এরকম নির্জন একটা জায়গা থাকতে পারে!

রাস্তাটার একদিকে উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা টানা লম্বা একটা জমি। তার মাঝখানে একটা বন্ধ কারখানা। অন্যদিকেও একটা পাঁচিল, তবে সেটা নীচু আর জায়গায়-জায়গায় ভাঙা। নীচু পাঁচিলটার ওদিকে অনেকখানি এবড়োখেবড়ো জমি পেরিয়ে ব্যারাকবাড়ির মতন কয়েকটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। ওগুলো কী তা তখনো জানতাম না। পরে জেনেছি, ট্যাংরা স্লটার-হাউস, মানে কসাইখানা।

তার মানে ব্যাপারটা যা দাঁড়ালো, একটাই নির্জন রাস্তা—তার একপাশে একটা বন্ধ কারখানা আর অন্যপাশে কসাইখানার পেছনদিকের পোড়ো জমি। পুরো রাস্তাটায় বাড়িঘর দোকানপাট এসব কিছুই নেই। রাস্তাটাও ভাঙাচোরা। দেখেই বোঝা যায়, বহুদিন পিচ পড়েনি।

ড্রাইভার প্রশান্তবাবু ওই বন্ধ কারখানাটার গেটের সামনে গাড়ি পার্ক করেছিলেন।

দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কারখানাটা বহু পুরোনো। একটাই বিশাল শেড, তার পাতলা ইটের দেয়াল, আর্চ করা টালির ছাদ। দেয়ালের গা থেকে পলেস্তারার বারোআনাই খসে পড়েছে। স্কাইলাইটের কাচগুলোরও একই দশা। ছাদের মাঝ-বরাবর একটা ইটের চিমনি। ওরকম ইটের চিমনি বোধহয় একশো বছর আগে তৈরি করা হতো।

নেমে পড়ুন। ভেতরে গাড়ি ঢুকবে না। বাকিটা পায়ে হেঁটে চলে যান।

প্রশান্তবাবুর কথায় চমকে উঠলাম। উনি কি ওই পরিত্যক্ত কারখানাটার মধ্যে ঢোকার কথা বলছেন? হ্যাঁ, তাই তো। আঙুল তুলে ওইদিকেই তো দেখাচ্ছেন দেখছি।

অগত্যা হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে গাড়ি থেকে নেমে, কারখানার গেটের দিকে হাঁটা লাগালাম। প্রশান্তবাবু গাড়ি নিয়ে চলে যাবার আগে বেশ কয়েকবার হর্ন বাজিয়ে দিয়ে গেলেন। বুঝলাম, ওটা আমার আগমন বার্তা। কাদের উদ্দেশে কে জানে।

কাছে গিয়ে দেখলাম, পুরো কম্পাউন্ডটাকে ঘিরে দু-মানুষ সমান উঁচু একটা পাঁচিল, যেটাকে রিসেন্টলি মেরামত করা হয়েছে। চুন-সুরকির পাশাপাশি সিমেন্টের পলেস্তারাই তার প্রমাণ। পাঁচিলের মাথায় কাঁটাতারের বেড়া। স্টিলের পাত দিয়ে তৈরি ফটকের পাল্লা-দুটোও নতুন। অর্থাৎ একটা বহু পুরোনো কারখানা ঘিরে নতুন করে সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কে জানে কেন!

ফটকের পাল্লাদুটো চেন-তালা দিয়ে এমন করেই বাঁধা ছিল যে, একজন মানুষ ফাঁক দিয়ে গলে ভেতরে ঢুকতে পারে।

আমি পাল্লার ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

কারখানা-বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছিয়ে ঘাড় তুলে ওপরদিকে তাকালাম। দেখলাম ছাদের কার্নিশের নীচে পঙ্খের কারুকার্য করে রোমান হরফে লেখা আছে 'BAVERIA PORCELAIN INDUSTRY—1949'।

পোর্সেলিন! মানে চিনেমাটি? মনে-মনে কপাল চাপড়ালাম। শেষকালে কাপ-ডিশ বানাতে হবে? মুখে কিছু বললাম না অবশ্য। জানতাম, ভিক্ষের ঝোলায় দেরাদুন রাইস পড়ল না মিনিকিট দেখতে নেই।

কারখানা-ঘরের দরজাটা এতক্ষণ বন্ধ ছিল। সামনে গিয়ে দাঁড়ানো-মাত্রই দরজা খুলে দুজন মানুষ বাইরে বেরিয়ে এল—একজন মেয়ে, একজন মরদ। মেয়েটির গড়ন ছিপছিপে, গায়ের রঙ শ্যামলা। দেখে মনে হল ত্রিশের আশেপাশে বয়স হবে। গাছকোমর বেঁধে শাড়ি পরেছিল। সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না। বড়-বড় চোখে মেয়েটা আমাকে দেখছিল আর ঝকমকে দাঁতের আলো ছড়িয়ে হাসছিল।

পুরুষটির বয়স চল্লিশের কিছুটা ওপরে। হাইট বেশি নয়, কিন্তু চেহারাটা সলিড। শরীরের প্রতিটি পেশি যেন আলাদা করে গুনে নেওয়া যায়। আর তেমনি রোমশ। পিঠ বুক তো ছেড়েই দিলাম, কাঁধ থেকে থেকে বাহুর ওপরের অংশটা অবধি ঘন লোমে ঢাকা। মাথার কাঁচাপাকা চুল কদমছাট করে ছাটা। গায়ে জামা ছিল না, শুধু একটা নীল লুঙ্গি হাফ করে জড়ানো ছিল কোমরে।

মেয়েটা হাসতে-হাসতেই বলল, এসো রুদ্র। আমার নাম হাসি মণ্ডল। তুমি হাসিদি বলে ডেকো। আর এ হচ্ছে পঙ্কজদা। পঙ্কজ মিদ্যা।

হাসিদি? নামটা শুনেই আমার মনে হল, এটা ওর আসল নাম নয়। ওর হাসিমুখ দেখেই লোকে নিশ্চয় ওর নাম দিয়েছে হাসি।

আমাকে চমকে দিয়ে পঙ্কজ নামের লোকটি মুখ দিয়ে একটা গোঙানির মতন আওয়াজ করল। বুঝলাম, বেচারা বোবা; তবে কানে নিশ্চয় শুনতে পায়।

হাসিদি আর পঙ্কজদার সঙ্গে পায়ে-পায়ে দরজা পার হয়ে কারখানার ভেতরে ঢুকলাম। আমি ভেতরে ঢোকামাত্রই ওরা রাক্ষুসে দরজার পাল্লাদুটোকে চেপে বন্ধ করে দিল। আমার অন্তরাত্মা বলে উঠল, তোমার জীবনটা এই এক্ষুনি পালটে গেল হে রুদ্রনাথ। ভালোর দিকে পালটাল না মন্দের দিকে, বলতে পারব না। তবে পালটাল।

## দুই

দিনেরবেলা বলে তখন ঘরের সিলিং থেকে ঝোলানো বালবগুলো নেভানো ছিল। ছাদের দুটো স্কাইলাইট ছাড়া বাইরের আলো ঢোকার আর কোনো রাস্তা ছিল না, তাই বেলা একটার সময়েও সন্ধেবেলার মতন ছায়া জমে ছিল ঘরটার মধ্যে।

সেই ছায়ায় চোখ সয়ে আসার পরে বিশাল এবং আয়তাকার ঘরটাকে ভালো করে দেখতে পেলাম। পায়ের নীচে পাথরের ইট দিয়ে বাঁধানো মেঝে। বিশ-ফুট উঁচুতে উল্টোনো জাহাজের খোলের মতন অবতল সিলিং, যার গা থেকে লোহার চেনে একসারি ল্যাম্পশেড ঝুলছে। ল্যাম্পশেডের পাশাপাশি ঝুলছে কম্বলের

মতন পুরু ঝুলকালির চাদর। মেঝের মাঝ বরাবর খড়খড়ে অমসৃণ কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো, লম্বা একটা টেবিল। চওড়ায় সেটা হবে প্রায় পাঁচ ফুট। টেবিলের নিচে ওইরকমই পালিশ-ছাড়া কাঠের তৈরি লো-বেঞ্চ। টেবিলের ওপরে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে লোহার বড়-বড় চিমটে, কাঁচি আর ব্লো-পাইপ। বুঝতে অসুবিধে হয় না, ওটা ওয়ার্কিং-টেবল। ওই বেঞ্চে বসেই কারিগরেরা কাজ করেন...কিম্বা করতেন।

দূরের দেওয়ালে লোহার পাল্লা দিয়ে যে আলমারি-সাইজের ফোকরটা ঢাকা দেওয়া রয়েছে সেটা নিঃসন্দেহে একটা ফার্নেস—কারণ, চারপাশের দেয়ালের পাথরের লাইনিং পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

তার মানে এতক্ষণ যেটাকে বন্ধ কারখানা ভাবছিলাম, সেটা পুরোপুরি বন্ধ নয়। কিছু কাজকর্ম এখনো হয় এখানে!

সবচেয়ে বেশি চোখ টানল ঘরটার চার-দেয়ালের গায়ে সারিসারি কাঠের র‍্যাকের ওপরে সাজিয়ে-রাখা চিনেমাটির বাসনপত্র আর ভাস্কর্য। ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাক্টই হবে নিশ্চয় ওগুলো। প্রশ্ন হচ্ছে কবেকার প্রোডাক্ট?

কাছাকাছি যে র‍্যাকটা ছিল, সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। র‍্যাকটার ওপরে স্তূপ করে সাজানো ছিল নানান সাইজের নানান শেপের পোর্সেলিনের প্লেট। সামনে যে প্লেটটা ছিল সেটার গায়ে আলতো করে একবার আঙুল বুলিয়ে আনলাম। আমার আঙুলের ডগায় উঠে এল পুরু ধুলোর সর। তার মানে আমার সন্দেহটা ঠিক। এগুলো বহুদিন না ভুল বললাম, বহুবছর ধরে এখানে পড়ে আছে।

এখন তাহলে কী তৈরি হয় এখানে? কী বানায় হাসিদি আর পঙ্কজদা? অবশ্য কাপালি স্যার তো বললেন, ওরা আউটসাইডার। সেক্ষেত্রে ওরা কারখানার কাজে হাত লাগাবে না সেটাই স্বাভাবিক।

বোধহয় আমার কোঁচকানো ভুরুদুটো দেখেই হাসিদি আবার হেসে উঠল। বলল, ভাই, কারখানা-ঘর পরে একসময় ভালো করে দেখিয়ে দেব তোমায়। এখন চান খাওয়া সেরে নেবে চল। সেই কোন সকালে বেরিয়েছ। এই পঙ্কজদা, রুদ্রকে ওর ঘর দেখিয়ে দাও।

পঙ্কজদা মুখে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে আর হাত-মুখ নেড়ে ওর পেছন-পেছন যাওয়ার জন্যে আমাকে ডাকল। ইশারাতেই বুঝিয়ে দিল, যেহেতু আমি খোঁড়া, তাই আমাকে সাবধানে পা ফেলতে হবে, না-হলে মেঝের উঁচু-নীচু পাথরের ইটে ঠোক্কর খেয়ে পড়ে যাব। ও নিজে অবশ্য দিব্যি তুড়িলাফ মেরে চোখের পলকে ঘরটার পেছনের দেয়ালে আরেকটা যে দরজা ছিল, সেটা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওর পেছন-পেছন আমিও সেই দরজা পেরিয়ে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা বিশাল উঠোনের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। মনে হল অন্তত দুটো টেনিস-কোর্ট অনায়াসে ওই উঠোনটার মধ্যে এঁটে যাবে।

ফাঁকা উঠোন। তার শেষ-প্রান্তে দু-খানা লম্বাটে একতলা বাড়ি। বাড়িদুটোর দেওয়ালে সাদা চুনকাম, লাল টালির ছাদ। মাঝখানে কুঁয়োতলা আর ছোট একটা ফুলের বাগান। বাঁ-দিকের বাড়িটার বারান্দার গায়ে সার-সার চারখানা ঘর। দু-প্রান্তের দুটো ঘরের দরজা খোলা, মাঝের ঘরদুটোর দরজা তালাবন্ধ। পঙ্কজদাকে ফলো করে, খোলা ঘরদুটোর মধ্যে একটায় ঢুকে পড়লাম।

দিব্যি ঘরখানা। চারটে বড় বড় জানলা। পঙ্কজদা জানলাগুলো খুলে দিতেই লাল সিমেন্টের মেঝের ওপরে রোদ্দুরের চারটে চৌখুপি খুলে গেল আর তাদের বুকে বাগানের পেঁপে পাতার ইকড়ি-মিকড়ি ছায়া নাচতে শুরু করল। ঘরটার একপাশে নতুন বেডকাভারে ঢাকা তক্তপোশের বিছানা। তা ছাড়াও টেবিল-চেয়ার, দেয়াল-আয়না আর একটা ছোট আলমারিও ছিল। বুঝতে অসুবিধে হল না, সবটাই কাপালি স্যারের নির্দেশে হয়েছে।

পঙ্কজদা ইশারায় বুঝিয়ে দিল, অন্য প্রান্তের খোলা ঘরটায় ও নিজে থাকে।

আমি জিগ্যেস করলাম, আর হাসিদি?

পঙ্কজদা আঙুল তুলে বাগানের ওপাশের বাড়িটার দিকে দ্যাখাল।

মনে-মনে বললাম, এই পাঁচিলঘেরা স্বর্গের বাগানে কি শুধু অ্যাডাম আর ইভই থাকে নাকি? এরা দুজন কি স্বামী-স্ত্রী? না তো। হাসিদি তো ওকে 'পঙ্কজদা' বলে ডাকছে।

ভাগ্যিস মনে-মনে বলেছিলাম, কারণ, কখন যে হাসিদি আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল খেয়ালই করিনি। হাসিদি বলল, রুদ্র! চান করার জন্যে কিন্তু ও বাড়িতে যেতে হবে। এ-বাড়ির দালানের শেষ-মাথায় একটা বাথরুম আছে ঠিকই, তবে ওখানে চৌবাচ্চা নেই।

আমি ঘাড় হেলালাম। হাসিদি আবার বলল, আমাদের রান্নাঘর, খাবার ঘর, এই কাচ-কারখানার স্টোররুম, সব ওই বাড়িতে। আরো দুটো ঘর আছে—একটা আমি থাকি আর অন্যটায় বিশাখা।

বিশাখা?

সে আছে একজন। খাবার সময় তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। এখন তুমি চল, চান করে নেবে।

বললাম, যাও। আমি আসছি। তারপর একটু ইতস্তত করে যে-প্রশ্নটা মাথায় ঘুরছিল, সেটা করেই ফেললাম। বললাম, ইয়ে...বিশাখা কি পঙ্কজদার বউ?

হাসিদির এবারের হাসিটা আর অতটা সোজাসাপটা লাগল না। কেমন যেন বাঁকা হেসে বলল, তাহলে দুজনে দু-বাড়িতে থাকে? তোমার বিয়ে হয়নি, তাই না?

মনে-মনে জিভ কাটলাম। প্রশ্নটা বোকার মতন হয়ে গেছে সত্যি।

হাসিদি একটু চাপা-গলায় বলল, কেউ কারুর বর নয়। কেউ কারুর বউ নই। তারপরেই যে-কথাটা বলল, সেটার জন্যে একদমই প্রস্তুত ছিলাম না। বলল, যে খারাপ চিন্তাটা করছ সেটা মাথা থেকে সরিয়ে ফেল। কারণ পঙ্কজদা পুরুষমানুষ নয়।

আমি বিছানার ওপরে ব্যাগটা রেখে গামছা, পাজামা এইসব বার করছিলাম। হাসিদির শেষ কথাটা শুনে ওই অবস্থাতেই স্ট্যাচু হয়ে গেলাম। হাসিদি সেটা খেয়াল করল কিনা জানি না, আর কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের বাড়ির দিকে চলে গেল। কিন্তু আমার মাথার মধ্যে ওর শেষ কথাটা রাগি-ভিমরুলের মতন পাক খেতে লাগল—পঙ্কজদা পুরুষমানুষ নয়...পঙ্কজদা পুরুষমানুষ নয়।

আমার মাথা থেকে একটা খারাপ-চিন্তা সরাতে গিয়ে হাসিদি আরো খারাপ একটা চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। হাসিদি কেমন করে বুঝল পঙ্কজদা পুরুষমানুষ নয়? বোঝার চেষ্টা করেছিল নিশ্চয়ই। নাকি, অন্য কারুর কাছ থেকে শুনেছে? কিন্তু কার কাছ থেকেই বা শুনবে? বিরাজ কাপালির মতন একজন বড়মাপের মানুষ কি এইসব নিয়ে আলোচনা করবেন?

ঘাড় ঘুরিয়ে খোলা-দরজার ভেতর দিয়ে দালানের দিকে তাকালাম। দেখলাম, আমার দিকে পিছন ফিরে, বুকের ওপরে দু-হাত জড়ো করে পঙ্কজদা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি পেছনদিক থেকে ওর বাদামি লোমে ঢাকা চওড়া কাঁধ পিঠ আর কোমর দেখতে পাচ্ছিলাম।

যাই হোক, শরীরটা খুব ক্লান্ত ছিল বলেই বোধহয় ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির নৈতিক পরিবেশ নিয়ে আর ভাবতে ভালো লাগছিল না। চটপট স্নান সেরে খাবার ঘরে গিয়ে বসলাম।

আমি ঘরে ঢোকামাত্রই পঙ্কজদা আর হাসিদি দুজনেই অবাক হয়ে আমার পায়ের দিকে তাকাল। হাসিদি বলল, একি! তুমি পাজামার সঙ্গে জুতো পরে আছ কেন? একজোড়া চটি পরলে আরাম লাগত না?

আমি ক্লিষ্ট হেসে বললাম, পারি না গো দিদি। চটি পরে হাঁটতে পারি না।

পঙ্কজদা ইশারায় প্রশ্ন করল, সবসময় জুতো পরে থাকো?

আমি বললাম, হ্যাঁ, চব্বিশঘণ্টা। শোয়ার সময়েও। ডাক্তারবাবু সেরকমই বলেছেন। তবে তোমরা ভয় পেও না। আমার শরীরে আর রোগ নেই। ইনফেকশন ছড়াব না।

হাসিদি তাড়াতাড়ি বলল, না না। ভয় পাইনি। কাপালি স্যার আমাদের সব বলেছেন। আমি তোমার আরামের কথা ভেবে বলছিলাম আর কি। যাই হোক, বসে পড়ো।

রান্না করা ভাত ডাল তরকারি আর মাছের পাত্রগুলো টেবিলের মাঝখানে নামানো ছিল। আমি, হাসিদি আর পঙ্কজদা যখন যে যার নিজের থালায় ভাত তুলে নিচ্ছি, তখনই পাশের কিচেন থেকে একটা মেয়ে হাতে একটা প্লেটে স্রেফ একটু ফ্যানেভাত নিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে, টেবলে নয়, মেঝের এককোনায় উবু হয়ে বসল। একগ্রাস ভাত মুখে পুরে আবার তাকাল আমার দিকে। সেই-দৃষ্টিতে কেমন অদ্ভুত এক মায়া ছিল। মনে হচ্ছিল ও যেন দৃষ্টি দিয়েই আমাকে আদর করছে।

হাসিদি বলল, রুদ্র, এই হচ্ছে বিশাখা।

বুঝতে পারছিলাম অন্যায় হচ্ছে, তবু আমি বিশাখার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছিলাম না। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিলাম। বিশাখাও আমাকে দেখছিল। এমনভাবে দেখছিল যেন বহুদিন পরে কোনো আপনজনকে দেখছে।

আমার মুগ্ধ হওয়ার মধ্যে অন্যায় কিছু ছিল না। বিশাখাকে এককথায় বলা যায় পরমা-সুন্দরী। আমারই মতন বয়স হবে ওর; কিম্বা দু-একবছর বেশি। দুধে-আলতা গায়ের রঙ, দেবীপ্রতিমার মতন গড়ন। মাথাভর্তি কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল পিঠ ছাপিয়ে কোমর অবধি নেমে এসেছে। সবথেকে আশ্চর্য ওর চোখদুটো। টানা-টানা দুই চোখের পাতা যেন ভারী হয়ে চোখের মাঝখান অবধি নেমে এসেছে, আর তাই মণিদুটো কখনোই পুরোটা দেখা যায় না। একেই বোধহয় 'মদালসা আঁখি' বলে—দেখলে মনে হয় যেন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন।

একটা সাদারঙের কোরা কাপড় দিয়ে গলা থেকে পা অবধি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিল মেয়েটা। শুধু কনুই থেকে হাতদুটো বাইরে বেরিয়েছিল। শাড়ি পরার অমন ধরণ আমি কখনো দেখিনি।

ঘোর কাটিয়ে ওকে জিগ্যেস করলাম, তোমার বাড়ি কোথায়, বিশাখা?

বিশাখা ভাতের থালার দিকে মুখ নামিয়ে উত্তর দিল, শিয়ালদায়।

বললাম, তুমি ওরকম সাদা ভাত খাচ্ছ কেন? শরীর খারাপ? নাকি ব্রতআচ্চা আছে?

বিশাখা উত্তর তো দিলই না, বরং আমাকে চরম অপ্রস্তুত করে, ভাতের থালা নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। বোধহয় নিজের ঘরে বসেই খাওয়া শেষ করবে।

আমি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। তারপর হাসিদির দিকে তাকালাম। দেখলাম ও মুখ নীচু করে বসে আছে। একটু বাদে ও মুখ তুলে খুব আন্তরিকভাবে বলল, কিছু মনে কোরো না রুদ্র। বিশাখা ওইরকমই। হঠাৎ হঠাৎ ওর মুড চেঞ্জ হয়।

শান্ত হওয়ার বদলে আমার মাথার ভেতরটা রাগে কিরকির করে উঠল। বললাম, কেন? অ্যাবনর্মাল নাকি?

হাসিদি বলল, না। অ্যাবনর্মাল নয়। তোমাকে পরে বলব।

কথাটা শুনেই মাথার মধ্যে কী যেন একটা হয়ে গেল। আমি হাতের থালাবাটিগুলো ঝড়াং করে টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে হাসিদির দিকে ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করে বললাম, এর মানে কী বলো তো। কী হচ্ছে এখানে? এটা ঢপের কারখানা; এখানে কিচ্ছু তৈরি হয় না। আর তোমাদের মধ্যে একজন বোবা, একজন খেপি। ওই কাওয়ালি না কি যেন লোকটা, ও কি এখানে পাগলাগারদ বানাচ্ছে নাকি?

পঙ্কজদা এতক্ষণ চুপ করে খেয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে, বাঁ-হাতের চেটো দিয়ে আমার বুকে আলতো করে একটা ঠেলা মারলো। এত জোর ছিল সেই সামান্য ঠেলাটুকুর মধ্যে যে, আমি এই ছ'ফুটিয়া শরীর নিয়েও টলমল করে চার-হাত পিছিয়ে গেলাম।

হাসিদি পঙ্কজদার দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল, আঃ! কী হচ্ছে কী পঙ্কজদা? পঙ্কজদা ততক্ষণে আবার খাওয়ায় মন দিয়েছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল কিছুই হয়নি।

হাসিদি এবার আমার দিকে তাকিয়ে শান্তগলায় বলল, কাল তো কাপালি স্যারের সঙ্গে তোমার দেখা হবেই। উনি বলে গেছেন তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। যা জানার তাঁর কাছ থেকেই

জেনে নিও। তবে একটা জিনিস জেনে রাখো, আমি, পঙ্কজদা বা বিশাখা হয়তো আর দশজন লোকের মতন নই। কিন্তু তার মানেই আমরা অ্যাবনর্মাল নই।

তখনকার মতন কথাগুলো বিশ্বাস করে নেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। ভাবলাম, সত্যিই যদি কাপালি স্যারের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে আর এদের চাপ দিই কেন। তাঁর সঙ্গেই হেস্তনেস্ত করা যাবে। তখনই ঠিক করব এখানে থাকব কি থাকব না।

কিচেনের সিঙ্ক থেকে বাসনগুলো ধুয়ে নিয়ে আবার যখন ডাইনিং-রুমে ফিরলাম, তখনো হাসিদি আর পঙ্কজদার খাওয়া শেষ হয়নি। আমি ওদের সঙ্গে আর একটাও কথা না বলে, আমার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটায় ঢুকে ভেতর থেকে খিল তুলে দিলাম। তারপর বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে আজ ভোর থেকে যা-যা ঘটে চলেছিল সেগুলোকে মাথার মধ্যে সাজাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। খুব ক্লান্ত ছিলাম বলেই একটু বাদেই দু-চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

সেই ঘুম ভাঙল একেবারে সন্ধে ছ'টায়। তাড়াহুড়ো করে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম, হাসিদি আর পঙ্কজদা রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় চুপ করে বসে আছে। আমাকে দেখে হাসিদি বলল, এসো রুদ্র, বসো। চা খাও।

হাসিদি আমার হাতে কাগজের কাপ ধরিয়ে দিল। পঙ্কজদা রান্নাঘর থেকে কেটলিতে চা গরম করে এনে কাপে ঢেলে দিল। তারপর বাগানের গাছে জল দিতে উঠে গেল। কিন্তু আমার চোখ খুঁজছিল বিশাখাকে। ওকে কোথাও দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিছুক্ষণ দোনামোনা করে হাসিদিকে জিগ্যেস করেই ফেললাম, সেই অহঙ্কারী মেয়েটা কোথায়?

হাসিদি আমার কথা শুনে হেসে ফেলল। বলল, এখনও রাগ পুষে রেখেছ ওর ওপরে? আশ্চর্য ছেলে তো তুমি! ও যে কতটা অসহায়, সেটা নিজের চোখে দেখলে বুঝতে পারবে। যাও, দেখে এসো।

কোথায় যাব? আমি জিগ্যেস করলাম।

হাসিদি বলল, আসবার সময় খেয়াল করেছ নিশ্চয়, কারখানা-ঘরের বাইরের জমিটায় কয়েকটা বড় গাছ আছে। ওখানেই বিশাখাকে পেয়ে যাবে।

এমনিতে যেতাম না। একজন প্রায় অপরিচিত মেয়ের সম্বন্ধে অত কৌতূহল দেখাবই বা কেন? কিন্তু ওই যে, হাসিদি বলল, ও কতটা অসহায় বুঝতে পারবে, ওই কথাটা মনে হল বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ। মনে হল, ও আমাকে যাওয়ার জন্য ইনসিস্ট করছে। আমি চায়ের কাপটা ময়লার বালতির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, উঠোন পেরিয়ে কারখানা-ঘরের মধ্যে ঢুকলাম।

দুপুরে যখন প্রথমবার ঢুকেছিলাম এই ঘরে, তখন যতটুকু আলো ছিল, এখন তাও নেই। আকাশের আলো নিভে গেছে বলে স্কাইলাইটের আলো নেই। সুইচবোর্ড কোথায় জানি না। সঙ্গে একটা টর্চ নিয়ে আসার কথা বলা উচিত ছিল হাসিদির।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে, ঘরটায় কোনোরকমের আলো না থাকলেও আমি সবকিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। ওয়ার্কিং-টেবলের পায়া, দেওয়ালের র‍্যাকে সাজিয়ে রাখা পুরোনো পোর্সেলিনের বাসনকোসন আর মূর্তি, এমনকী আমার পায়ের কাছে পাথরের মেঝের ওপরে পড়ে-থাকা একটা মরা আরশোলা অবধি। একবার সন্দেহ হল, কোনো অজ্ঞাত কারণে বেড়ালের মতন অন্ধকারে দেখবার ক্ষমতা পেয়ে গেলাম না তো? তারপরেই বুঝতে পারলাম, তা নয়। আসলে এই ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস থেকে ফসফরাসের মতন খুব হালকা একটা আভা বেরোচ্ছে।

কিছুক্ষণ লাগলো সেই ঘোর কাটিয়ে উঠতে। তারপর সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরের বাগানে। দেখলাম হাসিদি কিছু ভুল বলেনি। ঢুকবার সময় অন্যান্য চিন্তায় খেয়াল করিনি, কিন্তু সত্যিই বিশাল কারখানা-ঘরটাকে ঘিরে ইতস্তত নানারকমের গাছের জটলা রয়েছে। ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে গাছগুলোকে ভূতের মতন দেখতে লাগছিল। মাঝে মাঝে একটা দমকা হাওয়া আসছিল রাস্তার উল্টোদিকের

ওই পোড়ো জমিটার দিক থেকে—সঙ্গে নিয়ে আসছিল পচা মাংসের গন্ধ, পরে যেটাকে জেনেছি ট্যাংরা স্লটার-হাউসের আবর্জনার গন্ধ বলে।

কিন্তু এসবের মধ্যে বিশাখা কোথায়? বিশাখাকে খুঁজে না পেলে জানব কেমন করে কী রহস্য লুকিয়ে আছে ওই মেয়েটার মধ্যে?

হঠাৎই দেখলাম, খুব উঁচু একটা গাছের গুঁড়ির কাছে ঊর্ধ্বমুখে একটা নেড়িকুকুর বসে আছে। ব্যাটা খুব নিবিষ্টমনে ঘাড় উঁচু করে কী যেন দেখছিল। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে করুণস্বরে ডেকে উঠল। বেচারা যে-কোনো কারণে ভীষণ ভয় পেয়েছে, সেটা ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম। মনে হল ভয়ের চোটে অল্প-অল্প কাঁপছে। আমি কুকুরটার দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে গাছটার মগডালের দিকে তাকালাম।

ওটা বোধহয় অর্জুনগাছই হবে। মসৃণ সাদা বাকল। খুব উঁচু, তবে ডালপালার ঝাড় কিম্বা পাতার গোছা তেমন ঘন নয়। বাগানের জমিতে অন্ধকার নেমে এলেও গাছটার মাথার কাছে তখনো একটু সূর্যাস্তের আলো লেগে ছিল। সেই আলোয় দেখলাম একটা খুব সরু ডালের ওপরে বিশাখা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমার প্রথমেই মনে হল এ বিশাখা নয়। ভূত। না-হলে যে সরু ডালে একটা কাক অবধি বসার আগে দুবার ভাববে, সেই সরু ডালের ওপরে ও কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? তাও আবার দু-হাত ছেড়ে? নেড়িকুকুরটা আবার চাপা কান্নার মতন আওয়াজ করে ডেকে উঠল।

হঠাৎই আমার বুকের রক্ত হিম করে দিয়ে বিশাখা ওই গাছের মগডাল থেকে সড়সড় করে নীচে নেমে এল।

ওর নেমে-আসার ধরনটা ছিল অদ্ভুত। কীভাবে বোঝাব জানি না। যেভাবে মোমবাতির গা বেয়ে গলন্ত মোমের ফোঁটা গড়িয়ে নামে, সেইভাবেই চোখের পলকে গাছের গুঁড়ি বেয়ে নেমে এলো বিশাখা। আমি দিব্যি দিয়ে বলতে পারি, সেই সময়টুকুতে ওর আকৃতি কোনো মানবীর মতন ছিল না। ওর মুখ, ঘাড়, বুক, পেট সব মিলেমিশে একটা বিশাল মোমের ফোঁটার মতনই গোল হয়ে গিয়েছিল। তবে মাটিতে পড়ামাত্রই সেই বিন্দুটা আবার বিশাখা হয়ে উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

কুকুরটা পেটের মধ্যে ল্যাজ ঢুকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে কোথায় যে পালিয়ে গেল, বুঝতে পারলাম না। আমি কোনোরকমে তোতলাতে তোতলাতে বিশাখাকে বললাম, তুমি তুমি ওখানে কেমন করে? মানে এটা তো বিপজ্জনক মানে, পড়েও তো যেতে পারতে।

বিশাখা আমার কথার কোনো জবাব তো দিলই না। উলটে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। হঠাৎই আমার কাছে এগিয়ে এসে নিজের গালটা আমার গালে কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রেখে আবার পায়ে-পায়ে পিছিয়ে গেল। কি ঠান্ডা ওর গালটা। একেবারে বরফের মতন ঠান্ডা। তাছাড়া ওর গা থেকে একটা সুগন্ধ ভেসে আসছিল। গন্ধটা খুব চেনা। কিন্তু এতই তীব্র যে, আমার নাক জ্বালা করছিল।

এই হঠাৎ আদরে আমি স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। আমি হুঁশ ফিরে পাবার আগেই বিশাখা কারখানা ঘরের দরজার দিকে হাঁটা লাগাল। সেই চলে যাওয়ার মধ্যেও কোনোরকম ব্যস্ততা ছিল না। মনে হচ্ছিল ও যেন ঘুমের মধ্যে হাঁটছে।

হাসিদি বলেছিল, দেখে এসো বিশাখাকে। বুঝতে পারবে ও কত অসহায়।

আমি দেখলাম। কিন্তু ওর অসহায়তাটা যে কোথায় এখনো বুঝতে পারলাম না। মনে হল, আবার হাসিদির কাছেই ফিরে যাই। এইমাত্র যা দেখলাম আর বিশাখা যা করল সবটাই ওকে বলে জিগ্যেস করি, এসবের মানে কী? কিন্তু তার দরকার পড়ল না।

## তিন

দরকার যে পড়ল না, তার কারণ, কারখানা-ঘরের দিকে যখন কিছুটা এগিয়ে গেছি, ঠিক তখনই বাইরের রাস্তা থেকে কেউ ডাকল—রুদ্র!

মহিলার গলা। অবাক হয়ে দেখলাম, কারখানার গেটের বাইরে হাসিদি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ও এদিকে এলো কেমন করে! এই কারখানার যা প্ল্যান, তাতে ব্যারাকবাড়ি এবং তার লাগোয়া উঠোন থেকে বাইরে বেরোতে গেলে কারখানার ভেতর দিয়েই বেরোতে হবে। দ্বিতীয় কোনো রাস্তা তো নেই। আর আমি তো দাঁড়িয়ে রয়েছি কারখানা-ঘরের দরজার সামনেই। ওই দরজা দিয়ে তো হাসিদি বেরোয়নি। মনকে বোঝালাম, অন্য কোনো রাস্তা আছে নিশ্চয়ই, উঠোনের পাঁচিলের গায়ে কোনো ছোট গেট, যার ভেতর দিয়ে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়া যায়।

আমার চোখে চোখ পড়তেই হাসিদি বলল, সব দেখেছি। বিশাখার পাগলামি ভাবছ তো? না। বিষয়টা তার চেয়ে অনেক গভীর। যাই হোক, এখন ওকে নিজের মতন থাকতে দাও। তুমি বরং আমার সঙ্গে চলো। সন্ধেটা খুব সুন্দর, একটু হেঁটে আসি।

একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম—বিশাখা ইতোমধ্যেই কারখানা-ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে। আমি চেন-তালার ফাঁক দিয়ে গলে হাসিদির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

তখনো চৈত্রমাস শেষ হয়নি। আগের দিন বিকেলে একটা ছোটখাটো কালবৈশাখীও হয়ে গিয়েছিল। তাই সন্ধের পর বাতাসে ঠান্ডার আমেজ ছিল। আকাশের গায়ে শহর কলকাতার আলোর দীপ্তি, তাছাড়া আর কোথাও মহানগরীর কোনো চিহ্নমাত্র দেখতে পাচ্ছিলাম না। অবশ্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর একটা ভারী কিছু মাটির ওপরে আছড়ে পড়ার শব্দ ভেসে আসছিল। জিগ্যেস করলাম, কীসের আওয়াজ?

হাসিদি বলল, ক্রেন-হ্যামার। বাইপাশের ওদিকে মেট্রোরেলের কাজ হচ্ছে তো। এখান থেকে সোজাসুজি গেলে বেশি দূরে নয়, কিন্তু সেভাবে কেউ যেতে পারবে না। মাঝখানে ওই ট্যাংরা স্লটার-হাউস আছে, কবরখানা আছে। তোমাদের গাড়ি আজ দুপুরে যেভাবে পাক খেতে-খেতে এসেছে, ওইভাবেই যেতে হবে। এই রাস্তাটার নাম জানো?

আমি ঘাড় নাড়লাম।

কবরডাঙা রোড। তবে লোকজন বলে 'গোরে বিবি কি মহল্লা'। গোরে বিবি মানে 'সাদা চামড়ার স্ত্রীলোক'। তার কথা নিশ্চয় কাপালি স্যার বলবেন তোমাকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ পাশাপাশি হাঁটলাম। তারপর যেন আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়েই হাসিদি বলল, জায়গাটা বেশ অদ্ভুত, তাই না? একবারও মনে হয়, কলকাতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ?

আমি ঘাড় নাড়লাম। সত্যিই মনে হয় না।

একদিকে ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির টানা পাঁচিল। অন্যদিকে ট্যাংরা স্লটার-হাউসের একইরকম পাঁচিলঘেরা মাঠ। মাঝখানে চাঁদের আলোয় ঘুমোচ্ছে গোরে বিবি কি মহল্লা। যতদূর চোখ যায় কোনো বাড়ি নেই, দোকান নেই। দুপাশে আকন্দ আর বনচাঁড়ালের ঝোপ। ওরকমই একটা ঝোপের গায়ে জাত-সাপের খোলশ ঝুলতে দেখলাম। দুটো বেজি ব্যস্তসমস্ত ভাবে আমাদের সামনে দিয়েই রাস্তা পেরিয়ে গেল।

বললাম, কলকাতায় কত গরিবলোক নেড়িকুকুরদের সঙ্গে মারপিট করে রাস্তার ধারে পড়ে থাকে। তারা কেউ কবরডাঙা রোডে থাকতে আসে না কেন?

হাসিদি বলল, জায়গাটার বদনাম তো আজকের নয়। এদিককার লোকজন প্রায় সত্তর বছর ধরে কবরডাঙাকে ভুতুড়ে জায়গা বলে জানে। রাস্তাটার দু-প্রান্তে দুটো বস্তি আছে। একটা তো নিশ্চয় আজ দুপুরে এখানে আসবার পথেই দেখেছ—যেটা পামার বাজারের দিকে পড়ে। অন্যটা ট্যাংরা সাইডে। এখানে কেউ আসবার চেষ্টা করলে বস্তির লোকেরাই তাকে আটকে দেয়। শুনেছি, নকশাল-পিরিয়ডে পুলিশ এখানে লাশ গুম করবার জন্যে ঢুকতে চেয়েছিল। পুলিশকেও ওরা ঢুকতে দেয়নি।

বললাম, তুমি এত কিছু জানলে কেমন করে?

হাসিদি বলল, জানবো না কেন? আমি যে ওই পামার বাজার বস্তিরই মেয়ে। আমার দাদু এই কারখানায় কাজ করেছেন।

কাচ কারখানায়?

না। তখন এটা ছিল ওষুধের কারখানা। সেটার মালিক ছিলেন কাপালি স্যারের দাদু। তারপর ওই বাড়িতেই চিনেমাটির বাসন বানাবার কারখানা তৈরি হল। কাপালি স্যারের দাদু ছিলেন সেই কারখানারও পার্টনার, তবে তখন আর বস্তির লোকেরা কাজ পায়নি। বাইরে থেকে কাজের লোক এসেছিল।

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা দুজনে একটা অদ্ভুত জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। মানে, আমার কাছে অদ্ভুত হাসিদির কাছে নিশ্চয় নয়। ঠিক ওই জায়গাটাতে কসাইখানার পাঁচিলটা হঠাৎই রাস্তা থেকে কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছিল। ফলে রাস্তার ধারে একটা খালি জমির টুকরো বেরিয়েছিল। হাসিদি আমার হাতে টান দিয়ে রাস্তা ছেড়ে ওই জমিটার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

ততক্ষণে রাতের অন্ধকার নেমে এসেছিল, তাই ওখানে পৌঁছনোর আগে অবধি বুঝতে পারিনি যে, ওটা সাধারণ ঘাসজমি নয়। পুরোনো আমলের পাতলা-ইট দিয়ে বাঁধানো একটা চত্বর। চত্বরটার মাঝখানে ভাঙাচোরা বেদির মতন একটা স্ট্রাকচার। হাসিদি একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, এসো রুদ্র। এখানেই বসি।

তাই বসলাম।

আমাদের পেছনে একটা ঝাঁকড়া গাছের ডালে কী যেন একটা রাতপাখি মাঝে মাঝে ডানা ঝটপট করে উঠছিল। সেই শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না কোথাও।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পরে হঠাৎই হাসিদি একদম বিনা-ভূমিকায় বলল, এই পৃথিবীর ভেতরে আরেকটা পৃথিবী মিশে রয়েছে, বুঝলে। সরবতের মধ্যে যেভাবে চিনি মিশে থাকে, সেইভাবে। কেউ কেউ মাঝে মাঝে সেই অন্য পৃথিবীটায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে। সবাই নয়। হয়তো এক কোটি মানুষের মধ্যে একজন। যারা পারে তারাও সবসময়েও পারে না। কখনো-কখনো পারে। তখন তাকে দেখে এই পৃথিবীর লোকেরা ভাবে অদ্ভুত অ্যাবনর্মাল ভৌতিক।

কিন্তু মোটেই ওসব কিছু নয়। শুধু চলার ভঙ্গির তফাতের জন্যে কি কাউকে অ্যাবনর্মাল কিম্বা ভৌতিক বলা যায়? এই যে তোমাকে সারাক্ষণ পায়ে গোল জুতো পরে হাঁটতে হয়, তার জন্যে কি তোমাকে অ্যাবনর্মাল বলা উচিত? এটাই তো এখন তোমার স্বাভাবিক চলন, তাই না?

জিগ্যেস করলাম, তোমরা কি ওরকম?

হাসিদি ওপরে নীচে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ ভাই। আমরা তিনজনেই ওরকম। আমি এখনো তোমার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না। কাপালি স্যার বলেননি আমাদের। বলবেনও না। উনি আমাদের পছন্দ করেন না। শুধু আমাদের প্রভুর ভয়ে আমাদের এখানে থাকতে দিয়েছেন। তবে আমি নিশ্চিত, তোমার মধ্যেও কিছু ক্ষমতা রয়েছে। তুমিও নিশ্চয় কখনো-কখনো সেই অন্য পৃথিবীতে পা রাখতে পারো। না-হলে কাপালি স্যার নিজে তোমাকে এই কাচ কারখানায় নিয়ে আসতেন না।

মিথ্যে করে বললাম, না, আমি ওসব কিছুই পারি না। আমি খুব সাধারণ একটা ছেলে। এই একটা পৃথিবীই আমার কাছে টু মাচ; অন্য পৃথিবীর ভার আমি বইতে পারব না। কিন্তু তোমরা কেমন একটু বলবে। কী পারো তোমরা?

হাসিদি বলল, পঙ্কজদা আর বিশাখা সম্বন্ধে আমি যেটুকু জানি বলছি। এই কারখানায় আসবার আগে তো আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না। তাই ওদের গোটা জীবনের কথা জানি না।

কারখানাটা মাঝখানে অনেক বছর বন্ধ হয়ে পড়েছিল জানো তো? দু-বছর আগে কাপালি স্যার এটাকে সারিয়ে-সুরিয়ে বাসযোগ্য করে তুলেছেন। তারও অনেক পরে, এই ধরো একমাস আগে আমরা এসেছি।

আমরা এসেছি আমাদের প্রভুর নির্দেশে। তাঁকে খুব কম লোক চেনে, কিন্তু এখানে তাঁর আসন আছে।

কোথায়? আমি চমকে চারপাশে তাকালাম।

হাসিদি বলল, সবখানেই। এই পুরো গোরে বিবি কি মহল্লাতেই তাঁর অধিষ্ঠান। তিনিই আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন। অবশ্য আমরা একসঙ্গে আসিনি দফায় দফায় এসেছি। আমাদের মধ্যে প্রথম এখানে এসেছিল পঙ্কজদা।

পঙ্কজদা যে বোবা তা তো দেখেছ। সেটা কথা নয়। বোবা তো অনেকই থাকে, কিন্তু পঙ্কজদা অন্যরকমের বোবা। ও একটা কী বলব...মাইকের মতন। মাইকের তো নিজের স্বর থাকে না, যন্ত্রটাকে হাতে নিয়ে যে কথা বলে তার গলাই মাইকের মধ্যে দিয়ে শোনা যায়।

অবাক হয়ে বললাম, কে কথা বলে পঙ্কজদার গলায়?

হাসিদি উত্তর দিল, যারা মারা গেছে, তারা। যে-আত্মারা সেই মুহূর্তে কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে, তারা পঙ্কজদাকে দেখলে লোভ সামলাতে পারে না। ওর মধ্যে দিয়ে তারা জীবিত মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে চলে আসে।

পঙ্কজদার বাড়ি ছিল সুন্দরবনের কোন একটা গ্রামে। বছর দুয়েক আগে কোটালের বানের তোড়ে ওর স্ত্রী আর দুই ছেলে ঘরের চাল চাপা পড়ে মারা যায়। ও ঠিক সেই-মুহূর্তে গোয়াল থেকে গরুগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে বেরিয়েছিল বলে বেঁচে গিয়েছিল। তারপর থেকেই ও বোবা হয়ে যায়।

ওর গ্রামের লোকেরা প্রথমে ভেবেছিল, বোধহয় শোকে পাথর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মাসখানেক কেটে যাওয়ার পরে পঙ্কজদা যখন অন্যান্য কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে করতে শুরু করল অথচ কথা বলল না, তখন সবাই বুঝল ও সত্যিকারেই বোবা হয়ে গেছে। ক্যানিং হাসপাতালে ডাক্তার-টাক্তার দেখিয়েছিল, লাভ হয়নি।

তারপর ক্রমশ ওই ব্যাপারটা সামনে এল। শুধু পুরুষদের নয়, কখনো মেয়েদের গলায়, কখনো বাচ্চাদের গলায় কথা বলে উঠতে লাগল পঙ্কজদা। অথচ ও কস্মিনকালেও যে হরবোলা ছিল না সেটা গ্রামের লোকেরা জানত।

হাসিদিকে ওর কথার মধ্যেই থামিয়ে প্রশ্ন করলাম, যেসব মৃতেরা ওর গলায় কথা বলত তারা কি ওর গ্রামেরই মানুষ?

উঁহু। ঘাড় নাড়লো হাসিদি। তাহলে তো একটা সন্দেহের জায়গা থাকত যে, পঙ্কজদা ওর চেনা লোকেদের গলার স্বর নকল করছে। কিন্তু অনেকসময় এমন কেউ এসে ওর গলার মধ্যে দিয়ে কথা বলে যেত যে হয়তো আগের দিনই অচেনা জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘের পাল্লায় পড়ে মরেছে। কিম্বা কিম্বা দূরের কোনো হাসপাতালে বাচ্চা হতে গিয়ে...আর পঙ্কজদা কেন, ওর গ্রামের কেউই তাদের নাম অবধি আগে কখনো শোনেনি। পঙ্কজদার গলায় তারা নিজেরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে যাওয়ার পরে সেই পরিচয় ধরে খোঁজ করতে গিয়ে ওর প্রতিবেশীরা জেনেছে, কোথাও ভুল নেই সত্যিই ক'দিন আগে অবধি অমন একজন মানুষ এই পৃথিবীতে ছিল।

তারপর? আমি জিগ্যেস করলাম।

তারপর যা হওয়া স্বাভাবিক, তাই হল। পঙ্কজ মিদ্যাকে তার গ্রামের লোকের ভয় পেতে শুরু করল। ওদের গ্রামে যত অকালমৃত্যু, যত দুর্ঘটনা, সবকিছুর জন্যে তারা এবার পঙ্কজদাকেই দোষারোপ করা শুরু হল। প্রথমে আড়ালে, তারপর সামনাসামনি। গালাগাল ক্রমশ মারধরে পৌঁছে গেল।

এদিকে বাস্তু-বাড়িটা ছাড়া ওই গ্রামে পঙ্কজদার আর বিশেষ কিছু ছিল না। বউ-ছেলেরা মারা যাওয়ার পর থেকে সেই ভিটেটাকেও অসহ্য বোধ হত। তাই পঙ্কজদা একদিন পালালো। কোথায় যাবে, কী করবে জানত না। জাস্ট ক্যানিং থেকে ট্রেনে উঠে শিয়ালদা স্টেশনে নেমেছিল। তবে শিয়ালদায় নামার পর ওকে যেন

কেউ হাত ধরে এখানে, এই কারখানায় টেনে নিয়ে এসেছিল। কাপালি স্যার ওকে তাড়াননি। কারখানায় একজন কেয়ারটেকারেরও দরকার ছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাসিদি বলল, বিশাখাও নিজে থেকেই এখানে এসেছিল। তবে ওর হাঁটাচলা তো দেখেছ। কেমন যেন ঘোরের মধ্যে হাঁটে, তাই না? সেইজন্যেই ও পঙ্কজদাকে ডাক দিয়েছিল ওকে নিয়ে আসার জন্যে।

পঙ্কজদা ওকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসেছিল। সেই দৃশ্য আমি দেখেছি। কারণ আমি তার ক'দিন আগেই এখানে চলে এসেছিলাম।

এরকমই এক সন্ধেবেলায় পঙ্কজদার গলা দিয়ে একটা কমবয়েসি মেয়ের আকুল কান্না শুনে চমকে উঠেছিলাম। আমি নিজে এক অলীক রাজ্যের বাসিন্দা, রুদ্র। তবু সেদিন ওই দশাসই লোকটার গলায় সেই কান্না শুনে আমিও কেঁপে উঠেছিলাম। মেয়েটা কাঁদছিল আর বলছিল, আমি কিচ্ছু চিনতে পারছি না। আমাকে নিয়ে যাও। আমার খুব ভয় করছে। বাঁচাও আমাকে।

পঙ্কজদা সম্মোহিতের মতন কারখানা থেকে বেরিয়ে গেল।

তুমি দৃশ্যটা কল্পনা কর রুদ্র! একটা মেয়ের ডাক শুনে পঙ্কজদা তাকে উদ্ধার করতে চলেছে, যে-ডাকটা আসছে ওর নিজের গলার ভেতর থেকে। এর প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে পঙ্কজদা একটা মেয়েকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে উঠোনে পা রাখল।

সেই প্রথমদিনেও বিশাখার পরনে এইরকমই কোরা কাপড় জড়ানো ছিল। তবে কাপড়টা ছিল জলে কাদায় মাখামাখি। শুধু কাপড় নয়, ওর গোটা শরীর। আমি পঙ্কজদাকে বললাম, মেয়েটাকে কারখানা-ঘরের মধ্যে শুইয়ে দাও আর জল গরম করে নিয়ে এসো। একটা আব্রুর ব্যাপার আছে তো। আমাদের ওই ছোট্ট বাথরুমের মধ্যে একটা অচৈতন্য মেয়ের সব কাপড়-চোপড় খুলে ধোয়া-মোছা করানো সম্ভব নয়।

পরদিন ওর জন্যে পামার বাজার থেকে আরো বেশ কিছুটা সাদা মার্কিন কাপড়ের থান আর কয়েক শিশি অগুরু কিনে আনলাম। ততক্ষণে বুঝে গেছি, ও দুটি জিনিস ছাড়া ওর চলবে না। একটু আগে যখন বিশাখা তোমার গালে গাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন অগুরুর গন্ধ পাওনি?

তখন মনে করতে পারিনি। হাসিদির কথায় সুগন্ধীর নামটা মনে পড়ল। ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ। পেয়েছিলাম।

তারপর বুঝলে রুদ্র, সেদিন যখন বিশাখার গা মুছিয়ে দিচ্ছি, তখনই প্রথম ওই বন্ধ-ফার্নেসের মধ্যে নিজে থেকে আগুন জ্বলে উঠতে দেখেছিলাম। সেদিনই তিনি প্রথমবারের জন্য আমাদের কাছে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ রেখেছিলেন।

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, বারবার কার কথা বলছ বলো তো?

হাসিদি বলল, পরে বলব। আগে কাপালি স্যারের কাছ থেকে ঘুরে এসো। এখন বললে বুঝতে পারবে না।

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম, মনে হচ্ছে সবটাই বানিয়ে-বানিয়ে বলছ।

হাসিদি রাগল না। শান্তভাবেই প্রশ্ন করল, কেন?

তুমিই একটু আগে বলেছিলে, শুধু মৃত-মানুষদের আত্মারাই পঙ্কজদার মুখ দিয়ে কথা বলে। কিন্তু বিশাখা তো একটা জলজ্যান্ত মেয়ে। বানিয়ে বলতে গিয়ে তুমি নিজের গল্প নিজেই গুলিয়ে ফেলেছ।

হাসিদি মুচকি হেসে বলল, আর বিশাখা যদি জ্যান্ত মেয়ে না হয়? পঙ্কজদা সেদিন যখন ওকে পাঁজাকোলা করে ধরে কারখানায় ঢুকেছিল, তখন আমি কিন্তু ওর মধ্যে কোনো প্রাণের লক্ষণ দেখিনি। জানো তো, মরার পরে কিছুক্ষণ মানুষ বুঝতে পারে না যে, সে মারা গেছে। সেইজন্যেই বিশাখার আত্মা বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছিল। এর মধ্যে কোনো ভুল নেই।

আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম।

হাসিদি বলল, বিশাখা এমনিতে মরাই। শুধু ওর শরীরটা মরেনি। মরবে না। ও জোম্বি হয়ে গেছে। দুপুরে বিশাখাকে ওর ফ্যানেভাত খাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করেছিলে না? ও প্রতিদিনই তাই খায়। জোম্বিরা নুন খেতে পারে না। ওর মাসিক হয় না। সেই যে কোরা কাপড় আর অগুরু দিয়ে ওর মৃতদেহকে ঢাকা হয়েছিল, সে দুটো জিনিসের মায়াও ছাড়তে পারে না। এরকম আরো অনেক রহস্য আছে মেয়েটার মধ্যে। আমাদের তিনজনের মধ্যে ওকেই মনে হয় প্রভু সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। কী জানি, হয়তো মরে গেছে বলেই।

মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছিল। ভাবছিলাম, খুব ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যখন আমরা হেঁটে যাই, তখন যাদের সঙ্গে ধাক্কা লাগে, তারা সকলেই কি স্বাভাবিক মানুষ? যদি তাদের মধ্যে একজন পঙ্কজ মিদ্যা থাকে কিম্বা একজন বিশাখা? শুধু ওদের কথাই বা ভাবছি কেন? আমি নিজে কী? আমাকে দেখে কেউ বুঝতে পারবে, দু-পায়ে চামড়ার গোল-গোল জুতো পরে যে ছ'ফুটিয়া ছেলেটা সামনে দিয়ে চলে গেল, তার মাথার ভেতরে সারাক্ষণ একটা শুঁয়োপোকা গুটি বুনে চলেছে?

সেই রাতচরা পাখিটা হঠাৎ আমাকে প্রচণ্ড চমকে দিয়ে পেছনের গাছটা ছেড়ে কসাইখানার দিকে উড়ে গেল। যাবার সময় আমার চিন্তার সুতোটাও কেটে দিয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসিদিকে জিগ্যেস করলাম, আর তুমি? তোমার কোনো করিশমা নেই?

হাসিদি একটু ঢং করে বলল, থাকলেই বা বলব কেন? তুমি বলেছ তোমার করিশমার কথা? যেদিন তুমি বলবে সেদিন আমিও বলব। চলো এখন উঠি।

বেশ, তাই বোলো।

আমরা উঠে পড়লাম। পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে পৌঁছে গেলাম কারখানার গেটে। গেটটা যখন খুলছিলাম তখন হাসিদি আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, ও নেই।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কারখানার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। সবুজ ফসফোরেসেন্সের ভেতর দিয়ে হেঁটে পেছনের দরজা, সেই দরজা খুলে আবার উঠোন, ব্যারাকবাড়ি। অবাক হয়ে দেখলাম, হাসিদি রান্নাঘরে গ্যাস-উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে রুটি সেঁকছে। আমাকে দেখে বলল, বাবা! অনেক দূর চলে গেছিলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, মানে! তুমি জানো না কোথায় গিয়েছিলাম? সত্যিই ভালো অ্যাকটিং করতে পারো। আচ্ছা, তুমি কোনদিক দিয়ে ঢুকছ বেরোচ্ছ বলো তো।

হাসিদি চাটুটা উনুন থেকে নামিয়ে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে-আস্তে বলল, এখানে ঢোকা-বেরোনোর একটাই রাস্তা। তুমি কি আমাকে বাইরে দেখলে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কী যা-তা বলছ? মাথা খারাপ হল তোমার? কার সঙ্গে এতক্ষণ বসেছিলাম? কে আমাকে পঙ্কজদা আর বিশাখার গল্প শোনাল? ভূতে?

হাসিদি আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বলল, না, ভূত কেন হবে? আমিই। আমিই ছিলাম তোমার সঙ্গে। আসলে এই পৃথিবীতে দুজন হাসি মণ্ডল আছে। একজনের সঙ্গে আরেকজনের দেখা হয় না। তবে অন্য অনেকেই একইসময়ে দু-জায়গায় দুজনকে দেখেছে। আজ যেমন তুমি দেখলে।

আমার মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল। একটা চেয়ারের ব্যাকরেস্ট আঁকড়ে ধরে বললাম, ও কি তাহলে আসল হাসিদি নয়?

কে জানে! হাসিদি থমথমে মুখে বলল, হয়তো আমিই আসল হাসি মন্ডল নই।

## চার

দুপুরে ঘুম আসাটা যত সহজ হয়েছিল, রাতে হল ঠিক তার বিপরীত। কিছুতেই ঘুম আসছিল না। আসলে দুপুরে তো শরীর অনেকটাই বিশ্রাম পেয়ে গিয়েছিল। তার ওপরে এরকম অদ্ভুত জায়গা, অদ্ভুত সব ঘটনা। হাসিদির আশ্চর্য বিবৃতি। সবমিলিয়ে রগের শিরাগুলো দপদপ করতে শুরু করেছিল।

আমি জানি, দশটা-পাঁচটা অফিস করেন যে ভদ্রমহোদয় ভদ্রমহোদয়াগণ, কিম্বা কলেজে পড়ে যে যুবক-যুবতীরা, কিম্বা দোকানে খাতা লেখে এরকম কোনো মানুষ—আজ সারাদিন যে-অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমি গেলাম, সেরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলে—হয় চিৎকার করত, না-হলে পুলিশ ডাকত। কিছুই না করলে অন্তত এই জায়গাটা ছেড়ে পালাত। কিন্তু আমি ওসব কিছুই করতে পারব না। আমি অপেক্ষা করব, কারণ আমি জানি, এই সবই সত্যি। বিশাখার মৃত্যু সত্যি। হাসিদির জোড়া-অস্তিত্ব সত্যি। পঙ্কজদার ভেতরে মৃত আত্মার সঞ্চারও সত্যি।

মাথার ভেতরে যে পোকাটা ঘুরে-ঘুরে এতদিন ধরে গুটি বুনছিল, তার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এই মুহূর্তে যদি আমার খুলিটা একটা কৌটোর ঢাকনার মতন খুলে ফেলা যায়, তাহলে দেখা যাবে পুরো খুপরিটা জুড়ে একজন গুড়িসুড়ি মেরে শুয়ে আছে। সে কে? জানি না। হয়তো আমার মৃত্যু।

অনেকক্ষণ বিছানার ওপরে ছটফট করতে-করতে অবশেষে রাত দেড়টা কি দুটো নাগাদ হালকা তন্দ্রার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে বেশিক্ষণের জন্যে নয়। এক রক্ত হিম করা আওয়াজে ছিটকে বিছানার ওপরে উঠে বসলাম।

ওটা কোন প্রাণীর চিৎকার ভেসে এল আমার বন্ধ জানলার বাইরে, উঠোনের দিক থেকে?

কুকুর নয়। কুকুরের ডাকের মধ্যে অমন অশুভ ইঙ্গিত, অমন মৃত্যুর আতঙ্ক মিশে থাকে না।

বিছানা থেকে উঠে পা টিপে-টিপে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘরের আলোটা জ্বালতেই পারতাম, কিন্তু জ্বালিনি। মনে হয়েছিল, জন্তুটা যদি আলো দেখে পালিয়ে যায়। আমি ওটাকে স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু জানলার পাল্লা সামান্য ফাঁক করে যে-দৃশ্য দেখলাম, তেমন দৃশ্যের কথা কোনোদিন দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি।

পূর্ণিমার রাত ছিল সেটা। কাপড়-কাচা গোলা সাবানের মতন হড়হড়ে আর হলুদ একটা চাঁদ উঠেছিল আকাশে। সেই মরা-চাঁদের ঘোলাটে আলোয় উঠোনটাকে তখন আরো বড় মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল উঠোন নয়, একটা পাহাড়ি-উপত্যকা। কারখানা-ঘরের চিমনির মুখে আগুনের আভা হিলহিল করে কাঁপছিল। তার মানে ফার্নেসে নতুন করে আগুন জ্বলে উঠেছে। কীভাবে?

জ্যোৎস্না আর আগুনের আভায় মাখামাখি সেই উঠোনের ঠিক মাঝখানে দুহাতে দুটো আগুনের মালসা নিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচ করছিল এক নগ্ন নারী; কালো কাজল দিয়ে আঁকা তার শরীর। আমি সেই নারী-শরীরের প্রতিটি বক্ররেখা, প্রতিটি উত্তল-অবতল, এমনকি তার বামস্তনের বৃন্তের নীচে একটা নীল জড়ুল অবধি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম।

সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম, কারণ পুরো দৃশ্যটার মধ্যেই এক আদিম জাদু ছিল। ওই উঠোন কি দু-হাজার একুশ সালের কলকাতার কোনো বাড়ির উঠোন নাকি হিমযুগের কোনো গুহামুখ? ওই আগুন কি কোনো কারখানার ফার্নেসের আগুন না গুহাবাসীদের অগ্নিকুন্ডের? আর ওই নগ্নিকা—ও তো আজকের কেউ নয়ই! হতেই পারে না। ওর ওই নগ্নতা, ওর ওই দু-হাতে আগুনের মালসা নিয়ে ঘুরে-ঘুরে নাচ—ওই নাচ আজকের পৃথিবীর নয়।

পূর্ণিমার রাতে হাসি মণ্ডল এক গুহামানবী হয়ে গিয়েছিল।

যেন আমার চিন্তার সঙ্গে তাল মিলিয়েই হঠাৎ আমার ঘরের সামনের সেই টানা দালানেরই অন্য প্রান্ত থেকে আবার সেই ক্ষুধার্ত নেকড়ে ডাক ভেসে এল—ওওও ওউ ওউ ওউ। উ উয়া। উ উয়া। উ উয়া।

আবারও আমার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। মানুষের কৌতূহল অদম্য! তাই জানলার পাল্লাদুটো আরো একটু ফাঁক করে চোখদুটো গরাদের ফাঁকে প্রায় সেঁটে দিয়ে কোনোরকমে দালানের ওই কোণটাকে নজরের মধ্যে নিয়ে এলাম। দেখলাম সেখানে দাঁড়িয়ে পঙ্কজ মিদ্যা একমনে হাসিদির নাচ দেখছে। আমি তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই বোবা মানুষটা আবার চাঁদের দিকে মুখ তুলে নেকড়েবাঘের গলায় চিৎকার করে উঠল—উউউ হাহাহা। হাহাহা হাহাহা উউউ।

পরক্ষণেই দালান থেকে উঠোনে ঝাঁপিয়ে পড়ল পঙ্কজ মিদ্যা। চার হাতে- পায়ে দৌড়ে গেল হাসিদির দিকে। অবিকল এক নেকড়ের মতোই ওকে ঘিরে লাফাতে শুরু করল। বহুদিন পরে প্রভু ঘরে ফিরলে তাকে ঘিরে পোষা কুকুরগুলোও ঠিক এইভাবে নাচতে দেখেছি। এটা নেকড়ের উল্লাস।

হঠাৎই হাসিদির সেই কথাটার মানে পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। ও বলেছিল না, পঙ্কজদা পুরুষমানুষই নয়? সত্যিই তো নয়। মানুষই নয় পঙ্কজ মিদ্যা, তার আবার নারী আর পুরুষ। ও একটা নেকড়েবাঘ।

আরেকজনকেও এবার দেখতে পেলাম। বিশাখা। ব্যারাকবাড়ি থেকে নয়, অবাক হয়ে দেখলাম ভিজে কাপড়ে কারখানা ঘরের পেছনের দরজাটা খুলে বিশাখা বেরিয়ে এল। তারপর নৃত্যরতা হাসিদিকে মাঝখানে রেখে বিশাখা আর সেই নেকড়েটা গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল।

মাঝখানে একবার বিশাখা মুঠো থেকে কী যেন একটা গুঁড়ো পদার্থ হাসিদির হাতে ধরে-থাকা আগুনের মালসাটার মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া মাত্র গলগল করে সবজেটে ধোঁয়া বেরিয়ে এসে আমার চোখের সামনের সমস্ত দৃশ্য আবছা করে দিল। কী কটু গন্ধ সেই ধোঁয়ায়! মনে হল শ্বাসনালি পুড়ে যাচ্ছে। অথচ ওদের তিনজনকে দেখে মনে হচ্ছিল গন্ধ-টন্ধ কিছু টেরই পাচ্ছে না।

আমি পারলাম না, আমার অত সহ্যশক্তি নেই। জানলার পাল্লাদুটো বন্ধ করে দিয়ে ছুটে গেলাম ঘরের কোনায়, যেখানে জলের কুঁজো আর গ্লাস রাখা ছিল। ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেলাম। কিছুটা জল হাতের চেটোয় নিয়ে ঘাড়ে মুখে থাবড়ালাম। একটু আরাম পাওয়ার পর ভাবলাম, আরেকবার জানলা খুলে দেখি। মনে আশা ছিল, হয়তো দেখব উঠোন ফাঁকা; এতক্ষণ যা দেখেছি সবই ছিল আমার চোখের ভুল।

ভুল ভেবেছিলাম। যা দেখে গিয়েছিলাম, তার চেয়ে আরো বীভৎস দৃশ্য অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। জানলার পাল্লাদুটো আবার অল্প একটু ফাঁক করে তার মধ্যে চোখ লাগাতেই দেখতে পেলাম, হাসিদি তার নাচ থামিয়ে, চার-হাত-পায়ে ভর দিয়ে, মাটির ওপরেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে। মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে নীচে। রাশি-রাশি চুলের আড়ালে ওর শরীরের ওপরের অংশটা ঢাকা পড়ে গেছে।

ওর ঝুঁকে পড়া মাথার সামনে বিশাখা যে-জিনিসটাকে দুদিকে টান দিয়ে ধরে রেখেছিল, সেটাকে একটা প্রাণী বলে চিনতেই পারতাম না, যদি না হতভাগ্য কালো বেড়ালটা একবার ওর গলার ওপরে বিশাখার হাতের মুঠির চাপ আলগা হওয়ামাত্রই মরণ-যন্ত্রণায় কঁকিয়ে কেঁদে না উঠত। পরক্ষণেই হাসিদি এক ঝটকায় মুখটা ওপরে তুলে বেড়ালটার কণ্ঠনালিতে দাঁত বসিয়ে দিল। নেতিয়ে পড়া বেড়ালটাকে ওর মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বিশাখা নিখুঁত লক্ষে কারখানা-ঘরের দরজার দিকে ছুড়ে দিল আর সেই-মুহূর্তেই বন্ধ-দরজাটা আবার খুলে গেল।

ঘরের ভেতরে আগুন জ্বলছিল বলে দরজাটাকে দেখাচ্ছিল অন্ধকার দেয়ালের গায়ে একটা আগুনরঙের আয়তক্ষেত্রের মতন।

আগুনের সেই চৌকো ফ্রেমের মাঝখানে কয়েকমুহূর্তের জন্যে একজনকে দেখতে পেলাম। এক বিশাল পুরুষশরীর—ষাঁড়ের মতন মাথা। আগুনের আভার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন বলে তাঁকে কালো পাথরের মূর্তির মতন দেখাচ্ছিল। বিশাল দুই বাহু সামনে বাড়িয়ে তিনি মরা বেড়ালটাকে লুফে নিয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। তাঁর পেছন-পেছন ঢুকে পড়ল বিশাখা, হাসিদি আর সেই নেকড়ে বাঘটা যাকে কিছুক্ষণ আগে অবধি আমি পঙ্কজ মিদ্যা বলে জানতাম। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

কাচ কারখানার পুরো কম্পাউন্ডটা এখন অস্বাভাবিক শান্ত। একটা ঝিঁঝিপোকা অবধি ডাকছে না কোথাও। আমি জানলাটা বন্ধ করে বিছানার ওপরে লুটিয়ে পড়লাম। এখন একটু ঘুম দরকার আমার—গভীর ঘুম। না-হলে রক্তের চাপে মাথার ভেতরের শিরা-উপশিরা সব ছিঁড়ে যাবে।

ব্যাগ হাতড়ে একটা বাদামি কাচের শিশি বার করে এনে ভেতর থেকে কয়েকটা সাদা ট্যাবলেট হাতের তালুতে ঢেলে নিলাম। যখন খুব যন্ত্রণা বাড়ত, তখন...একমাত্র তখনই লেপ্রসি-সেন্টারের ডাক্তারবাবু এই ট্যাবলেটটা আমাকে খাওয়াতেন। একসঙ্গে দুটো ট্যাবলেট মুখে পুড়ে জল দিয়ে গিলে ফেললাম। মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে আমার চোখ বুজে এল। এটা খেলে প্রতিবারই তাই হয়।

সেই ঘুম ভাঙল বেলা দশটায়। ওরা কেউ আমাকে ডাকেনি, নিজে থেকেই ভাঙল। কিছুক্ষণ চৌকির কিনারায় মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলাম। যন্ত্রণায় মাথা ফেটে যাচ্ছিল। কাল রাতে একসঙ্গে দুটো ট্যাবলেট খেয়ে নেওয়ার এফেক্ট? তাই হবে। কিছুক্ষণ ওইভাবে বসে থাকার পর নিজের মনেই বললাম, না। যা দেখেছি সব ভুল। ওসব কিছুই ঘটেনি। আমি দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম।

কুঁয়োতলায় গিয়ে এক-বালতি ঠান্ডা জল তুলে মাথাটা ধুয়ে নিলাম। একটু আরাম হল। গামছা দিয়ে মাথাটা মুছতে-মুছতেই বুঝতে পারলাম, আমার পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে দেখলাম, ঠিকই। হাসিদি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে। খুব সাবধানী চোখে আমার কাজকর্ম লক্ষ করছিল।

আমি তীব্রদৃষ্টিতে হাসিদিকে আপাদমস্তক জরিপ করলাম। ঠিক এই উঠোনেই কয়েকঘণ্টা আগে ওকে নগ্ন হয়ে ঘুরতে দেখেছিলাম।

দেখেছিলাম কি? সত্যিই দেখেছিলাম? নাকি সবটাই আমার অন্তর্গত অভিশাপের ফসল—হ্যালুসিনেসন। এই প্রশ্নটার উত্তর আমার জানা দরকার এবং এখনই দরকার। জানবার একটাই উপায় আছে।

একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে নিলাম, হাসিদি ছাড়া আর কাউকে সামনা-সামনি দেখা যাচ্ছে না। হাসিদি বোধহয় আমার মনের কথা বুঝে থাকবে—বলল, ওরা এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। আমিই শুধু তোমার ঘুম ভাঙার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। তুমি চান করবার সময়েও পায়ের জুতো খোলো না রুদ্র?

প্রায় চিৎকার করেই বললাম, না। খুলি না। কতবার বলব?

হাসিদি একটুও ভয় পেল না। বরং ওর চোখ দেখে মনে হল, ও বলতে চাইছে, এসো জোসেফ রুদ্রনাথ এক্কা। দেখে নাও, যা তুমি দেখতে চাইছ। সন্দেহমুক্ত হও।

আমি কুঁয়োতলা থেকে প্রায় দৌড়ে গিয়েই ওর হাত চেপে ধরলাম। তারপর এক হেঁচকা টানে ওকে ঢুকিয়ে নিলাম কলঘরের মধ্যে। ও একটু 'উঃ' শব্দ অবধি করল না। অদ্ভুত শান্ত-চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ওর কুর্তার বোতামগুলো দ্রুত হাতে খুলতে শুরু করলাম। আমার মাথা ঝুঁকে পড়েছিল হাসিদির বুকের ওপরে আর আমার ভিজে মাথা থেকে ঝরে পড়া জলের ফোঁটায় ওর কুর্তার বুকের কাছটা ভিজে যাচ্ছিল।

তাড়াহুড়োয় আমি একটা বোতাম ছিঁড়ে ফেললাম। হাসিদি আমার হাতটা ঠেলে দিয়ে গম্ভীরমুখে বলল, সরো। আমি খুলছি।

নিজের হাতেই কুর্তাটা খুলে ফেলল হাসিদি। দেখলাম গোলাপিরঙের সস্তার প্যাডেড ব্রায়ের নীচে ওর শিশুমুঠি দুই স্তন। ওই ছোট স্তনকে বড় করে দ্যাখানোর ইচ্ছেটা দেখে আমার আবার মনে হল, না, এ নয়। এ তো পামার বাজার বস্তির সামান্য একটা মেয়ে। দু-হাতে দুটো আগুনের মালসা নিয়ে উঠোন জুড়ে উদ্দাম-নৃত্য এর দ্বারা সম্ভবই নয়। তবু নিশ্চিত হবার জন্যে আমি দু-হাতের মুঠোয় ওর ব্রায়ের কাপদুটোকে খামচে ধরে ওপরে তুলে দিলাম আর তুলে দিয়েই বুঝতে পারলাম, এই সেই অলৌকিক নর্তকী। কারণ, ওর বামস্তনের নীচে এই তো সেই নীল জড়ুল।

এতক্ষণ যে মনের জোরটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেই জোরটা হঠাৎই আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আমার পা দুটো থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। বুঝতে পারলাম, কাল রাতে যা দেখেছি, যা শুনেছি, তার কিছুই আমার কল্পনা নয়; যেমন কল্পনা নয় আমার মাথার ভেতরে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে বসে থাকা সেই প্রাণীটি কিম্বা কাল রাতে কারখানা-ঘরে পেছনের দরজা খুলে একমুহূর্তের জন্যে যে দেখা দিয়েছিল, সেই বৃষমানুষ।

আমি অসহায়ের মতন চৌবাচ্চার পাড়েই বসে পড়লাম।

হাসিদি আমার দিকে পিছন ফিরে ওর অন্তর্বাস ঠিক করে নিল। কুর্তাটা আবার পরে নিয়ে, আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, ভয় পেও না, রুদ্র। আমি, পঙ্কজদা, বিশাখা, আমরা সবাই খুব সাধারণ মানুষ। আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। বরং আমরাই চারিদিকের স্বাভাবিক মানুষদের ভয়ে মরতে-মরতে, পালাতে-পালাতে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি। লুসিফার আমাদের তার আশ্রয়ে ডেকে নিয়েছেন। চলো, খাবার ঘরে গিয়ে বসি।

খাবার ঘরের টেবিলের দুপাশে দুটো চেয়ার টেনে আমি আর হাসিদি বসলাম। হাসিদি আমাকে জলখাবার সাজিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমার খেতে ইচ্ছে করছিল না। হাসিদি কিছুক্ষণ চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, বুঝতে পারছি, তুমি কাল রাতে আমাদের সাবাথ দেখেছ।

'সাবাথ'! শব্দটা এই প্রথমবার শুনলাম, তাই মানে বুঝলাম না।

আমি যে বুঝতে পারিনি সেটা হাসিদি বুঝতে পারল। বলল, সাবাথ মানে লুসিফারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার দিন। বছরে দুবার এমন দিন আসে। কাল ছিল তার মধ্যে একটা।

মনে মনে ভাবলাম, কাপালি স্যার কি জানেন, তার কারখানার মধ্যে এই বহিরাগত নারী-পুরুষগুলি কী করে চলেছে? কিছুই কি জানেন না? না জানলে হঠাৎ আমাকে এখানে নিয়ে আসার কারণ কী? আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি এই তিন উড়ুক্কু ঝরাপাতার দলে আমিও আরেক ঝরাপাতা। যে-অপার্থিব বাতাস ওদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সেই একই হাওয়া আমার শরীরে বুনে দিয়ে গিয়েছিল কুষ্ঠ রোগের বীজ। আমার মুখ দিয়ে নিজের মনেই বেরিয়ে এল একটা শব্দ—বেচারা।

কাকে বলছ? জিগ্যেস করল হাসিদি।

বললাম, তোমাকে। না, তোমাদের।

তারপর একটু ভেবে বললাম, নিজেকেও বলছি।

## পাঁচ

সেদিনই রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আমি, পঙ্কজদা আর হাসিদি রাতের খাবার খেতে বসেছিলাম। বিশাখা যে কেন শুধু দুটো শুকনো রুটি নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল, তার ব্যাখ্যা আর কোনোদিন কারুর কাছে চাইবার দরকার পড়বে না আমার। পুরো খাওয়ার সময়টায় কেউ কোনো কথা বললাম না। কেউ কারুর মুখের দিকে তাকালাম না। শুধু খাওয়া শেষ হওয়ার মুখে একবার নিজের মনেই বলে ফেললাম, আজ বোধহয় আর কাপালি স্যার দেখা করবেন না। ভুলে গেছেন মনে হয়।

হাসিদি বলল, উঁহু। উনি কিছু ভোলেন না। ক'টা বাজল? পৌনে-ন'টা? এবার প্রশান্তদা চলে আসবেন। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও।

হাসিদি ভুল বলেনি। খাওয়া শেষ হয়েছে কি হয়নি, বাইরে থেকে গাড়ির হর্নের আওয়াজ পেলাম। বেরোনোর আগে হাসিদিকে জিগ্যেস করলাম, তোমরা কি শুয়ে পড়বে? তাহলে আমি ঢুকব কেমন করে?

হাসিদি বলল, কেউ শোব না। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুরে এসো।

দুপুরে যে-রাস্তা ধরে গোরে বিবি কি মহল্লার কাচ কারখানায় পৌঁছেছিলাম, সেই রাস্তা ধরেই আবার ফিরে চললাম। সেই পামার বাজার বস্তি, বেলেঘাটা খাল। শিয়ালদা স্টেশন চত্বর পেরিয়ে প্রাচী সিনেমার সামনে থেকে গাড়ি বাঁদিকে বাঁক নিল। রাস্তাটার নাম সার্পেন্টাইন-লেন।

'সার্পেন্টাইন' মানে যে 'সর্পিল' সেটা জানতাম। দেখলাম নামটা সার্থক। এত রাতেও কোলেবাজারে ব্যাপক ভিড়। সেই ভিড় কাটিয়ে ঠিক সাপের মতোই এঁকেবেঁকে চলল আমাদের ফিয়াট গাড়ি। নেড়িকুকুর, ঝাঁকামুটে, ঠেলাগাড়ি এবং পথশিশুদের বাঁচিয়ে প্রশান্তবাবু যেভাবে গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা শুধু একজন লোকাল-ড্রাইভারের পক্ষেই সম্ভব। বাইরের ড্রাইভার হলে এতক্ষণে দশবার ভিড়িয়ে দিত।

গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সার্পেন্টাইন লেনের রাতের চেহারা দেখছিলাম। আশ্চর্য রাস্তা। আশ্চর্য তার দুদিকের পাড়াগুলো। চলতে-চলতে একসময় মনে হল, কোনো অলৌকিক উপায়ে অন্তত পঞ্চাশ-বছর পিছিয়ে গিয়েছি। কোথায় ঝলমলে ত্রিফলা-আলো আর কোথায়ই বা রোল-পরোটা, সালোয়ার-কামিজ কিম্বা মোবাইল-ফোনের দোকান?

অনেকখানি তফাতে তফাতে একটা করে মিটমিটে ল্যাম্পপোস্ট। পুরোনো আমলের দোতলা তিনতলা বাড়িগুলো গায়ে-গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে; তাদের দেয়ালে শ্যাওলার সবুজ ছোপ। রেন-ওয়াটার পাইপের খাঁজে বড়-বড় বট অশথের গাছ গজিয়ে উঠেছে। দোকান বলতে শুধু দু-একটা মুদিখানা। তিনটে ধোপাখানা দেখলাম—যেখানে কয়লার উনুনের আঁচে বসিয়ে ধোপারা আদ্যিকালের লোহার ইস্ত্রি গরম করছিল। এমনকী কতবছর বাদে সত্যিকারে একটা পাথুরে কয়লার গোলা অবধি দেখতে পেলাম।

মিনিট দশেক গড়িয়ে-গড়িয়ে গাড়ি চলল। রাস্তা পেরোলাম বোধহয় সাকুল্যে পাঁচশোমিটার, তার বেশি নয়। তারপরেই সার্পেন্টাইন লেনের গা থেকে বেরিয়ে যাওয়া আরেকটা কানা-গলির মুখে গাড়ি পার্ক করলেন প্রশান্তবাবু। গাড়ি থেকে নেমে আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

আগেই বলেছি, কথাবার্তায় পঙ্কজদার সঙ্গে ভদ্রলোকের মিল আছে। পঙ্কজদা তবু গোঁ-গাঁ আওয়াজ করে, ইনি একেবারেই সাইলেন্ট-পিকচার। এখনও মুখে কিছু না বলে, ইশারায় ওঁকে ফলো করতে বললেন। ল্যাম্পপোস্টের ম্লান আলোয় দেখতে পেলাম, মোড়ের বাড়িটার ইট বার করা দেওয়ালের গায়ে কবেকার পুরোনো একটা নীল এনামেল করা টিনের ফালির ওপরে সাদা রঙের বাঙলা হরফে লেখা আছে 'কবিরাজ-বাড়ি বাই লেন'।

প্রশান্তবাবু গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আমি ওঁকে অনুসরণ করলাম। বেশি নয়, মিনিট দুয়েক হাঁটার পরেই পৌঁছে গেলাম একটা দোতলা বাড়ির সদর দরজায়। বাড়িটা বহু পুরোনো। দেখলে বোঝা যায়, এককালে বেশ পয়সা খরচা করে বানানো হয়েছিল। কিন্তু এখন একেবারেই জরাজীর্ণ দশা। রাস্তার দিকে চওড়া থামের ওপরে ঢালাই লোহার অপূর্ব কারুকার্য করা রেলিং দিয়ে ঘেরা ঝুলবারান্দা; কিন্তু সেই রেলিং জায়গায় জায়গায় হাওয়া হয়ে গেছে। নারকোল দড়ির টানা দিয়ে ফাঁকগুলো বোজানো হয়েছে। সদর দরজার দুটো পাল্লাই দু-দিকে কেতরে পড়েছে। সদর পেরিয়ে ভিতরে উঠোন। চৌকো উঠোনটাকে ঘিরে তিনদিকে ঘর। চতুর্থদিকে ঠাকুরদালান। দেয়ালের গায়ে একটা একশো-ওয়াটের বালব ঝুলছিল, কিন্তু বিশাল উঠোনের সর্বত্র আলো ফেলার পক্ষে সেটা নেহাতই কমজোরি। তাই উঠোনের এখানে-ওখানে ঘন ছায়া জমে।

একপলক দেখে মনে হল, বাড়িটার দুটো তলা মিলিয়ে অন্তত দশ-বারোটা ঘর রয়েছে। কিন্তু আলো জ্বলছে সাকুল্যে দুটো ঘরে। একটা একতলায় আর অন্যটা দোতলায়। বাকি ঘরগুলো আর ঠাকুরদালান অন্ধকারে ডুবে আছে।

একতলার ঘরটার খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে চোখ চলে যেতেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ঘরটা বেশ বড়। দেয়ালে ক্যাটকেটে সবুজ এলাচ রঙের পোঁচ। এখানে-ওখানে রঙের চলটা খসে পড়েছে। দেয়াল থেকে খোলা তারে দুটো টিউবলাইট ঝুলছিল। অতি রদ্দি একটা সিলিং-ফ্যানও ঘুরছিল নিশ্চয় ভেতরে; তার কটকট শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

দেখলাম, ঘরটার এককোনায় কাঠের টুলের ওপরে কুড়ি-লিটারের একটা মিনারেল-ওয়াটারের জার আর কয়েকটা প্লাস্টিকের গ্লাস রাখা আছে। দেয়ালে টান দিয়ে বেঁধে-রাখা একটা নাইলনের দড়িতে ঝুলছে মেয়েদের জামাকাপড়...অন্তর্বাস ইত্যাদি। কয়েকটা প্লাস্টিকের চেয়ার ছাড়া ঘরটায় আসবাব বলতে আর কিছু ছিল না, তবে মেঝেতে একটা টানা বিছানা পাতা ছিল। সেই বিছানার জন্যে ব্যবহৃত টুটাফুটা ফোমের গদি আর ময়লা সাদা চাদরগুলো নিঃসন্দেহে পাড়ার ডেকরেটরের সম্পত্তি। মফসসলের দিকে বরযাত্রীদের একরাত থাকার জন্যে ঠিক এইরকম ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

তবে এই ঘরে বরযাত্রী ছিল না। তার বদলে মেঝের বিছানার ওপরে দুটি সাদা চামড়ার মেয়ে অলসভঙ্গিতে শুয়ে সেলফোন নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। আরেকজন ফরেনার, সে-ও এক উদ্ভিন্ন যুবতী, একটা চেয়ারে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল। গ্রীষ্মকালে আমাদের রঘুপুরের অনাথ-আশ্রমের বাইরে যেরকম পোশাকে মেমসাহেবদের গাড়ি থেকে নামতে দেখেছি, এই মেয়েগুলির পরনেও ঠিক সেইরকম খোলামেলা পোশাক। শর্টস আর গেঞ্জির বাইরে ওদের সুপুষ্ট স্তন আর উরু অনেকটাই বেরিয়েছিল।

আমি দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতেই উঠোনের এককোণের কলঘরের টিনের দরজা খুলে ঠিক ওইরকমই আরেকটি মেমসাহেব বেরিয়ে এল। চান করেই বেরোল নিশ্চয়ই। তার সোনালি চুল থেকে টপটপ করে জল ঝরছিল। কোনোরকমে একটা বড় তোয়ালে দিয়ে গলার নীচ থেকে হাঁটুর ওপর অবধি শরীরকে ঢেকে রেখেছিল মেয়েটি। আমার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে সেও ওই হলঘরের মধ্যেই ঢুকে গেল। ঢুকেই খোলা দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিল। আর কিছু দেখতে পেলাম না।

প্রশান্তবাবুর দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে জিগ্যেস করলাম, এরা?

প্রশান্তবাবু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, পেশেন্ট।

আমি আরেকটু ব্যাখ্যা আশা করছিলাম। এত স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা কোন অসুখে আক্রান্ত হল? ডাক্তারই বা কে? কিন্তু প্রশান্তবাবু আমার প্রশ্নাতুর ভঙ্গিকে উপেক্ষা করে বললেন, চলুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

দালানের এককোনা থেকে ক্ষয়ে-যাওয়া একটা ইটের সিঁড়ি ওপরে উঠে গিয়েছিল। সেই সিঁড়ি ধরে প্রশান্তবাবু আমাকে নিয়ে সটান উঠে গেলেন বাড়ির দোতলায়। দোতলার সেই একমাত্র আলো-জ্বলা ঘরটার দরজায় একটা ভারী পর্দা ঝুলছিল। প্রশান্তবাবু বাইরে থেকে গলা তুলে বললেন, স্যার, রুদ্রবাবু এসেছেন।

ভেতর থেকে উত্তর এল, বেশ। তুমি কিন্তু ওয়েট কোরো প্রশান্ত। রুদ্রকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

আচ্ছা স্যার।

প্রশান্তবাবু সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন।

ঘরের ভেতর থেকে ডাক এল—এসো রুদ্র। ভেতরে এসো।

এই সেই স্নিগ্ধ স্বর, যা গতকাল সকালে ফোনের ভেতর দিয়ে শুনেছিলাম। কাছ থেকে শুনে বুঝলাম, ওঁর কথার মধ্যে আরেকটা জিনিস মিশে আছে, যার নাম আভিজাত্য।

পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতরে মুখ বাড়ালাম। বললাম, আমার জুতো খুলতে অসুবিধে আছে। আপনি কি জুতো অ্যালাও করেন?

তোমার জন্যে করলাম। সঙ্কোচ কোরো না। চলে এসো।

পা থেকে বুক অবধি চাদর ঢাকা দিয়ে যিনি বিছানায় শুয়ে আছেন, যিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন, তিনিই নিশ্চয়ই বিরাজ কাপালি, আমার মালিক। আমার উচিত ছিল তাঁর দিকেই পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না।

হল না যে, তার কারণ, কিছু পুরোনো আমলের আসবাব আর শিল্প- সামগ্রী। সিনেমার পর্দায় জমিদারবাড়ির সেট ছাড়া চর্মচক্ষে সেসব জিনিস কখনো দেখিনি, এখন দেখলাম। কাপালি স্যার যে খাটটায়

শুয়েছিলেন সেটা কোন কাঠে তৈরি কে জানে! কিন্তু পাকা খেজুরের মতন চকচকে খয়েরি তার রঙ, গায়ে ভীষণ সূক্ষ্ম গোলাপ আর আঙুরলতার কারুকার্য।

তিনটে বিশাল আলমারি ভর্তি মার্বেল, চিনেমাটি আর রুপোর পুতুল। একটা কর্নার-টেবলের ওপরে প্রায় সাত-আটটা নানান মাপের টেবল ক্লক তো ছিলই, তাছাড়াও অন্য এক কোণে দাঁড়িয়েছিল মানুষ সমান উঁচু একটা গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। চার দেয়ালে চারটে অয়েল-পেইন্টিং। ইওরোপের নিসর্গদৃশ্য। বলে দিতে হয় না যে, ইওরোপিয়ান গ্র্যান্ড-মাস্টারদেরই আঁকা।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পারলাম—এইমুহূর্তে এই ঘরে যত অ্যান্টিক ফার্নিচার আর কিউরিও রয়েছে, একসময়ে তার অন্তত দ্বিগুণ ছিল।

এদিকে-ওদিকে ছড়ানো কাঠের পেডেস্টালগুলোর ওপরে মার্বেলের মূর্তি থাকার কথা ছিল। নেই।

দেয়ালের গায়ে বেশ কিছু জায়গার রঙ তুলনামূলকভাবে কম ফিকে হয়েছে দেখছি। ওই জায়গাগুলোতে নিশ্চয়ই আরো অয়েল-পেন্টিং টাঙানো ছিল।

সব মিলিয়ে ঘরটাকে দেখে আমার একটা দাবা-বোর্ডের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল, যে-বোর্ডে খেলা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে। তখন যেমন বোর্ডের ওপরে বত্রিশটা ঘুঁটির মধ্যে সাতটা কি আটটা ঘুঁটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সেইরকমই করুণ এবং ছন্নছাড়া অবস্থায় পড়ে ওই ঘরের অবশিষ্ট কিউরিওগুলো।

তবু কোলে-বাজারের পচা কপিপাতা আর পেচ্ছাপখানার নরকের মধ্যে দাঁড়িয়ে-থাকা একটা ভাঙা-বাড়ির দোতলার ঘরে হঠাৎ করেই এতগুলো অপূর্ব জিনিস দেখে থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। ঘোর কাটিয়ে কাপালি স্যারের দিকে ফিরে তাকাতে সময় লাগল।

উনি ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি নিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। চোখে চোখ পড়তেই বিছানার পাশে একটা গদি-আঁটা চেয়ারের দিকে চোখের ইশারা করে বললেন, বোসো। আমার কাছে এসে বোসো। কথা বলতে সুবিধে হবে। অনেক কথাই আজ শুনতে হবে তোমাকে। একটু থেমে বললেন, তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন রুদ্র।

আমি কিউরিওগুলোর দিকে ইশারা করে বললাম, এ সব আপনার?

উনি বললেন, না। আমার বাবা কিনেছিলেন। বিশ্বনাথ কাপালি। তাঁর কিউরিওর নেশা ছিল। বলব। তাঁর কথাও বলব তোমাকে।

এবার ওঁকে ভালো করে দেখলাম। দুটো মোটা বালিশের ওপরে হেলান দিয়ে তিনি আধশোয়া হয়ে বসেছিলেন। লেসের ফ্রিল বসানো বালিশের ওয়ারগুলো দুধের মতন সাদা। যে চাদরটা দিয়ে পা থেকে বুক অবধি ঢেকে রেখেছেন সেটা ঠিক কোন ধরনের রেশম দিয়ে বোনা বলতে পারব না, তবে চাদরটার জমি থেকে পালিশ করা হাতির দাঁতের আভা ছড়াচ্ছিল। কিন্তু...

কিন্তু সেই চাদরে পোকায় কাটার দাগ।

কত বয়স হবে কাপালি স্যারের? সত্তরের আশেপাশে বলেই মনে হল। মাথায় এখনো ঘন চুল, তবে তার আশিভাগই পাকা। গায়ের রঙের সঙ্গে ওই রেশমের চাদরের রঙ প্রায় মিশে গেছে। মানুষটি অত্যধিক লম্বা। মনে হল হাইট ছ'ফুটের কিছু বেশিই হবে। ধারালো নাক, পাতলা ঠোঁট। পরিষ্কার করে কামানো দাড়িগোঁফ। তবে ওঁর চোখদুটোই আমাকে সবথেকে বেশি টানছিল। কোনো বাঙালির চোখের তারায় এমন রঙ আমি আগে দেখিনি। অবিকল যেন দুটো মধুর ফোঁটা। শুদ্ধভাষায় বোধহয় এই রঙটাকেই পিঙ্গল বলা হয়।

মনে-মনে বললাম, আপনি স্যার সন্দেহাতীতভাবে রূপবান এবং রাজসিক। কিন্তু আপনার রাজসিকতায় ক্ষয় লেগেছে। এই ঘরটার মতনই, আপনার ভেতর থেকেও অতীতের অনেক মূর্তি, অনেক ছবি হারিয়ে গেছে। আপনি পূর্বপুরুষের সম্পত্তি বিক্রি করে দিন চালাচ্ছেন।

উনি স্নেহময় কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে হয়নি তো? থাকার জায়গা পছন্দ হয়েছে?

আমি বললাম, না। কোনো অসুবিধে হয়নি। তবে...

ঠিক কীভাবে বলব ভেবে পেলাম না। শেষকালে মরিয়া হয়ে যেভাবে মনের মধ্যে কথাগুলো আসছিল, সেইভাবেই বলে ফেললাম—তবে ওখানে যারা রয়েছে তারা কেউ স্বাভাবিক নয়। আপনার কারখানাটাও একটা লোক দেখানো কারবার। ওখানে কোনো প্রোডাকশন হয় না। আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?

ভেবেছিলাম উনি রেগে উঠবেন। কিন্তু একদমই রাগলেন না। খুব শান্ত-গলায় উত্তর দিলেন, তুমি নিজেও কি সেই অর্থে স্বাভাবিক, রুদ্রনাথ এক্কা! সত্যি করে বলো তো আমাকে। স্বাভাবিক তুমি?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

উনি বললেন, আমার কাছে লুকোতে যেও না। আমি সব জানি। না জানলে অত দূর থেকে তোমাকে নিয়ে আসতাম না।

আমি কোনোরকমে আমতা আমতা করে বললাম, আপনি আপনি কী জানেন? কেমন করে জানলেন?

যদি বলি আমাকে একজন অপদেবতা এসে বলে গেছে, বিশ্বাস করবে? তুমি তো মিশনের ছাত্র। খ্রিস্টধর্মের নিরাকার ঈশ্বরের কথা শিখে বড় হয়েছ। পৌত্তলিকদের আদিম দেবতার কথা বললে তো তুমি বিশ্বাস করবে না।

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম।

পরিষ্কার দেখলাম, বিরাজ কাপালি একটু কেঁপে উঠলেন। বললেন, মাথার কাছের জানলাটা একটু বন্ধ করে দাও তো। আর রিডিং-ল্যাম্পটার সুইচ রয়েছে ওই জানলাটার ঠিক পাশেই। ওটাও একেবারে জ্বেলে দিয়ে এসো।

দুটো কাজই সেরে আবার চেয়ারে এসে বসলাম। বিরাজ কাপালি বললেন, হাসি মণ্ডল নামে মেয়েটি তোমাকে কিছু বলেছে? ওই কারখানায় কারুর প্রেজেন্সের কথা?

আমি ঘাড় নাড়িয়ে বোঝালাম, হ্যাঁ।

ওখানে কিছু দেখেছ?

আমি আবার ইঙ্গিতেই বোঝালাম, হ্যাঁ।

উনি অল্প হেসে বললেন, বুঝতে পারছি, সেইজন্যেই তুমি খুব জোরালো প্রতিবাদ করতে পারছ না। তুমি ইতোমধ্যেই আমার কারখানার মধ্যে সেই অপদেবতার উপস্থিতি টের পেয়েছ। তারপর হাত বাড়িয়ে বেডসাইড-টেবলের ওপর থেকে একটা চামড়ায় বাঁধানো বই তুলে নিয়ে বললেন, তুমি জানতে চেয়েছিলে ওই কারখানায় কী হয়। আমি তোমাকে এখানে আনলাম কেন।

বললাম, তার সঙ্গে আরেকটা যোগ করে নিন। নীচের ঘরের ওই ফরেনার মেয়েগুলো কারা? ওরা নাকি পেশেন্ট! কীসের পেশেন্ট? কার পেশেন্ট?

বিরাজ কাপালি হাতের বইটার খোলা পাতা থেকে মুখ তুলে বললেন, আমি কে, আমি কী করছি, ওই মেয়েগুলো কারা এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে তোমাকে একটু পুরোনো কথা শুনতে হবে, রুদ্রনাথ। তোমার যেমন জানার ইচ্ছে, আমারও ইচ্ছে আছে তোমাকে সমস্তটা বলার। কারণ, আমার মন বলছে, গত সত্তর-পঁচাত্তর বছর ধরে আমার পূর্বপুরুষের জমিতে বসে সেই অপদেবতা যে-খেলাটা খেলে চলেছেন, সেই খেলাটা তোমাকে দিয়েই শেষ হবে।

এই অবধি বলে বিরাজ কাপালি হাতের বইটা আমার দিকে ঘুরিয়ে ফরফর করে কয়েকটা পাতা উলটে দেখালেন। দেখলাম, এতক্ষণ যেটাকে বই বলে ভাবছিলাম সেটা আসলে একটা ডায়েরি। খুদে-খুদে হাতের লেখায় পাতাগুলো ভর্তি। উনি বললেন, এরকম পাঁচটা ডায়েরি আছে। সবক'টাই আমার দাদুর ডায়েরি। এছাড়াও আরো কিছু কাগজপত্র আছে। তার থেকে আমি কাপালি-পরিবারের, আরো স্পেসিফিকালি বলতে গেলে ওই কাচ কারখানার একটা ইতিহাস গড়ে তুলেছি; যদিও সেটা সম্পূর্ণ নয়। তোমাকে আমি সেই ইতিহাসটা শোনাই। তুমি মন দিয়ে শোনো। মনে হয় সব প্রশ্নেরই উত্তর পেয়ে যাবে।

# ছয়

কাপালিদের আদি নিবাস ছিল বাঁকুড়ার জটাকেশী গ্রামে। সেখানে তাঁদের বংশগত কবিরাজি চিকিৎসার ব্যবসা ছিল। ভেষজ-চিকিৎসায় খুব নামডাক ছিল তাঁদের। বংশের উজ্জ্বলতম সন্তান ছিলেন সোমেশ্বর কাপালি, যিনি ছিলেন আমার পিতামহ। সোমেশ্বরের যখন মাত্র বাইশবছর বয়স তখনই তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর যা প্রতিভা তাতে বাঁকুড়ার এক অজ পাড়াগাঁয় পড়ে থাকা তাঁকে মানায় না।

সোমেশ্বরের পিতৃদেব, মানে আমার প্রপিতামহ সবেমাত্র তার আগের বছরেই দেহ রেখেছিলেন। মা মারা গিয়েছিলেন শৈশবেই। কাজেই তাঁর কোনো পিছুটান ছিল না। আরো খ্যাতি এবং আরো অর্থের স্বপ্ন চোখে নিয়ে সোমেশ্বর জটাকেশী গ্রামের বাড়ি-জমি সব বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। সেটা ছিল ইংরিজি উনিশশো-একুশ সাল। কলকাতায় এসে সোমেশ্বর, মানে আমার দাদু, সার্পেন্টাইন লেনে ছ-কাঠা জমি কিনে এই বাড়িটা বানালেন এবং সেই বাড়িরই একতলায় খুলে বসলেন তাঁর কবিরাজি চিকিৎসালয়।

বছর দশেকের মধ্যেই তিনি কবিরাজি চিকিৎসায় অঢেল অর্থ উপার্জন করলেন। না, ভুল বললাম। সোমেশ্বর কাপালি চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করেছিলেন প্রথম পাঁচবছর। তারপরে উনি শুরু করেন পেটেন্ট-মেডিসিনের ব্যাবসা আর তাতেই লক্ষ্মীলাভ করেন।

আমি জিগ্যেস করলাম, পেটেন্ট-মেডিসিন মানে?

কাপালি স্যার বললেন, একেকরকম জটিল-রোগের জন্যে একেকরকম ওষুধ, যেগুলো ডাক্তার না দেখিয়েই খাওয়া যায়। মনে রেখো, সেটা টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির প্রথমদিক। এখনকার মতন চারিদিকে তখন এত অ্যালোপ্যাথি ওষুধের দোকান ছিল না। এত ডাক্তারও ছিল না। শহরে তবু যা দু-চারজন ছিলেন, গ্রাম-মফসসলে তো বদ্যি আর হোমিওপ্যাথই ছিল ভরসা।

কাজেই সোমেশ্বর কাপালির গোপন ফর্মুলায় তৈরি অর্শের মলম অর্শমেধ, বাত-বেদনার মালিশ অশ্বিনী-তৈল কিম্বা স্ত্রীরোগের মহৌষধ অশোকা-বড়ি ভালোই বিক্রি হত। পাড়ার মুদিখানা থেকে লোকাল ট্রেনের কামরা, গ্রামের মেলা থেকে ট্রামের গুমটি সবখানে পাওয়া যেত জটাকেশী ফার্মেসির প্রোডাক্ট। তবে তাঁকে সত্যিকারের লাখোপতি করে দিয়েছিল তাঁরই আবিষ্কৃত ম্যালেরিয়ার মিক্সচার ম্যালাহারি।

জটাকেশী-ফার্মেসি!

হ্যাঁ, ওটাই ছিল আমার পিতামহের ব্যবসার ট্রেডনেম। খারাপ নয়, বলো। জটাকেশী নামটার মধ্যে শুধু তো তাঁর ছেড়ে-আসা ভিটের স্মৃতি ছিল না; একটা দৈবক্ষমতার গন্ধও ছিল। অসুস্থ মানুষের মনে ওটা চিরকালই বাড়তি ভরসা নিয়ে আসে।

যাইহোক, এইভাবেই কলকাতায় তাঁর পনেরোটা বছর কেটে গেল। এল উনিশশো ছত্রিশ সাল। উনিশশো ছত্রিশ বললে তোমার কি কিছু মনে পড়ে, রুদ্র?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলছেন কি?

গুড। হ্যাঁ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। শুরু হল সেই যুদ্ধ। হিসেবমতন সোমেশ্বরের বয়স তখন সাঁইত্রিশ। বিবাহিত। চারটি সন্তানের জনক। প্রথম তিনটি কন্যা। কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ কাপালি, অর্থাৎ আমার বাবার বয়স তখন মাত্র ছ'বছর।

তুমি নিশ্চয়ই জানো, যুদ্ধের বাজারে সবকিছুরই দাম হয়েছিল আকাশছোঁয়া। সেই সুযোগে বহু ব্যবসায়ী ধুলোমুঠিকে সোনামুঠি করে ফেলেছিল। কিন্তু সেই বাজারেও মার খেয়ে গেলেন আমার দাদু। কেন বলো তো? যে আটবছর যুদ্ধ চলেছিল তার মধ্যেই সারা দেশে হু-হু করে অ্যালোপ্যাথি-ডাক্তারখানা আর হাসপাতাল গজিয়ে উঠেছিল।

প্রথমে সৈনিকদের প্রয়োজনেই সেসব তৈরি হয়েছিল। তবে দেখতে-দেখতে সেসব সুবিধে সাধারণ মানুষদের নাগালেও পৌঁছিয়ে গেল। তার অনেক আগেই ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসেবে কুইনাইন এসে গিয়েছিল বাজারে। ফলে দাদুর লক্ষ্মী সেই ম্যালাহারি মিক্সচারের বিক্রিও তলানিতে নেমে গিয়েছিল।

উনিশশো-সাতচল্লিশে জটাকেশী ফার্মেসির ঘাড়ে নিয়তির শেষ কোপটা পড়ল। দাদুর তৈরি ওইসব পেটেন্ট-মেডিসিনের বারোআনাই বিক্রি হত পূর্ববঙ্গের গ্রামগঞ্জে, যে-কারণে কলকাতার মতনই ঢাকাতেও কোম্পানির ফ্যাক্টরি এবং অফিস ছিল। দেশভাগের ফলে সেটা হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তান। দাদু হারালেন তাঁর আসল বাজার।

ডায়েরিগুলো পড়েছি বলেই বলতে পারছি, সেইসময়ে দাদুর অবস্থা হয়ে গিয়েছিল পাগলের মতন।

তখনো ছোটপিসির বিয়ে দেওয়া বাকি। ওদিকে আমার বাবা তখনো নাবালক। কলকাতার কারখানায় পনেরোজন কারিগর ছাড়াও অন্তত পঞ্চাশজন মাইনে-করা ক্যানভাসার ছিল, যারা স্টেশনে-বাজারে জটাকেশীর ওষুধ বিক্রি করে বেড়াত। এতগুলো মানুষের বেতন দেবেন কোথা থেকে সেই চিন্তাতেই দাদুর তখন রাতে ঘুম হত না।

তোমাকে বলা হয়নি, ওই যে ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রি, ওইটেই তখন ছিল জটাকেশীর ওষুধের কারখানা।

ওইসময়েই, মানে উনিশশো-আটচল্লিশ সালে একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

তখন সন্ধে সাতটা কি আটটা হবে। কারখানার কর্মচারীরা তার অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে। কিছু কাঁচামাল আসার কথা ছিল। সেগুলো আসতে দেরি হচ্ছিল বলে দাদু আর দাদুর কোম্পানির ম্যানেজার রমেনবাবু কারখানা ছাড়তে পারছিলেন না। শেষ অবধি সেই জড়িবুটি চালান এসে পৌঁছল সন্ধে সাতটায়। দাদু কারখানার দরজায় তালা দিয়ে বেলেঘাটা রোডের দিকে হাঁটা দিলেন। রমেনবাবুর বাড়ি উল্টোদিকে। তিনি সেদিকে চলে গেলেন।

কারখানার গেট ছেড়ে দাদু বোধহয় দশ-পাও এগোননি, বেলেঘাটার দিক থেকেই একটা ট্যাক্সি এসে দাদুর গা ঘেঁষে থামল। দরজা খুলে নেমে এলেন এক সাহেব আর মেমসাহেব। দাদুর সামনে দাঁড়িয়ে সাহেব প্রশ্ন করলেন, মিস্টার কাপালি?

ইয়েস।

আপনার সঙ্গে একটু ব্যবসা সংক্রান্ত কথা ছিল।

দাদু তো আকাশ থেকে পড়লেন। চূড়ান্ত অবাক হয়ে বললেন, ব্যবসা! সাদা চামড়ার লোকেরা তো এখন ইন্ডিয়া থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে ব্রিটেনে ফিরে যাচ্ছে। আপনারা নতুন করে কোন ব্যবসার কথা ভাবছেন শুনি?

সাহেব বললেন, বলছি সব। আগে একটু ভেতরে গিয়ে বসি, চলুন।

অগত্যা দাদু আবার কারখানার দরজার তালা খুলে সাহেব এবং মেমকে নিয়ে নিজের অফিসঘরে গিয়ে বসলেন। অফিসঘরের আলো জ্বালার পরে এতক্ষণে তিনি দুই আগন্তুককেই ভালো করে দেখতে পেলেন।

সাহেবটির চেহারা অদ্ভুত। একেকজন লোক থাকে যাদের দেখলেই মনটা বিরক্তিতে ভরে ওঠে—এ ঠিক সেইরকমের লোক। শ্বেতাঙ্গ ঠিকই, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় বহুদিন ধরে রোদে পুড়েছেন। তার ফলে গায়ের চামড়াতেই যে শুধু বাদামি রঙ ধরেছে তাই নয়, সারা মুখেও অজস্র আঁকিবুঁকি দাগ পড়েছে। টিয়াপাখির মতন বাঁকানো নাক। কুতকুতে দুটো চোখের মণির রঙ ঘোলাটে। সর্বোপরি ঝুলে-পড়া ঠোঁট আর হাতের আঙুলের কাঁপুনি দেখে একজন চিকিৎসক হিসেবে সোমেশ্বর কাপালির বুঝতে বাকি রইল না যে, বৃদ্ধটি চূড়ান্ত মদ্যপ।

হ্যাঁ, বৃদ্ধ। সাহেবটির বয়স তখনই সত্তরের কম ছিল না।

দাদুর চোখে তার পোশাক-আশাকও অদ্ভুত ঠেকেছিল। নোংরা একটা সাদা আলখাল্লা পরেছিলেন তিনি। মাথায় গোল বাটির মতন ক্যাপ। সব মিলিয়ে যাজকের পোশাক। গলার সঙ্গে চেনে বাঁধা একটা ধাতুর ক্রুশ তাঁর বুকের ওপরে ঝুলছিল, কিন্তু ঝুলছিল উলটো-মুখে—অর্থাৎ মাঝের ডাঁটিটার ছোট দিকটার মুখ নীচের দিকে ছিল। এর অর্থ দাদু সেদিন বোঝেননি।

ডেভিল-ওয়রশিপার? আমি জিগ্যেস করলাম।

একদম। শয়তানের উপাসক। স্টিফেন মেয়ার ছিলেন তাই। স্টিফেন মেয়ার ছিল তাঁর নাম। যাজক স্টিফেন মেয়ার। জানা গেল, তিনি দীর্ঘকাল মেঘালয়ের উপজাতিদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের কাজ করেছেন; কিন্তু ইদানিং আদিবাসীদের মধ্যেও হানাহানি বড্ড বেড়ে গেছে। স্টিফেন আর আগের মতন শান্তিতে কাজ করতে পারছেন না। তাই যাজকের বৃত্তি ত্যাগ করে ব্যবসায় নামবেন বলে ঠিক করেছেন।

মেয়ার-সাহেবের রোদে-পোড়া চামড়ার কারণ বোঝা গেল। মেঘালয়ের পাহাড়ি রোদ।

এবার দাদু তাকালেন মেমসাহেবের দিকে। তিনি যুবতী এবং পরমা সুন্দরী। সোনালি চুল, নীল চোখ এবং দীর্ঘাঙ্গী। নাম বললেন ইভা স্টাইনবেক।

মেমসাহেবের নামটা শুনেই দাদুর খটকা লাগল। জিগ্যেস করলেন, আপনি কি জার্মান?

চিবুকটা সামান্য উঁচু করে সগর্বে সেই শ্বেতাঙ্গিনী উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। জার্মান এবং আর্য।

বেশ মন দিয়ে বিরাজ কাপালির কথকতা শুনছিলাম। পুরোনো দিনের গল্প শুনতে কার না ভালো লাগে? কিন্তু হঠাৎ তিনি গল্প থামিয়ে এমন একটা প্রশ্ন করে বসলেন যে, আরেকটু হলে ভির্মি খাচ্ছিলাম। বললেন, আচ্ছা রুদ্র। তুমি লেবেনসবর্ন প্রোগ্রামের নাম শুনেছ?

বললাম, সে তো একজাতের মুরগি।

আঃ। কানে কম শোনো নাকি? একটু বিরক্ত হয়ে ঘাড় নাড়লেন বিরাজ কাপালি, লেগহর্ন নয়, লেগহর্ন নয়—। লেবেনসবর্ন। এল ই বি ই এন এস—লেবেন্স। বি ও আর এন—বর্ন। অরিজিনালি জার্মান শব্দ। বাংলায় অনুবাদ করলে মানে দাঁড়াবে প্রাণ-ঝরনা।

এতক্ষণ উনি যা বলে যাচ্ছিলেন তার সঙ্গে প্রাণ-ঝরনার কী সম্পর্ক বুঝতে পারলাম না! শুকনো-মুখে বললাম, ও। আচ্ছা।

বিরাজ কাপালি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, মোটেই আচ্ছা নয়। নাৎসি বীভৎসতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ছিল ওই লেবেনসবর্ন প্রোগ্রাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই কালো দিনগুলোয় স্কুৎজস্টাফ বা সংক্ষেপে এস এস বাহিনীর নাম শুনলে সারা ইওরোপের মানুষের বুকের রক্ত হিম হয়ে যেত। হিটলারের বুলডগ বাহিনীও বলতে পারো এস এসকে।

সেই প্যারামিলিটারি ফোর্সের চিফ ছিলেন হাইনরিখ হিমলার। ওইসময়ে জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলারের পরেই সবচেয়ে পাওয়ারফুল লোক ছিলেন তিনি। আস্ত অমানুষ। ইহুদি-নিধন যজ্ঞ বা হলোকস্টের পেছনে তাঁর যে শয়তানি-বুদ্ধি ভরা মাথা কাজ করেছিল, সেই একই মাথা থেকে বেরিয়েছিল লেবেনসবর্ন প্রোগ্রামের ছক। আর এই দুষ্কর্মে হিমলারের সহযোগী ছিলেন এক নীতিজ্ঞানহীন চিকিৎসক—ডক্টর গ্রেগর এবনার। এরা দুজনে মিলে খাঁটি আর্য-সন্তান প্রসব করানোর এক প্রোজেক্ট তৈরি করেন। তারই নাম লেবেনসবর্ন-প্রোগ্রাম।

সেই সময়ে জার্মানিতে হিটলারের অন্ধ ভক্তের সংখ্যা তো কম ছিল না। তাদের মধ্যে শুধু পুরুষই ছিল না, নারীও ছিল অনেক। তাদের মধ্যে থেকেই বেছে নেওয়া হত অবিবাহিতা যুবতী ভলান্টিয়ারদের। দেখে নেওয়া হতো তাদের পেডিগ্রি। দেখা হতো তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনো অনার্য রক্ত, বিশেষত ইহুদি-

রক্ত মিশেছিল কিনা। আর শারীরিক লক্ষণ হিসেবে অগ্রাধিকার দেওয়া হত তাদের, যাদের চোখের মণি নীল, চুল সোনালি আর যারা দীর্ঘাঙ্গী।

এইবার আমি নড়েচড়ে বসলাম। একটু আগে বিরাজ কাপালি ইভা স্টাইনবেকের যে ডেসক্রিপসন দিলেন, তার সঙ্গে লেবেনসবর্ন প্রোগ্রামের ভলান্টিয়ারদের চেহারা বেশ মিলে যাচ্ছে তো!

তারপর? আমি প্রশ্ন করলাম।

তারপর এস এস বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে যাদের ওই একই রকমের এরিয়ান পেডিগ্রি থাকত তাদের সঙ্গে মেয়েগুলিকে রাত কাটাতে হত। মাসের উর্বর রাতগুলো, বলাই বাহুল্য। সেসব হিসেব-নিকেশ করে দেওয়ার জন্যে প্রতিটি লেবেনসবর্ন-হোমে কোয়ালিফায়েড ডাক্তার থাকত।

এতই অবাক হলাম যে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, আপনি সত্যি বলছেন?

মিথ্যেকথা বলে আমার লাভ? গুগল ঘেঁটে চেক করে নিতে পারো। তারপরে শোনো। এস এস অফিসার আর হিটলারের অনুগত মেয়েগুলির মধ্যে পরিচয়হীন প্রেমহীন সঙ্গম ঘটত। তারা কেউ কারুর পরিচয় জানত না। জানার দরকারই বা কী? হিমলারের প্ল্যান অনুযায়ী তারা তো সন্তান উৎপাদনের মেশিন ছাড়া আর কিছু ছিল না।

সঙ্গমের ফলে মেয়েগুলি গর্ভবতী হত। সন্তানের জন্ম দিত। সেই সন্তানগুলিকে লেবেনসবর্ন নার্সারিতে রেখে মেয়েগুলি ফিরে যেত যার যার বাড়িতে। পুরো ব্যাপারটাই রাখা হত গোপন। সত্যিকথা বলতে কি লেবেনসবর্ন প্রোগ্রামের পুরো ব্যাপারটাই সভ্যসমাজের গোচরে এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে, জার্মানির পরাজয়ের পরে।

সে যাইহোক, ওইসময়ে, মানে উনিশশো ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে লেবেনসবর্ন প্রোগ্রাম অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছড়িয়ে পড়ছিল। শুধু জার্মানিতেই নয়, ইওরোপের অন্যান্য যে দেশগুলো জার্মানি কব্জা করেছিল, যেখানকার মেয়েদের দেখে হিমলারের মনে হয়েছিল এদের মধ্যে আর্য লক্ষণ রয়েছে, সেখানেও শেকড় গেঁড়েছিল লেবেনসবর্নের বিষবৃক্ষ। বুঝতেই পারছ, সেসব দেশে তো আর হিটলারের অনুরাগী মেয়ে পাওয়া যেত না। কাজেই সেখানে যেটা হত সেটা অর্গানাইজড-রেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর্য সন্তান পাওয়ার জন্যে পোল্যান্ড কিম্বা নরওয়ের মতন দেশগুলোতে কত কুমারী মেয়েকে যে এস এস অফিসারদের সঙ্গে রাত কাটাতে হয়েছে তার গোনাগুন্তি নেই।

বাচ্চাগুলোর কী হত? আমি প্রশ্ন করলাম।

এমনিতে লেবেনসবর্ন-চাইল্ডরা ওইসময়ে পৃথিবীর অন্যান্য বাচ্চাদের চেয়ে একশোগুণ ভালো জীবন কাটিয়েছিল। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে তারা প্রচুর খাবার পেত, ওষুধ পেত। নাৎসি-ধরনে শিক্ষাও পেত অনেকখানি। শুধু বাপ-মায়ের পরিচয়টুকু তারা জানতে পেত না। বাচ্চাগুলো হয়ে যেত নাৎসি-সরকারের সম্পত্তি।

হিমলারের আশা ছিল, ওই বাচ্চাগুলো বড় হলে নাৎসি ভাবধারায় নিবেদিতপ্রাণ এক বিপুলসংখ্যক যুবক যোদ্ধাকে পাওয়া যাবে। একইসঙ্গে পৃথিবীর বুকে গড়ে উঠবে খাঁটি আর্য এক জনসম্প্রদায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পরে যখন লেবেনসবর্নের লুকোনো নথিপত্র নুরেমবুর্গ ট্রায়ালে পেশ হল, তখন দেখা গেল ওই ন'-দশ বছরেই কুড়িহাজার অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়েছিল। তার মধ্যে শুধু জার্মানি আর নরওয়ের লেবেনসবর্ন ক্যাম্পগুলোতেই জন্ম নিয়েছিল পনেরো হাজার শিশু।

কাপালি স্যারের কথা শুনতে-শুনতে মনে হচ্ছিল, খুব কুৎসিত একটা রূপকথা শুনছি। তবে যে-প্রশ্নটা অনেকক্ষণ ধরেই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, সেটা আর না করে থাকতে পারলাম না। বললাম, আপনি বোধহয় ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির পত্তনির ইতিহাস বলছিলেন। তার সঙ্গে লেবেনসবর্ন-প্রোগ্রামের সম্পর্ক কী?

কাপালি স্যার বললেন, আছে। আরো কিছুটা না শুনলে বুঝতে পারবে না। যেদিন স্টিফেন মেয়ার আর ইভা স্টাইনবেক দাদুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, সেদিন আমার দাদুও সম্পর্কটা বুঝতে পারেননি। অবশ্য

কেমন করেই বা বুঝবেন? ইভা যদিও চিবুক তুলে অহঙ্কারী-ভঙ্গিতে বলেছিলেন, আমি জার্মান এবং আর্য, কিন্তু এটা তো বলেননি যে তিনি ছিলেন লেবেনসবর্ন-প্রোগ্রামের একজন নিবেদিতপ্রাণ ভলান্টিয়ার। যখন বলেছিলেন, দাদু যখন তাঁর ডায়েরিতে ওই শব্দটার উল্লেখ করেছেন, ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে।

তবে হ্যাঁ। ইভা যে ঠিক কোন উদ্দেশ্যে ঈশপের উটের স্টাইলে দাদুর কারখানায় মাথা ঢুকিয়েছিল, সেটা জানলে দাদু নির্ঘাৎ ওদের সেইমুহূর্তেই বার করে দিতেন। কিন্তু কী আর করা যাবে।

বললাম, কারখানায় মাথা ঢুকিয়েছিল মানে?

মানে খুব সহজ। ধুঁকতে-থাকা জটাকেশী ফার্মেসির ওই বাড়িতেই একটা পোর্সেলিনের বাসনপত্র আর ছোট-ছোট মূর্তি তৈরি করার কারখানা গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিন ওরা। মনে রেখো রুদ্র, এসব প্রায় পঁচাত্তর-বছর আগের কথা। তখনো এই ট্যাংরা-তিলজলা অঞ্চলকে প্রপার ক্যালকাটা বলে ধরা হত না। তাই ওদের প্রস্তাব শুনে দাদু প্রথমেই ভাবলেন, ওঁরা এই জমিটাতেই কারখানা বানাতে চাইছে কেন? তাছাড়া 'সিক-ইন্ডাস্ট্রি' হলেও জটাকেশীতে তো তখনো প্রোডাকশন চলছিল।

তার উত্তরে স্টিফেনসাহেব একটা ভারি অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, গোটা ইওরোপের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর পোর্সেলিনের বাসন যেখানে বানানো হয় জার্মানির সেই অঞ্চলটার নাম ব্যাভেরিয়া। আর সেই ব্যাভেরিয়ার সবচেয়ে খানদানি কারিগর-বংশের মেয়ে হচ্ছেন ইভা স্টাইনবেক।

ইভার কাছে রয়েছে দুধের মতন সাদা, শিশুর চোখের মতন নীল, কচি কুসুমপাতার মতন লাল এবং আরো একশোরকম রঙ আর ডিজাইনের বাসন বানানোর কারিগরি বিদ্যা। সেই আশ্চর্য পোর্সেলিন বানাতে ঠিক কোন-কোন মালমশলা যে লাগে, তা গত আড়াইশো বছর ধরে স্টাইনবেক পরিবারের ট্রেড-সিক্রেট। সেসব উপাদানের কথা ইভা তার বিজনেস-পার্টনার স্টিফেনকেও কোনোদিন বলেননি, দাদু তো কোন ছাড়। তবে তার মধ্যে একটা উপাদান হচ্ছে ব্লাড-চারকোল রক্ত থেকে তৈরি করা অঙ্গার। এবং সেটা লাগে প্রচুর পরিমাণে।

দাদুকে আর বেশি বুঝিয়ে বলতে হয়নি। কবরডাঙা রোডের একপাশে ওই কসাইখানাটা তো তার অনেক আগে থেকেই ছিল, যদিও সেটা ছিল কসাইখানার পেছনদিক। এদিক দিয়ে কেউই যাতায়াত করত না। তবে রাস্তার ধারের নালি দিয়ে দিনের মধ্যে চারবার জলের মতন হুড়হুড় করে বয়ে যেত জবাই করা পশুর রক্ত।

নালিটা ছিল দাদুর কারখানার একেবারে গা ঘেঁষে। ইচ্ছে করলে পুরো রক্তস্রোতটাকেই কারখানার ভেতরে এনে ফেলা যায়। ইভা বললেন, সেইজন্যেই এই জমিটা তার এত পছন্দ। দাদুকে ওই জমির জন্যে তিনি যা দাম দিতে চাইলেন, সেটা অবিশ্বাস্য রকমের বেশি এবং সোমেশ্বর কাপালির মতন একজন ডুবন্ত ব্যবসায়ীর পক্ষে দারুণ লোভনীয়।

তবু দাদু তখনই ওঁদের কোনো কথা না দিয়ে একসপ্তাহ সময় চাইলেন এবং পুরো সপ্তাহটা জুড়ে তিনি বম্বে, কলকাতা আর মাদ্রাজের নানান পাইকিরি বাজারে নানারকমের খোঁজখবর নিলেন। সেই সময়টা স্টিফেন আর ইভা রডন-স্ট্রিটের একটা হোটেলে শান্তভাবে অপেক্ষা করলেন। একসপ্তাহ বাদে সোমেশ্বর ওদের জানালেন যে, তিনি জমি বিক্রি করতে রাজি, তবে পুরো দামের কিছুটা তিনি নেবেন ক্যাশে আর বাকিটার জন্যে তাকে কোম্পানির একজন পার্টনার করে নিতে হবে।

কেন? এরকম ডিসিসন নিলেন কেন? আমি জিগ্যেস করলাম।

বিরাজ কাপালি বললেন, আসলে দাদু এরমধ্যে খোঁজ নিয়ে দেখেছিলেন যে, স্বাধীনতার পরে ভারতের বাজারে আর ইওরোপ-আমেরিকা থেকে আগের মতন অবাধে পোর্সেলিন আমদানি হচ্ছে না। অথচ দেশে নব্য ধনীদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছিল। খুলছে নতুন-নতুন পাঁচতারা-তিনতারা সব হোটেল আর দামি রেস্তোঁরা। সব মিলিয়ে দাদু বুঝতে পেরেছিলেন, সময়টা এমন যে, ভালো-কোয়ালিটির পোর্সেলিনের বাসন বাজারে পড়তে পাবে না! সেইজন্যেই তিনি চেয়েছিলেন পার্টনারশিপ।

ইভা আর স্টিফেন দাদুকে আটকাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দাদু ছিলেন নাছোড়। অগত্যা তাঁরা দাদুকে ওই জমি-বাড়ির পরিবর্তে তিন-লক্ষ টাকা আর কোম্পানির শতকরা কুড়িভাগের অংশীদারি দিতে বাধ্য হলেন।

কবরডাঙার ওই কারখানা-ঘরের খোলশটুকুই শুধু রইল। বন্ধ হয়ে গেল জটাকেশী ফার্মেসি। ছাঁটাই হয়ে গেল পুরোনো লোকজন। বিদেশি পার্টনাররা কারখানার বাইরের দিকে তেমন কিছু পরিবর্তন করলেন না, শুধু পঙ্খের কাজ করে ওই যে কোম্পানির নাম, ওটাকে খোদাই করে দিলেন আর একটা স্লুইস-গেটের ভেতর দিয়ে কারখানার ভিতরে রক্ত নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন।

কারখানা-ঘরের ভিতরের খোল-নলচে সবই বদলে গেল। দাদুই খুঁজেপেতে হাওড়ার কোন গ্রাম থেকে তিনজন কারিগরকে নিয়ে এলেন। লোকগুলোর দেশিয় পদ্ধতিতে চিনেমাটির বাসন তৈরির অভিজ্ঞতা ছিল। তবে হেড-মিস্ত্রি ছিলেন ওরা দুজন—স্টিফেন আর ইভা। দাদু কখনোই কারখানা-ঘরের ভেতরে পা রাখেননি। কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। যেখানে নিজের ওষুধের কারখানা ছিল, সেখানে অন্য কাজ হতে দেখলে মন খারাপ হতে বাধ্য।

তবে স্টিফেন আর ইভার তাতে কিছু আটকাল না। বিদেশ থেকে আনানো হল চায়না-ক্লে, ফেলসপার আর আরো কী কী যেন সব কাঁচামাল। রানিগঞ্জ থেকে ট্রাকে করে এল ফার্নেসের জন্যে বিশেষ কোয়ালিটির কয়লা। শেষমেষ উনিশশো-উনপঞ্চাশ সালের অক্টোবর-মাসে ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির ফার্নেসে প্রথমবারের মতন আগুন জ্বলল।

কাপালি স্যার হাত বাড়িয়ে একটা ডায়েরি তুলে নিলেন। দেখলাম, ডায়েরিটার অনেকগুলো পাতার ভাঁজে বুকমার্ক দেয়া আছে। একটা পাতা খুলে তিনি ঝুঁকে পড়লেন। চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ লেখার ওপরে চোখ বুলিয়ে বললেন, উনিশশো পঞ্চাশের সাতই জানুয়ারি। দাদু লিখছেন, প্রথম ত্রৈমাসিকে বিক্রির পরিমাণ খুশি হওয়ার মতন। লভ্যাংশ হিসেবে আমি পেয়েছি কুড়িহাজার তিনশো একুশ টাকা। মনে হচ্ছে ভাগ্যের চাকা আবার ঘুরছে। ছোটমেয়ের জন্যে আমোদপুর থেকে একটা ভালো সম্বন্ধ এসেছে। ভাবছি কথাবার্তা পাকা করে নেব। দেনা-পাওনার জন্যে আটকাবে না।

আবার কয়েকটা পাতা উলটে অন্য একটা পাতায় এসে স্থির হল তাঁর হাত। বললেন, ওই বছরেরই অক্টোবর মাস। সতেরো তারিখ। দাদু লিখছেন, গত তিনদিন শরীর এবং মনের ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল। চোদ্দো তারিখ রাতে স্টিফেন মেয়ারের মৃত্যু হয়েছে। অপঘাতে মৃত্যু। এবং বীভৎস মৃত্যু। বেচারা ব্লো-পাইপ দিয়ে গলন্ত কাঁচের বুদ্বুদে ফুঁ দিয়ে ফুলদানি বানাচ্ছিল। কীভাবে কে জানে, সেই পেতলের ব্লো-পাইপ ওর টাকরা ফুঁড়ে মাথায় ঢুকে গিয়েছিল।

সময়টা ছিল গভীর রাত, সেইসময়ে ওদের ফাউন্ড্রির মধ্যে আর কেউ ছিল না। কাজেই কী করে যে এমন ঘটনা ঘটল সেটা কেউ বলতে পারছে না। ডাক্তারের অনুমান, কাজ করতে-করতেই স্টিফেনের একটা মাইল্ড হার্ট-অ্যাটাক হয়ে থাকবে, যার ফলে ওর মাথা ঝুঁকে পড়েছিল সামনে! ব্লো-পাইপের পেছন দিকটা মুখের তালু ফুঁড়ে ওপরে উঠে গিয়েছিল। আমাদের কংগ্রেসি কাউন্সিলরের দয়ায় থানা-পুলিশের ঝামেলা এড়ানো গিয়েছে।

ইভাকে জিগ্যেস করেছিলাম, স্টিফেনের মৃতদেহ ওর দেশে পাঠানোর দরকার আছে কিনা। তাতে ইভা অদ্ভুত একটা কথা বললেন। এই প্রথম ওর কাছ থেকে জানলাম, স্টিফেন আদতে ছিলেন রুমানিয়ার জিপসি সম্প্রদায়ের লোক। ওঁর না আছে ঘর, না আছে সংসার। একটা সময় অবধি আমি ভাবতাম, স্টিফেন বুঝি ইভার অসমবয়সি প্রেমিক। ইভাকে ব্যবসার পয়সাকড়ি ওই জোগাচ্ছে। কিন্তু গত কয়েকদিনে বুঝলাম, মোটেই তা নয়। ইভার সঙ্গে নাকি ওঁর সম্পর্কটা ছিল গুরু-শিষ্যার।

শুনে চমকালাম। স্টিফেন আবার ইভাকে কী শেখাতেন? যেদিন ওদের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল, মনে আছে, সেদিন স্টিফেনই আমাকে বলেছিল, পোর্সেলিন বানানোর 'নো-হাও' সব ইভা জানে। সে-সব

স্টাইনবেক পরিবারের বংশগত গোপন বিদ্যা ; বাইরের কেউ জানবে না।

তাহলে?

ইভাকে জিগ্যেস করলাম, গুরু-শিষ্যা কথাটার মানে কী। প্রশ্নটা শুনে ইভা স্পষ্টতই অপ্রস্তুত হলেন। আমতা-আমতা করে বললেন, না, মানে ওই ইয়ে আর কি। কোনো শিল্পসামগ্রীই কি আর একটা কালচারের মধ্যে আটকে থাকে? নানান কালচারের মিশ্রণ থাকে তার মধ্যে। ও আমাকে শেখাত রুমানিয়ার ট্র্যাডিশনাল পোড়ামাটির বাসনপত্রের ডিজাইন।

ডায়েরি থেকে মুখ তুলে কাপালি স্যার বললেন, সে যাই হোক, স্টিফেনের মৃত্যুতেই গল্প শেষ হল না। পরের বছর, মানে উনিশশো-একান্নর দোসরা মার্চ, ওই ছোট্ট কারখানাটার চৌহদ্দির মধ্যে আরো এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

সেই-যে হাওড়া থেকে সোমেশ্বর কাপালি তিনজন কারিগরকে নিয়ে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে একজন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, আগের রাতে তিনজন লেবার একই ঘরে ঘুমিয়েছিল। তারপর, তখন গভীর রাত, ওই যে-লোকটা পাগল হয়ে গিয়েছিল, সেই লোকটা বাকি দুজনকে ঠেলা মেরে জাগানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাকি দুজনের চোখে তখন গাঢ় ঘুম। ওরা ওঠেনি। শুধু আবছা মনে আছে, লোকটা বলেছিল, কারখানা-ঘরে একটা কিছু হচ্ছে। সে দেখতে চলল।

সেই ছিল লোকটার শেষ কথা। পরদিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে বাকি দুজন কারিগর দ্যাখে তাদের সেই সঙ্গী কারখানা-ঘরের দরজায় বসে আছে। কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে। আবার কখনো প্রবল আতঙ্কে চিৎকার করে উঠছে। তাকে গ্রামের বাড়িতে ফেরত দিয়ে আসা হল। বাকি দুজন মিস্ত্রি কারখানায় থেকে গেল।

কিন্তু সে মাত্র দুদিনের জন্যে। দুদিন পরেই, তখন সবে ভোরের আলো ফুটেছে, সেই দুজন মিস্ত্রি আমাদের এই সার্পেন্টাইন-লেনের বাড়িতে এসে দাদুর পায়ের কাছে মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ল। হাঁউমাঁউ করে তারা যা বলল, তার সার কথা, কারখানা-ঘরে ভূত আছে। দাদু অবাক হয়ে বললেন, সে আবার কী! ওরা বলল, ওদের সেই সঙ্গী পাগল হয়ে যাওয়ার পর থেকে গত দু-রাত ওরা সজাগ হয়ে শুচ্ছে। সেইজন্যেই ওরা দেখতে পেয়েছে কারখানা-ঘরে গভীর রাতেও ফার্নেস জ্বলে। হঠাৎই পচা গন্ধে ভরে যায় চারপাশ আর হিংস্র কোনো জানোয়ারের গরগরানির মতন আওয়াজ আসে ওদিক থেকে। তাছাড়া...

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে থেমে গেল।

দাদু ছাড়বার পাত্র নন। কড়া-গলায় বললেন, থামলে কেন? তাছাড়া কী?

তাছাড়া—ওরা আমতা-আমতা করে বলল, আমাদের চোখের ভুল হতে পারে—আপনি আমাদের নাম করে এই কথাটা কাউকে বলবেন না কোবরেজমশাই—মনে হয় দু-রাতেই যেন ইভা মেমসাহেবকে কারখানা ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। একদম নাঙ্গা উদোম।

চোখের ভুল যে নয় সে কথা বোঝার মতন বুদ্ধি দাদুর ছিল। দুটো সুস্থ-সবল লোকের চোখ তো আর একইরকম ভুল দেখতে পারে না। দাদু ওদের বললেন, তোরা মেমসাহেবকে কিছু বললি না? এতদূর দৌড়ে চলে এলি?

বলব কেমন করে? কোন ভাষায় বলব? মেমসাহেব বাংলা-হিন্দি কিছুই জানেন না। স্টিফেনসাহেব ভাঙা ভাঙা হিন্দি জানতেন। তিনিই আমাদের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিতেন। তাছাড়া মেমসাহেব তো বেলা বারোটা অবধি ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমোন। আপনি জানতেন না?

না, ইভার এই অভ্যেসের কথা দাদু সত্যিই জানতেন না। তিনি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে বললেন, তা তোরা এখন কী করবি?

ওদের মধ্যে একজন গেঁজের মধ্যে থেকে একটা বড় চাবির গোছা বার করে দাদুর পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে বলল, আপনিই আমাদের চাকরি দিয়েছিলেন, তাই আপনার কাছেই ইস্তফা দিয়ে গেলাম। আমাদের

থাকার জায়গা আর কারখানা ঘরের চাবি এই রইল। আপনি রাখুন। পরে মেমসাহেবকে দিয়ে দেবেন। আমরা দেশে ফিরে গেলাম। এই মাসের পাঁচদিনের মজুরি পরে কখনো এসে নিয়ে যাব না হয়।

দাদু দেখলেন, ওরা সত্যিই ঝোলা গুছিয়েই বার হয়েছে। দাদু ওদের হাতে পাঁচদিনের মজুরি ধরিয়ে দেওয়া মাত্র ওরা হ্যারিসন রোডের দিকে পা চালাল। একবার ঘুরেও তাকাল না।

## সাত

গল্প জমে গিয়েছিল। আমি জিগ্যেস করলাম, তারপর?

লোকদুটো চলে যাওয়ার পর চটপট স্নান-আহ্নিক সেরে দাদু কারখানার দিকে রওনা হয়ে গেলেন। পকেটে কারখানার চাবির গোছা।

বাঁ-দিকের ব্যারাক বাড়িটায় ইভা আর স্টিফেন থাকতেন। স্টিফেনের মৃত্যুর পর তখন ইভা একাই থাকেন। ব্যারাক বাড়ির দিকে যেতে গিয়েও দাদু থেমে গেলেন। কারণ, ভেতরদিক থেকে এঁটে বন্ধ করা দরজা-জানলাগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছিল, ইভা তখনো ঘুম থেকে ওঠেননি। দাদু ঘড়ি দেখলেন—বারোটা বাজতে তখনো কয়েক মিনিট দেরি ছিল। তিনি ভাবলেন, থাক। আর কিছুক্ষণ বাদে উনি হয়তো নিজেই উঠে পড়বেন। তখনই না হয় কথা বলব। আপাতত কারখানাটা একটু দেখে আসা যাক।

তোমাকে আগেই বলেছি, কারখানার প্রোডাকশনের ব্যাপারে দাদু কোনোদিন মাথা ঘামাননি। সত্যি কথা বলতে কি ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির তিনি ছিলেন স্লিপিং-পার্টনার।

কিন্তু সেই-দিনটার কথা ছিল স্বতন্ত্র। স্টিফেন মারা গেছেন, কারিগরেরাও কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। ইভার অবস্থা তিনি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছিলেন। মাত্র বছরখানেক আগেই যে প্রাণোচ্ছল এবং আত্মবিশ্বাসী যুবতী তাঁর সঙ্গে কারখানা কেনার 'ডিল' করেছিলেন, তিনি কি আর আগের মতন আছেন?

সোমেশ্বর কাপালির বয়স তখন বাহান্ন। দুনিয়াদারি অনেকটাই দেখে নিয়েছেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন, এখনো যদি তিনি ব্যাভেরিয়া ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে মনোযোগ না দেন তাহলে তাঁর শেষ বয়সের অবলম্বন এই ব্যবসাটাও ডুববে।

এইসব চিন্তা করতে-করতেই সোমেশ্বর কাপালি সেদিন, পাঁচই মার্চ উনিশশো-একান্ন, বেলা বারোটার সময়, জীবনে প্রথমবারের জন্যে ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির কারখানা-ঘরের দরজার গা-তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর বাড়ি ফিরে তিনি সেদিন যা-যা করেছিলেন, যা-যা দেখেছিলেন, সবটাই পরিষ্কার করে ডায়েরিতে লিখে রাখলেন।

কারখানা-ঘরের ভেতরে সেদিনও কোনো বৈদ্যুতিক আলো জ্বলেনি। তবু হালকা সবুজ একটা আভায় পুরো ঘরটাই ভরে ছিল। সোমেশ্বর কাপালি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন, ঘরটায় তিনি ছাড়াও আরেকজন কেউ রয়েছেন। না, কাউকে দেখতে পাননি। কোনো শব্দও শোনেননি। তবু তাঁর মনে হচ্ছিল কেউ যেন তাঁর ওপরে নজর রাখছে।

বেশ কিছুক্ষণ বেঞ্চের নীচে, ফার্নেসের ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারার পরেও বুঝতে পারলেন না যে, সে রয়েছে কোথায়! শুধু যে দেখছিল তাই নয়, সোমেশ্বর কাপালি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, সেই অদৃশ্য অস্তিত্ব ক্রমাগত তাঁর কানে বলে চলছিল, আর বেশি এগিও না সোমেশ্বর। তুমি এখানে অবাঞ্ছিত। ভালো চাও তো এইমুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

বেরিয়েই আসছিলেন সোমেশ্বর কাপালি।তার আগেই একটা ভারি অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল তাঁর। যতদিন কারখানা-ঘরে জটাকেশী ফার্মেসির ওষুধপত্র তৈরি হত, ততদিন জিনিসটা ওখানে ছিল না। সেটা আর কিছুই নয়, ফার্নেসের কাছাকাছি মেঝের ওপরে একটা চৌবাচ্চা। হঠাৎ করে দেখলে বোঝা যায় না যে,

ওখানে চৌবাচ্চাটা রয়েছে। কারণ, ঠিক ম্যানহোলের ঢাকনার মতন একটা গোলাকার ঢালাই-লোহার ঢাকনা দিয়ে চৌবাচ্চাটার মুখ এঁটে বন্ধ করা ছিল।

সোমেশ্বর পাশ দিয়ে যেতে-যেতেই কী মনে হতে ঢাকনাটার আংটা ধরে একটা টান দিয়ে সেটাকে খুলে ফেললেন, আর খোলামাত্রই বীভৎস পচা গন্ধে তিনি প্রায় জ্ঞান হারাচ্ছিলেন। অলৌকিক সবুজ আলো সেই চৌবাচ্চার ভেতরেও নেচে বেড়াচ্ছিল! সেইজন্যেই তিনি দেখতে পেলেন চৌবাচ্চাভর্তি রক্ত। তিনি বুঝতে পারলেন, কসাইখানা থেকে পশুর রক্ত এনে এই মেঝের নীচের চেম্বারেই জমানোর বন্দোবস্ত করেছিলেন ইভা আর স্টিফেন।

সোমেশ্বরের চোখের সামনেই সেই রক্তের চৌবাচ্চার মধ্যে একটা ঢেউ উঠল। পুকুরের মধ্যে বড় কোনো মাছ ঘাই মেরে জলের নীচে ডুবে গেলে তার মাথার ওপরের জলটুকু যেমন একমুহূর্তের জন্যে ফুলে ওঠে, ঠিক সেইরকম। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, ওই রক্তের সঞ্চয়ের মধ্যে বাস করছে বৃহদায়তন কোনো জীব। সেটা যে কী, তা নিয়ে তদন্ত করার সাহস তাঁর ছিল না।

তিনি তড়িঘড়ি ম্যানহোলের ঢাকনাটা নামিয়ে দিয়ে কারখানা-ঘরের ভেতর থেকে আবার উঠোনে বেরিয়ে এলেন। উঠোন পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন বাঁ-দিকের ব্যারাক বাড়ির দালানে। হ্যাঁ রুদ্র, যে-বাড়িটায় এখন তোমার থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তোমাকে তো একটু আগেই বললাম, সত্তর বছর আগে ওই চারটে ঘরের মধ্যেই কোনো একটায় থাকতেন ইভা স্টাইনবেক। স্টিফেন মেয়ার মারা যাওয়ার পরে তিনি একাই থাকতেন।

শূন্য কারখানা। শূন্য উঠোন। এবং ব্যারাক বাড়ি দুটোতেও তখন থাকার কথা একমাত্র ইভার। সোমেশ্বর একবার কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটায় সময় দেখলেন। সাড়ে বারোটা। তিনি চিন্তা করলেন, ডাকব কি ইভাকে? পায়ে-পায়ে ইভার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেনও তিনি।

কিন্তু দরজায় নক করার আগেই তাঁর কানে এল ইভার গলা। একঘেয়ে সুরে এবং অচেনা-ভাষায় ইভা কিছু বলে যাচ্ছিলেন। সোমেশ্বরের মনে হয়েছিল সুরটা সাপুড়ে-বাঁশির সুরের মতন—যার মধ্যে একইসঙ্গে আদিমতা এবং সম্মোহন মিশে ছিল। সেই গান কিছুক্ষণ শুনলেই মন অবশ হয়ে যায়; অন্তত সোমেশ্বর কাপালির সেদিন তাই হয়েছিল।

ইভা কি মন্ত্র পড়ছেন? কোনোরকম প্রার্থনায় ব্যস্ত রয়েছেন? এইসময় তাঁকে ডাকা কি ঠিক হবে? কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না সোমেশ্বর।

ঠিক তখনই তাঁর চোখে পড়ল, ঘরের একটা জানলার পাল্লা অল্প একটু খোলা রয়েছে। হয়তো ছিটকিনি আলগা থাকায় জানলাটা সামান্য ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। ইভা কী করছেন দেখার জন্যে সোমেশ্বর সেই ফাঁকটায় চোখ লাগালেন! যা দেখলেন তা কোনো জীবিত মানুষের দেখার কথা নয়!

আমি একটু অধৈর্য হয়েই কাপালি স্যারকে জিগ্যেস করলাম, কী দেখলেন?

দেখলেন, ইভা স্টাইনবেক মেঝের ওপরে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন। দালানের দিকেই মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন, তাই দাদু তাঁকে সামনের দিক থেকে দেখেছিলেন। গায়ে একটা সুতোও ছিল না মহিলার—সম্পূর্ণ নগ্ন। আধো অন্ধকার ঘরটার মধ্যে সেই শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখে মনে হচ্ছিল একটা মোমের মূর্তি। সোনালি চুলের রাশি পিঠের ওপরে লুটোচ্ছিল। চোখদুটো আধবোজা। তিনি ওই অবস্থাতেই দুর্বোধ্য ভাষায় একটানা মন্ত্র পড়ে যাচ্ছিলেন।

দাদু লিখছেন—ইভার তলপেটের দিকে একপলক তাকিয়েই বুঝতে পারলাম যে, তিনি গর্ভবতী। আমি একজন চিকিৎসক। গর্ভলক্ষণ চিনতে আমার ভুল হয় না। অন্তত পাঁচমাসের গর্ভভার বহন করছেন তিনি।

আর যা দেখলাম তা আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা এবং সমস্ত অধ্যায়নের অতীত। চিকিৎসা-শাস্ত্র অথবা শরীরবিদ্যার কোনো গ্রন্থে এমন কোনো লক্ষণের কথা আমি পড়িনি। দেখলাম, ইভার স্বাভাবিক দুই স্তনের

মাঝখানে, ওঁর সম্পূর্ণ স্তনসন্ধি জুড়ে তৃতীয় একটি স্তন। বাকি দুটি স্তনের মতই সেটি পরিপূর্ণ, নিটোল এবং অপরূপ।

আমার পা কাঁপতে শুরু করল। আমার মনে হল ওই তৃতীয় স্তনটির শীর্ষে যা আছে, তা সাধারণ বৃন্ত নয়—চোখ। অদ্ভুত এক সম্মোহক-দৃষ্টিতে সেই চোখটি আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। এমনই সেই সম্মোহনের টান যে, প্রবল উচ্ছা সত্তেও আমি সেই জানলার সামনে থেকে এক-ইঞ্চিও নড়তে পারলাম না।

ঠিক তখনই মন্ত্রপাঠ থামিয়ে ইভা আমার দিকে তাকালেন। বিন্দুমাত্র অবাক হলেন না, সঙ্কুচিতও নয়। যেন সত্যিই ওই স্তনের চোখ দিয়েই তিনি আমাকে অনেক আগেই দেখে নিয়েছিলেন। তিনি বললেন, প্লিজ কাম ইন মিস্টার কাপালি। আই নিড ইউ। আই নিড ইয়োর হেল্প ব্যাডলি। অফকোর্স ইউ উইল বি রিওয়ার্ডেড ফর ইট।

এরপর দাদু লিখছেন, ইভা আমাকে সমস্ত কথা খুলে বলেছেন। লেবেনসবর্ন-প্রোগ্রামের কথা শুনে আমি তো হতভম্ব। উনি এখন এই কারখানায় সেই প্রোগ্রাম চালিয়ে যেতে চান। উনি যে-পথে হাঁটছেন সেই পথে হাঁটার জন্যে জার্মানিতে নাকি অসংখ্য মেয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে। সেই মেয়েদের পেছনে আবার রয়েছে নাৎসিদের গোপন সংগঠন। যুদ্ধ শেষ হলেও তারা শেষ হয়নি। সংগঠনের ধনকুবের সদস্যেরা আমাকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে, শুধু যদি ইভা স্টাইনবেকের সঙ্গে থাকি।

শুধু মুখের কথা নয়, ইভা আমাকে আজকেই একটা বিশাল হিরের ব্রোচ দিয়েছে, যেটার দাম কয়েক লক্ষ টাকা হবে। আমি ওকে বলেছি, আমার বাড়ি-জমির বিলি-বন্দোবস্ত করে কয়েকদিন বাদেই আমি ফিরে আসছি। কারণ, আমি জানি এই আগুন নিয়ে খেলায় আমি যেমন বড়লোক হতে পারি, তেমনি আমার প্রাণটাও চলে যেতে পারে। আমার পরিবারকে তো আর পথে বসিয়ে যেতে পারি না।

এই ঘোষণা দিয়েই সোমেশ্বর কাপালি তাঁর ডায়েরির লেখা শেষ করেছিলেন। ডায়েরির শেষ এন্ট্রি বলতে যা বোঝায়, তা হল এই। তবে বাবার কাছে শুনেছি, পরের দিনই তিনি আবার ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির কারখানায় ফিরে গিয়েছিলেন। তারপর আবার বারবার। এবং তার মাসখানেক পরেই সার্পেন্টাইন-লেনের পাট চুকিয়ে ওই কারখানার ব্যারাক বাড়িতেই থাকতে শুরু করেছিলেন। একবছরের কিছু বেশি সময় তিনি ওখানেই ছিলেন।

বিরাজ কাপালি কথা শেষ করে পর-পর দু-গ্লাস জল খেলেন। তারপর ডায়েরিগুলো গোছা করে তুলে বেডসাইড টেবলে নামিয়ে রাখলেন।

ফ্রেঞ্চ-উইন্ডোর কাচের বাইরে শিয়ালদার স্টেশনবাড়ির চুড়োগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। কান পাতলে শুনতে পাচ্ছিলাম, ফ্লাই-ওভারের ওপর দিয়ে ছুটে চলা ট্রামের চাকার ঘর্ঘর শব্দ। সবই কত সহজ, কত স্বাভাবিক।

কিন্তু এও জানি যে, মাত্র কুড়ি-মিনিটের দূরত্বে অন্ধকারে ডুবে আছে গোরে বিবি কি মহল্লা। সেখানে সন্ধের অন্ধকারে গাছের ওপরে ফুলের মতন ফুটে থাকে সুন্দর এক মৃত-মেয়ে—বিশাখা। সেখানে দ্বৈতসত্তা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় হাসি মণ্ডল।

এসব তো আমার নিজের চোখেই দেখা।

আর যা দেখিনি, তার কথা এখন শোনালেন বিরাজ কাপালি। তিনি বললেন ইভা স্টাইনবেকের তৃতীয় স্তনের কথা।

প্রকৃতির রাজ্যে মানবীর তৃতীয় স্তনের মতন কিছু কি হয়? নাকি, ওই স্তনও সেই সমান্তরাল পৃথিবী থেকে কালো হাওয়ায় ভর করে ভেসে এসেছিল?

কোলের ওপরে নামিয়ে-রাখা একটা ছোট রুমাল দিয়ে ঠোঁটের কোনগুলো মুছে নিয়ে বিরাজ কাপালি আবার কথা শুরু করলেন। তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম, তিনি আজ এই রাতের মধ্যেই আমাকে সব কিছু বলে যেতে চাইছেন। যেন তাঁর হাতে আর বেশি সময় নেই।

তিনি বলে চললেন...

সেই উনিশশো-একান্নর মার্চমাসে পাকাপাকিভাবে গৃহত্যাগের আগে দাদু তাঁর সমস্ত সম্পত্তি চার ছেলেমেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। স্থাবর-সম্পত্তি বলতে ছিল সার্পেন্টাইন-লেনের এই বাড়ি আর দমদমের কাছে ন'বিঘে জমি। দমদমের জমি তিনি তিন মেয়ে-জামাইয়ের নামে লিখে দিয়েছিলেন। বাবাকে দিয়ে গিয়েছিলেন এই বাড়ি, তবে বলে গিয়েছিলেন, সেটা তিনি পাবেন ঠাকুমা মারা যাওয়ার পরে। বাবা তাই পেয়েছিলেন। তার জন্যে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দাদুর গৃহত্যাগের লজ্জা সহ্য করতে না পেরেই সম্ভবত, ঠাকুমা ঠিক তার পরেপরেই মারা যান।

এই বাড়ি ছাড়াও তিনি আমার বাবা বিশ্বনাথ কাপালিকে একটা বড় অঙ্কের টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। শুনেছি পরিমাণটা ছিল ন'লক্ষ। এত টাকা পেয়ে বাবা তো অবাক। কারণ, ব্যাভারিয়া ইন্ডাস্ট্রি যে খুব ভালো চলছে না সেটা তিনি জানতেন। তাহলে সোমেশ্বর কাপালি এতগুলো টাকা পেলেন কোথা থেকে? ছেলের প্রশ্নের উত্তরে দাদু বলেছিলেন, এনিমি প্রপার্টি ট্র্যান্সফারের ফলে তিনি সবেমাত্র ঢাকার কারখানা আর জমি বাবদ পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে ওই টাকা পেয়েছেন। তবে মনে হয় কথাটা মিথ্যে। আসলে তিনি হিরের ব্রোচ বিক্রি করে পেয়েছিলেন ওই টাকা।

এই ডায়েরিগুলো দাদু সঙ্গে করে কবরডাঙার কারখানায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বহুদিন সেখানেই পড়েছিল। কাজেই আরও অনেক রহস্যের মতন ওই ন'লক্ষ টাকার রহস্যও আমার বাবার কাছে রহস্যই থেকে গিয়েছিল, যতদিন না তিনি নিজে ওই কারখানায় ঢুকে তত্ত্বতালাশ করে এগুলো হাতে পেয়েছিলেন।

যাই হোক, দাদু চেয়েছিলেন, ওই টাকায় বাবা নিজের ব্যবসা শুরু করুন। কিন্তু তা হয়নি। বাবা সারাজীবনে আর কোনো কাজই করেননি; বাবুয়ানি করেছেন। তবে সুরা, নারী বা ঘোড়দৌড়ের তামসিক বাবুয়ানি নয়। তাঁর ছিল সাত্ত্বিক নেশা। বইয়ের নেশা। পেন্টিং আর ভাস্কর্যের নেশা। দামি-দামি সুগন্ধী আর দেশি-বিদেশি পাখি পোষার নেশা। এইসবের পেছনেই তিনি অকাতরে ওই টাকা উড়িয়েছেন।

বাবার কথা পরে বলছি। আগে দাদুর কথা বলে নিই।

ওই যে বললাম, দাদু সার্পেন্টাইন-লেনের এই বাড়ির পাট চুকিয়ে ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির ব্যারাকবাড়িতেই থাকতে শুরু করেছিলেন, কথাটা এতটুকু মিথ্যে নয়। প্রথম-প্রথম বাবা এবং আমার তিন পিসেমশাই অনেকভাবে তাঁকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই সেই কাজে সফল হননি।

তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাবা এবং পিসেমশাইদের সেই চেষ্টায় ভাঁটা পড়েছিল।

স্বাভাবিক। টাকাকড়ি আর সম্পত্তির বিলিবন্দোবস্ত করে দিলে সংসারে একজন প্রৌঢ়ের আর কী দাম থাকে? আছেন তিনি নিজের মতন, থাকুন না। বরং পাড়ায় ফিরলেই তাঁর পরিবারকে আরো অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হত। এমনিতেই 'সোমেশ্বর কবিরাজ বুড়োবয়সে একটি মেম-মাগির পাল্লায় পড়েছে'—এটাই ছিল তখন বৈঠকখানা বাজারের সবচেয়ে মুখরোচক কেচ্ছা। লোকটা চোখের আড়ালে থাকলে সেই কেচ্ছা থিতিয়ে আসবে, এরকমটাই সকলে ভেবেছিলেন।

খুব একটা ভুলও ভাবেননি। কারণ দেখা গেল সত্যিই, বছর ঘুরবার আগেই লোকজন সোমেশ্বর কাপালির কেচ্ছা ভুলে নতুন-নতুন বিষয়ে মেতে উঠল। পিসি আর পিসেমশাইদের এ-বাড়িতে আসা-যাওয়া কমতে-কমতে একরকম বন্ধই হয়ে গেল। বাবা তাঁর পড়ে-পাওয়া বড়লোকি নিয়ে মেতে রইলেন। ঠাম্মা বুকে পাথর বেঁধে এককোণে পড়ে থাকতে-থাকতেই একদিন হঠাৎ করে স্বর্গে চলে গেলেন আর আমার মা, তখন নতুনবউ, মনের সুখে একেশ্বরীর মতন সংসার করতে লাগলেন।

সেই-দাদু তাঁর নিজের বাড়িতে আবার ফিরে এলেন উনিশশো বাহান্নর জুলাই মাসে। অর্থাৎ পাক্কা একবছর চারমাস বাদে।

সেদিন সকাল থেকেই নাকি প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। এমন-যে জমজমাট কোলে-মার্কেট, সেই বাজারেও সেদিন জনমানুষ ছিল না। রাস্তায় এক কোমর জল। ট্রাম-বাস বন্ধ। তার মধ্যেই আমার মা শুনলেন, সদর দরজায় কে যেন কড়া খটখটাচ্ছে।

দরজা খুলে মা দেখলেন শ্বশুরমশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিম্বা শ্বশুরমশাইয়ের প্রেত—অন্তত আমার মা সেরকমই ভেবেছিলেন। রক্তহীন ফ্যাকাশে চেহারা। তার ওপরে শরীরের ওপর দিয়ে ক্রমাগত বৃষ্টির জল বয়ে যাওয়ার ফলে গোটা গায়ের চামড়া যেন হেজে গিয়েছে। ধুতি আর পাঞ্জাবি গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে। দাদু সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছিলেন। মা দরজা খোলা মাত্রই দাদুর প্রাণহীন শরীরটা ওইখানেই লুটিয়ে পড়েছিল।

পুরো দৃশ্যটা মাথার মধ্যে থিতোতে একটু সময় লাগল। খুব স্বাভাবিকভাবেই কিছু প্রশ্ন মাথায় ঘুরছিল। কাপালি স্যারকে জিগ্যেস করলাম, মাঝের একবছর চারমাস আপনার দাদু কী করেছিলেন? ইভা স্টাইনবেকের বা তার সন্তানের কী হয়েছিল? কারখানাটারই বা কী হল তারপরে?

বিরাজ কাপালি বললেন, তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। কারণ দাদু যখন মারা যান, তখন আমার বয়স মাত্র একবছর। কাজেই আমার স্মৃতিতে কিছুই ধরা নেই। আর বাবা-মা কখনো আমার সামনে সেসব কথা আলোচনা করেননি। মনে হয়, ওই কারখানায় বসবাসের সময়টুকুতে দাদু আর ইভা কী করেছিলেন না করেছিলেন তা বাবা কিম্বা মাও জানতেন না। এখানে বসে ওদের পক্ষে জানা সম্ভবও ছিল না।

ইভা স্টাইনবেকের কী হয়েছিল জিগ্যেস করছ? তিনি মারা গিয়েছিলেন। কীভাবে মারা গিয়েছিলেন কেউই সঠিক বলতে পারে না। তবে ওই কবরডাঙা রোডের ধারেই একজায়গায় তাঁর কবর আছে। আমার দাদুই বস্তির লোকেদের কাজে লাগিয়ে ওই কবর বানিয়েছিলেন।

মনে পড়ল সেদিনই সন্ধেবেলায় হাসিদি আমাকে একটা ইটে বাঁধানো বেদির কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ওখানেই আমরা বসেছিলাম। তখন অবশ্য ওটাকে কবর বলে বুঝতে পারিনি।

কাপালি স্যার বলে চলেছিলেন—যারা কবর বানানোয় হাত লাগিয়েছিল, তাদের মধ্যে দু-একজন এখনো বেঁচে আছে। ট্যাংরা বস্তিতে সেরকম একজনের খোঁজ পেয়েছিলাম, নাম নাসিরুদ্দিন মিস্ত্রি। এখন তার বয়স প্রায় নব্বই-বছর, স্মৃতি অনেকটাই ঝাপসা হয়ে গেছে। তবু তার কথা শুনে মনে হল, দাদু যেদিন মারা গিয়েছিলেন, তার আগের দিনই মারা গিয়েছিলেন ইভা স্টাইনবেক। ইভাকে সমাধি দিয়ে দাদু শূন্য কারখানা থেকে নিজের সংসারে ফিরতে চেয়েছিলেন। পারলেন না। দরজার বাইরেই মারা গেলেন।

ইভার পেটের সন্তানটিও নিশ্চয় মারা গিয়েছিল। জন্মের আগে না পরে, জানি না। হয়তো আগেই।

বস্তির বাসিন্দাদের কাছে শুনবে, ইভা স্টাইনবেক এখনো ওই রাস্তায় ঘোরাফেরা করেন। মাঝরাতে ওই কবরের ওপরে তাঁকে বসে থাকতে দেখা যায়। সেই থেকেই লোকের মুখে-মুখে রাস্তাটার নাম হয়ে গেছে গোরে বিবি রোড।

আর কারখানার কথা জিগ্যেস করছ? ওই অভিশপ্ত কারখানার যা হবার কথা, তাই হয়েছিল। গত সত্তর-বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। মজার কথা কী জানো, কলকাতার যে কুখ্যাত চোরেরা সুযোগ পেলে রেলগাড়ির কামরা অবধি পিস পিস করে খুলে নিয়ে গিয়ে বেচে দেয়, তারাও কখনো গোরে বিবি কি মহল্লার ওই কারখানার একটা ইটেও হাত দিতে সাহস পায়নি।

সত্তর-বছরের মধ্যে একবারই মাত্র সেই সাহস দেখিয়েছিলেন আমার বাবা—বিশ্বনাথ কাপালি। আমার তখন সতেরো বছর বয়স। তখনো স্কুলে যাতায়াত করতে পারতাম। জানতাম না, আর কয়েক-বছর বাদেই এই অসুখে পঙ্গু হয়ে যাব...

কথা বলতে-বলতে হঠাৎই তিনি থেমে গেলেন। চোখের দৃষ্টিতে শূন্যতা ঘনিয়ে উঠল। বুঝতে পারলাম, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছেন। বাধ্য হয়ে বললাম, কী হয়েছিল?

কীসের কী হয়েছিল? চমকে উঠলেন বিরাজ কাপালি।

বললাম, আপনার সতেরো বছর বয়সে কী হয়েছিল?

হ্যাঁ। আমার যেহেতু তখন সতেরো বছর বয়স, কাজেই অনেককিছুই মনে আছে। বাবা-মার কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারতাম, চরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। দাদুর দান করে-যাওয়া টাকা তলানিতে ঠেকেছে। ন্যাচরালি, বাবার তখন মনে পড়েছিল গোরে বিবি মহল্লার কারখানাটার কথা। নিজে ব্যবসা চালাবার কথা ভাবেননি, কারণ সেটা তিনি পারতেন না। অভিজ্ঞতা ছিল না। জমিটা বিক্রি করার কথাই ভেবেছিলেন।

মনে আছে, বাবা প্রসঙ্গটা উত্থাপন করা মাত্র মা প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিছুতেই তিনি বাবাকে ওই ভুতুড়ে জায়গায় যেতে দিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু বাবা শোনেননি মায়ের কথা। তিনি দালাল-টালাল নিয়ে ওদিকে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। কিন্তু তারপরে হঠাৎই তিনি খুব ভয় পেয়ে গেলেন।

ভয় পেয়ে গেলেন! কেন? কিছু দেখেছিলেন?

কিছু দেখেছিলেন কিনা জানি না। তবে ওই কারখানা-ঘরেই তিনি এই ডায়েরিগুলো ছাড়াও আরো কয়েকটা জিনিস খুঁজে পেয়েছিলেন। আর এইসব পড়ে আর দেখেই তিনি প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন।

## আট

কাপালি স্যারের ঘরের দেওয়ালের সবকটা ঘড়ি, মায় ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে-থাকা গ্র্যান্ডফাদার-ক্লকটা অবধি ঠিক এইসময়ে একসঙ্গে বেজে উঠল। দশটা বাজল। কথায়-কথায় যে কখন প্রায় একঘণ্টা কেটে গেছে বুঝতেই পারিনি। তবে অসুবিধে নেই। কলকাতা শহরে এই এপ্রিল মাসে রাত দশটা মানে সন্ধে। তাছাড়া আমাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে প্রশান্তবাবু রয়েছেন।

ঘণ্টার আওয়াজ থামার পরে কাপালি স্যার বললেন, আমাদের কথা আর খুব বেশি বাকি নেই। তবু সংক্ষেপেই বলছি।

যে জিনিসগুলো বাবাকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল, আপাতদৃষ্টিতে সেগুলো এতই সাধারণ যে বলবার কথা নয়। একজন মানুষ রাস্তায় এগুলোকে পড়ে থাকতে দেখলে হয়তো পাশ কাটিয়ে চলে যেত। কিন্তু বাবা ছিলেন অ্যান্টিক-কালেক্টর। তিনি সেগুলোকে শয়তান-সাধনার উপকরণ বলে চিনতে পেরেছিলেন। ওই তুমি যাকে একটু আগে বললে ডেভিল-ওয়রশিপ।

বলেন কী! কাপালি স্যারের কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম।

হ্যাঁ। জিনিসগুলোর প্রকৃত পরিচয় জানলে তুমি বুঝতে পারবে বাবার আতঙ্কিত হওয়ার কারণ। সেটাই তোমাকে আগে বলি।

তুমি জানো নিশ্চয়ই, আফ্রিকা এবং ইওরোপে শয়তানের আরাধনা বা ডেভিল-ওয়রশিপের ইতিহাস আজকের নয়। খ্রিস্টধর্মের থেকেও প্রাচীন তার ইতিহাস এবং ওরা স্বীকার করুক বা নাই করুক, আজ অবধি কখনোই সেই সাধনায় ছেদ পড়েনি। বরং আমেরিকাতেও দিব্যি ছড়িয়ে পড়েছে।

নানান কালচারের মানুষদের কাছে শয়তানের নানারকম নাম। মিশরে ডেভিল-ওয়ারশিপারদের কাছে তিনি ছিলেন বেড়ালমুখো বাস্টেট। ব্যাবিলন কিম্বা সিরিয়ায় বৃষদেবতা ব্যাল। গ্রিসে অজ-মানব প্যান। আর লুসিফার কিম্বা বিলজিবাবের উল্লেখ তো বাইবেলের মধ্যেই রয়ে গেছে।

এই দেবতাদের মধ্যে একটা জায়গায় মিল রয়েছে। স্যাটানই হোক কিম্বা প্যান, বাস্টেট কিম্বা ব্যাল, তারা কেউ কাল্পনিক অস্তিত্ব নন। পদ্ধতি মেনে ডাকলে তাঁরা এই ধুলোমাটির পৃথিবীতে সশরীরে নেমে আসেন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। এমনকী নারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্তানও দেন তাদের।

আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, এই শয়তান-আরাধনার পদ্ধতি আর উপকরণগুলোও সারা পৃথিবীতেই প্রায় এক। হয়তো শয়তানও আসলে একজনই, পৃথিবীর নানান কোণে তাকে নানান নামে ডাকা হয়।

ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির কারখানায় বাবা এরকমই এক সেট উপকরণ খুঁজে পেয়েছিলেন। একজন অ্যান্টিক কালেকটার হিসেবে সারা পৃথিবীর ফোক-আর্টের সঙ্গেই বাবার পরিচয় ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সেগুলোর অরিজিন রুমানিয়ার কোনো জায়গায়।

আমি বললাম, তার মানে স্টিফেন মেয়ার এগুলো নিয়ে এসেছিলেন?

একদম ঠিক। দাদুর এই ডায়েরিগুলো আমার বাবা যে পড়েননি তা তো হতে পারে না। কাজেই বাবাও জানতেন স্টিফেন মেয়ার রুমানিয়ার জিপসি সম্প্রদায়ের মানুষ। মেঘালয়ের যাজকের পরিচয়টা একটা ব্লাফ। আসলে তিনি ছিলেন ডেভিল-ওয়রশিপার। তবে ভারতে যে অনেকদিন ধরে ঘুরছিলেন সেটা সত্যি। মনে হয় নিজের সাধনার জন্যে একটা মনোমতন জায়গা আর একজন সহচরী খুঁজছিলেন। কবরডাঙার কারখানা তাঁকে দিয়েছিল প্রথমটা আর ইভা দ্বিতীয়টা।

অবশ্য ইভার নিজেরও একটা অ্যাজেন্ডা ছিল। হ্যাঁ, ওই লেবেনসবর্ন প্রোগ্রাম নিয়েই। ডিটেলসটা একটু পরে বলছি।

যাই হোক, মূল কথা হল ইভা আর স্টিফেন দুজনে মিলে এই কবরডাঙার নির্জন মাঠে সেই শয়তান নামানোর বিদ্যা হাতে-কলমে কাজে লাগিয়েছিলেন।

হয়তো আমার চোখে অবিশ্বাসের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। তাই কিছুক্ষণ দোনামোনা করে বিরাজ কাপালি বললেন, আচ্ছা, জিনিসগুলো তোমাকে দেখাই। আমার মাথার কাছের আলমারিটা খোলো। দ্যাখো, নীচের তাকে একটা বড় কাঠের বাক্স আছে, ওটা নিয়ে এসো।

বাক্সটা বার করে নিয়ে এলাম। কাপালি স্যারের নির্দেশমতন সেটা ওঁর কোলের ওপরে নামিয়ে রাখলাম। উনি চাদরের মধ্যে থেকে হাত বার করে বাক্সটার ডালা খুলে, তার ভেতর থেকে একে-একে বার করলেন একটা পোড়ামাটির ঘট, একটা বাঁশের চলটা দিয়ে বানানো ছুরি আর তাঁতে বোনা খুব রংচঙে একটা কাপড়ের টুকরো।

সেগুলোকে বিছানার চাদরের ওপরে সাজিয়ে রেখে বিরাজ কাপালি নিজের মনেই বললেন, আমি নিজেও রিসেন্টলি রুমানিয়ার ফোক-আর্টের অ্যালবামের সঙ্গে এগুলোকে মিলিয়ে দেখেছি। ছুরি আর পাত্রের এই গড়ন, কাপড়ের মোটিফ সবই মিলে যাচ্ছে। বাবা কিছু ভুল বলেননি। এবং জেনে রাখো, সারা পৃথিবীতেই ঠিক এই জিনিসগুলোই ডেভিল ওয়ারশিপের কাজে ব্যবহৃত হয়। অঞ্চলভেদে শুধু তাদের উপাদান বদলে যায়। গ্রিসের কোনো দ্বীপে হয়তো এই ঘটিটা তৈরি হত ব্রোঞ্জ দিয়ে। আবার মিশরে হয়তো এই উলেন কাপড়ের বদলে সুতির কাপড় ব্যবহৃত হত। কিন্তু জিনিসগুলোর চরিত্র একই থাকত।

বললাম, চরিত্র মানে?

কাপালি স্যার হেসে বললেন, চরিত্র মানে যা চোখে দেখা যায় না। যেমন, চোখে দেখে তুমি বুঝতে পারবে না যে, এই ঘটিটার মধ্যে একটা প্ল্যাসেন্টা ছিল—যাকে বাংলায় বলা হয় নাড়ি কিম্বা ফুল। যে নাড়ির মধ্যে দিয়ে গর্ভের ভ্রূণের সঙ্গে মায়ের রক্তের যোগ থাকে। শিশুর জন্মের পরে ফুলটাকে এইধরনের ঘটিতে করে মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয়। এটাকেও মাটির নীচ থেকেই চুরি করে তুলে আনা হয়েছে।

এই যে বাঁশের ছুরি! এটাও ব্যবহার করা হয় বাচ্চার নাড়ি কাটার কাজে। আর এই কাপড়টা আসলে মৃত শিশুর দেহ আচ্ছাদনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। আমার বাবা এগুলোর আসল চরিত্র জানতেন।

বললাম, এই উপকরণগুলো হাতে পেলেই যে কেউ শয়তানকে ডেকে আনতে পারবে?

কাপালি স্যার বললেন, উঁহু! একেবারেই না। তারও বিশদ পদ্ধতি আছে এবং বাবা সত্যিকারে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন তখনই, যখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির কারখানা ঘরের ভেতরে সেই পদ্ধতি মেনে শয়তান নামানোর পালা শেষ হয়ে গেছে।

দ্যাখো, সেই পদ্ধতি যে কেমন, তা আমি অত ডিটেলে বলতে পারব না। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বাবার মুখে শোনা কিছু কথা—তার সব তো আমার মনে নেই। তবে যেটা মনে আছে, সেটা হল, ডেভিল, ডেমন কিম্বা শয়তান যাই বলো, তাকে নিয়ে আসার জন্যে প্রথমে নরকের সঙ্গে পৃথিবীকে একটা ঘরের মধ্যে দিয়ে জুড়ে দিতে হয়। যেমন মাটির নীচে যে-জল, সেই জলের কাছে পৌঁছতে গেলে একটা কুঁয়ো খুঁড়তে হয়, সেইরকমই। শয়তান-উপাসকদের কাছে এই কুঁয়োটা একটা ঘর। নরকের সঙ্গে সেটা যুক্ত। শয়তানকে ডাকলে তিনি সেই ঘরে আবির্ভূত হন।

ঘরটাকে এমন হতে হবে, যে-ঘরের বাতাসে অনেক মানুষের আতঙ্ক আর শোক জমে পাথর হয়ে আছে। রুমানিয়ার জিপসিরা সাধারণত মড়কে উজার হয়ে যাওয়া কোনো গ্রামের একটা তাঁতঘর বেছে নিত। তাঁতঘর বোঝো তো? কাপড় বুনবার তাঁতযন্ত্র বসানো থাকে যে ঘরে। ওরা সেই ঘরটাকেই নানান গুহ্য প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শয়তানের ঘরে রূপান্তরিত করত।

কাপালি স্যারের কথা শুনতে-শুনতে আমার মাথার মধ্যে একটা ছবি আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। বললাম, তাঁতঘরের বদলে পোর্সেলিনের কারখানা হলে হবে?

কাপালি স্যার অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, হবে নয়, বললামই তো, হয়েছিল। তবে তার জন্যে স্টিফেন মেয়ারের মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল না।

তাহলে যে আপনি বললেন, সেই ঘরে অনেক মানুষের আতঙ্ক আর শোক জমে থাকতে হবে। স্টিফেন মেয়ার ছাড়া আর কেউ তো...

কাপালি স্যার বললেন, আর কেউ ওই কারখানায় মারা যায়নি, তাই তো? তা হয়তো যায়নি, কিন্তু তবুও বহু নিরীহ মানুষের দীর্ঘশ্বাস ওই ঘরে তখনো ছিল এবং এখনো জমে রয়েছে।

কীভাবে?

এইভাবে—!

বিরাজ কাপালি সেই কাঠের বাক্সটার ভেতর থেকে খুব সাবধানে একটা নরম কাপড়ের মোড়ক বার করে আনলেন। তারপর মোড়কটা খুলে একটা পোর্সেলিনের প্লেট বার করে কোলের ওপরে রেখে আমাকে বললেন, কাছে এসো। ভালো করে দ্যাখো। রক্তের দাগ দেখতে পাচ্ছ?

আমি ওঁর কোলের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে দেখলাম, সত্যিই, সাদা প্লেটটার গায়ে কোনো তরল শুকিয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে। কালচে রঙ দেখে সেটাকে রক্তের দাগ বলেই মনে হল। আমি চোখে প্রশ্ন নিয়ে কাপালি স্যারের দিকে তাকালাম। উনি বললেন, এরকম রাশি-রাশি পোর্সেলিনের প্লেট আর মিনিয়েচার স্ট্যাচু তুমি নিশ্চয়ই ওখানে দেখেছ; মানে ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির কারখানা-ঘরের র‍্যাকে। এর প্রত্যেকটির সঙ্গে মৃত-মানুষের দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে।

কেন? আমি জিগ্যেস করলাম।

হলোকস্টের সময় জার্মান গেস্টাপো-বাহিনী যখন দলে-দলে ইহুদিদের ধরে কনসেনট্রেসন-ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সেই হতভাগ্য ইহুদি-পরিবারগুলোর ঘর থেকে যত বাসন-কোসন আর আসবাবপত্র তুলে নিয়ে গিয়েছিল ইভা স্টাইনবেকের মতন এস এস বাহিনীর কর্মীরা। ম্যুনিখ শহরের বড়-বড় ডিপার্টমেন্টাল

স্টোরে নিলামে বিক্রি করা হত সেই ইহুদিদের সম্পত্তি। এখনো তুমি গুগল সার্চ করলে সেরকম নিলামখানার ছবি দেখতে পাবে।

বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতে পালিয়ে আসার সময় ইভা স্টাইনবেক বাক্স ভর্তি করে ওরকম ইহুদি ক্রকারির স্তূপ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি জানতেন, ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির ফার্নেসে একটি-দুটি করে এই কাচের বাসন আহুতি দিতে হবে। তাতেই শয়তানের টনক নড়বে। তিনি সহজে দেখা দেবেন।

জিগ্যেস করলাম, এইভাবে ইভা স্টাইনবেক আর স্টিফেন মেয়ার দুজনে মিলে ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির কারখানাটাকেই শয়তানের ঘর বানিয়ে তুলেছিলেন?

হ্যাঁ। প্রথম থেকেই সেটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। ওসব ব্লাড চারকোল ফারকোল সবই বাজে কথা। কসাইখানার ওই রক্ত, এই কাচের বাসন, ওই ফার্নেস—সবই ছিল শয়তানের ঘর বানানোর প্রক্রিয়া।

ওদের উদ্দেশ্য কী ছিল?

তক্ষুনি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিরাজ কাপালি আবারও বাক্সের ভেতর থেকে একটা নরম কাপড়ের মোড়ক বার করে আনলেন। বাক্সটা খালি হয়ে গেল। তিনি মোড়কটা খুলে বার করে আনলেন একটা দশ ইঞ্চি মাপের স্কাল্পচার। জিনিসটা দেখে মনে হল, কোনো পশুর হাড় খোদাই করে সেটাকে তৈরি করা হয়েছে। এবার আমাকে আর কাছে যেতে হল না। এতই নিখুঁত ছিল সেই ভাস্কর্য যে, আমি নিজের জায়গায় বসেই তার সমস্ত ডিটেলস পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম।

মোট তিনটে ফিগার ছিল মূর্তিটার মধ্যে।

একদম পেছনে এক বৃষ-মানুষ। তার পেশিবহুল হাত, পা এবং দেহকান্ড সবকিছুই মানুষের মতো। শুধু ঘাড়ের ওপরে মাথাটা মানুষের নয়, ষাঁড়ের। যেন বিজয়গর্বে মাথাটা সামান্য পেছনে হেলিয়ে রেখেছে সেই মহাষন্ড। তার দুই উরুর মাঝখানে প্রকট অতিদীর্ঘ লিঙ্গটিও মানুষের নয়, ষাঁড়ের। আর দুই পায়ে পাতার বদলে চেরা-ক্ষুর।

বৃষমানুষের সামনে একটা পাথরের ওপরে বসে রয়েছে এক নারী। এক জননী। তার কোলে শুয়ে রয়েছে এই ভাস্কর্যের তৃতীয় মূর্তিটি—যা এক সদ্যোজাত শিশুর মূর্তি। নারীটি পরম মমতায় তাকিয়ে রয়েছে কোলের শিশুটির দিকে। শিশুটিকে সে স্তন্যদান করছে।

এই স্কাল্পচারটা পৃথিবীর আর সমস্ত স্কাল্পচার থেকে আলাদা শুধু ওই স্তনের কারণে। নারীটির বুকে তিনটি স্তন। শিশুটি মাঝের স্তন থেকে দুগ্ধপান করছে।

আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। নিজের অজান্তেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'ওহ্ মাই গড।'

বিরাজ কাপালি বললেন, এইসব মূর্তির উপস্থিতিতে গডের নাম কোরো না হে জোসেফ রুদ্রনাথ। এরা গডের প্রতিদ্বন্দ্বী। শয়তান পরিবারের সদস্য এরা।

বললাম, কিন্তু কেন? কেন স্যার?

কী 'কেন'? তৃতীয় স্তন? শোনো। ডেভিল, ডেমন, প্যান, বাস্টেট কিম্বা ব্যাল—এদের সঙ্গে জড়িত যত মিথ—সবক'টাতেই এই তৃতীয় স্তনের কথা আছে। নারীর স্বাভাবিক যে-দুটি স্তন, সে তো ঈশ্বরের দান। স্বাভাবিক মানবশিশুদের জন্যে ওই স্তনদুটি ঈশ্বরের করুণাধারার পাত্র। কিন্তু শয়তান তার নিজের ঔরসজাত সন্তানের জন্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ নেবে কেন? তাই শয়তানের সঙ্গে মিলনের ফলে কোনো নারী গর্ভবতী হলে, তার বুকে গজিয়ে ওঠে ওই তৃতীয় স্তন। যেমন গজিয়ে উঠেছিল...

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি বলে উঠলাম, ইভা স্টাইনবেকের বুকে।

এগজ্যাক্টলি।

তারপর আপনার বাবা কী করলেন?

তিনি এই জিনিসগুলো বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। মাকে যখন বিশদে সবকিছু বুঝিয়ে বলছিলেন, তখন আমার কানেও কিছু কথা এসেছিল। খুব একটা মনোযোগ দিইনি। তবে বাবার একটা কথা মনে গেঁথে

আছে। বাবা বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামে খুব নিরাপদে রাজনীতি করা যায়। দুনিয়া জুড়ে পুরুত মোল্লা, পাদ্রী আর রাষ্ট্রনায়করা তার প্রমাণ রেখে চলেছে। কিন্তু শয়তানকে যে রাজনীতির কাজে লাগানো যায় না, সেটা বুঝতে নাৎসি-মেয়ে ইভা স্টাইনবেকের একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। ফলে সে তো মরলোই, মাঝখান থেকে প্রাণ গেল আমার বেচারা বাবার। উনি সোমেশ্বর কাপালির কথা বলছিলেন, বুঝতেই পারছ।

বাবা নিজে যেটা বুঝতে পারেননি সেটা হল, শয়তানের-জমি বিক্রিও করা যায় না। ওই ঘটনার ক'দিন পরেই বাবা এক ডিমোলিশন-ফার্মকে ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিনের কারখানা দেখিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পরের সপ্তাহেই ওই বিল্ডিং ডিমোলিশ করার কথা হয়েছিল। কিন্তু তিনিও আর বাড়িতে ঢুকতে পারলেন না। যে-কানাগলিটা ধরে এই বাড়িতে তুমি আজ ঢুকলে, ওই গলির একটু ভেতরেই তিনি উপুড় হয়ে পড়েছিলেন।

খুন?

হ্যাঁ, খুন।

কে করল? কেনই বা করল?

কাপালি স্যার বললেন, লোকে বলে নকশালেরা। পুলিশও একই অনুমানে কেসটা ক্লোজ করে দিয়েছিল। সালটা উনিশশো উনসত্তর। কাজেই অবিশ্বাস করার কিছু নেই, যদিও বাবার মতন অরাজনৈতিক লোক কেনই বা নকশালদের টার্গেট হবেন তা বোঝা কঠিন। তাছাড়া বাবার ডেডবডির পাশে যে-ছুরিটা পড়েছিল, যেটা দিয়ে বাবার গলার নলি কেটে ফেলা হয়েছিল, সেটা ঠিক এইরকম একটা ছুরি। বাঁশের চোঁচ দিয়ে বানানো। কলকাতার নকশাল-যুবকেরা রুমানিয়ার জিপসি-ছুরি দিয়ে অপারেশন করছে, এটা কি তোমার বিশ্বাসযোগ্য লাগছে?

সে যাইহোক, মোদ্দা কথা হল, বাবার মার্ডার নিয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য হল না। তখন সকাল-বিকেল কলকাতায় লাশ পড়ছে। তার মধ্যেই আরেকটা লাশ হয়ে মিশে গেলেন বিশ্বনাথ কাপালি।

ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির কারখানার তো আগে থেকেই ভূতুড়ে বাড়ি দুর্নাম ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পরে সেই দুর্নামের মাত্রা চড়ল। উনিশশো উনসত্তরের পর আবার পঞ্চাশ-বছর সেই কারখানা ফাঁকা পড়ে রইল, কেউ ওখানে পা দিল না। তারপর আজ থেকে দু-বছর আগে আবার আমি গেলাম ওখানে। মানে যেতে বাধ্য হলাম। অনেকটাই আমার বাবা যে-কারণে গিয়েছিলেন সেই একই কারণে—অর্থসংকটে।

তারপর একটু ইতস্তত করে বিরাজ কাপালি বললেন, না। মিথ্যে বলব না। অর্থসংকটে নয়, অর্থলোভে।

লোভটা দেখাল, ওই নীচের ঘরে যে বিদেশিনীদের দেখলে, তারা। দু-বছর আগে থেকে ওরাই যাতায়াত শুরু করল এখানে, আমার কাছে। ওদের একটাই অনুরোধ। ডেমনের সঙ্গে সঙ্গমের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সে কী! ওরা কারা? আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম।

'নিও-নাৎসি'। সোজা কথায় নতুন নাৎসি। গোপনে-গোপনে ওরা আবার ছড়িয়ে পড়ছে জার্মানির আনাচে-কানাচে। কিন্তু ওদের দর্শনটা পুরোনো। সেই হিমলারের দর্শন—জার্মান নারীদের গর্ভে জন্ম নেবে এমন সব সন্তান যাদের রক্তে কোনো নীচ জাতির ভেজাল থাকবে না। ইহুদিদের নয়, অনার্যদের নয়। অতএব আদিম দেবতা বা ডেমনের সন্তান চাই ওদের। সেই আশা নিয়েই ওরা এখানে, সার্পেন্টাইন-লেনের এই কানাগলিতে খুব গোপনে যাতায়াত করছে। তার বদলে ওরা আমাকে যে পয়সাটা কবুল করছে, সেটা অবিশ্বাস্য। আমার এই-মুহূর্তে পয়সার খুব দরকার। সম্পত্তি বেচে খাচ্ছি।

কিন্তু ওরা আপনার কারখানার সঙ্গে শয়তানের যোগসূত্রের কথা জানল কেমন করে?

কেন? ইভা স্টাইনবেক যে সংগঠনের সদস্যা ছিলেন ওরাও তো তারই সদস্যা। ওরাও তো লেবেনসবর্ন-গার্লস। ইভা স্টাইনবেক কোন উদ্দেশ্যে ভারতের কোথায়-কোথায় ঘুরেছিলেন তার কিছু নথি তো ওদের হাতে পৌঁছবেই।

ইভা নাকি সেই সত্তরবছর আগে শয়তানের সঙ্গে সফল মিলনের পরে আনন্দে পাগল হয়ে ওদের সেই গোপন-সংগঠনের সর্বময় কর্তাকে চিঠি লিখেছিল—আমি আমার স্বপ্নের খুব কাছে এসে পৌঁছেছি। সবচেয়ে

আশ্চর্য কী জানো রুদ্র, এই মেয়েগুলো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ইভা আর স্টিফেনের সাধন-প্রক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। প্রথম যখন আমার সঙ্গে দেখা করেছিল, তখন ওরা খুব কনফিডেন্টলি বলেছিল, শুধু ব্যাভেরিয়া ইন্ডাস্ট্রির ঘরটা পেলে বাকি কাজটা ওরা নিজেরাই করে ফেলতে পারবে।

ইভা স্টাইনবেক আর সোমেশ্বর কাপালির অপঘাত মৃত্যুর কথা আপনি ওদের বলেননি? বলেননি আপনার বাবার মৃত্যুর কথা?

সব বলেছি। কিন্তু ওরা নাছোড়। ফ্যানাটিকদের সাইকোলজি এরকমই হয়।

তারপর?

এখনো অবধি ওরা সাফল্য পায়নি। ওরা বলছে, ডেমন নাকি ওদের দেখাও দিয়েছেন। কিন্তু তিনি খুঁজছেন তাঁর আগের সন্তানকে। তাকে না পেলে তিনি আর নতুন সন্তান দিতে রাজি নন।

কিন্তু তাকে আপনারা পাবেন কোথায়? সেই বাচ্চা তো মারাই গেছে মনে হয়।

বিরাজ কাপালি কাঠের বাক্সের মধ্যে জিনিসগুলো একে একে গুছিয়ে তুলে রাখতে-রাখতে বললেন, জানি না। ওদের বক্তব্য, সে বেঁচে আছে। ডেমন নিজেই তাকে নিয়ে আসবেন।

আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো। ওদের আপনি ওই কারখানায় রেখেছেন কেন? ওই হাসি, পঙ্কজ, বিশাখাদের?

বিরাজ কাপালি বললেন, ওরা এমনিই চলে আসে রুদ্র। যখন সোমেশ্বর কাপালি আর ইভা স্টাইনবেক ওই কারখানায় ছিলেন, তখনও এরকম অদ্ভুত কিছু নারী-পুরুষ সেখানে এসেছিল। আমার ধারণা, এই পৃথিবীতে কিছু-কিছু মানুষের ওপরে খুব স্বাভাবিকভাবেই শয়তানের প্রভাব এসে পড়ে। তাদের মধ্যে কিছু-কিছু অলৌকিক ক্ষমতা দেখা যায়। আলো দেখলে যেমন মথেরা আপনা থেকেই সেদিকে ছুটে যায় ওরাও সেইভাবেই ওই কারখানায় চলে আসছে। আমি ওদের তাড়াইনি। আছে থাক। যদি ওদের অস্তিত্ব শয়তানের মনঃপূত হয়, যদি ওদের জন্যে তার এখানে আসার টান বাড়ে, তাহলে ক্ষতি কী?

আমাকে কেন নিয়ে এলেন? আমিও কি বিশাখা, পঙ্কজ আর হাসিদির দলে? শয়তানে পাওয়া ছেলে?

না না! কখনোই নয়। এর উত্তরও আমি তোমাকে দেব। তবে আজ নয়। এগারোই এপ্রিল। আর ঠিক পাঁচদিন পরে। সেদিন শুকতারা মানে শুক্রগ্রহ পৃথিবীর খুব কাছে আসছে। ভোরের আকাশে এক জ্যোতিষ্কের ঔজ্জ্বল্যে সেদিন ফুটে উঠবে সেই তারা। তুমি জানো কিনা জানি না, খ্রিস্টধর্ম যাকে শয়তান বলে দেগে দিয়েছে, সেই ঈশ্বরবিরোধী লুসিফার আসলে শুকতারার সন্তান। তিনি ভোরের দেবদূত। আমি নিজেও জানতাম না। ওরাই আমাকে বলল—ওরা মানে ওই এমা, হানা, সোফিয়া, লীনারা। সেদিনই ওরা আবার লুসিফারের কাছে সঙ্গম প্রার্থনা করবে। ওদের ধারণা সেদিন ওরা সফল হবেই। সেদিনই তোমাকে আমি বলব, তোমাকে কেন এখানে এনেছি।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, বেশ। তাই হবে। এই ক'দিন কি আমাকে ওখানেই থাকতে হবে স্যার? না, মানে ভাবছিলাম যদি এদিকে একটা হোটেল-টোটেলে মাঝের এই ক'টাদিন কাটিয়ে দিই। নিজের টাকাতেই থাকব, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।

বৃদ্ধ কাপালি স্যার হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে বললেন, না রুদ্র, প্লিজ। ওখানেই থাকো। তোমার ওখানে থাকাটা খুব জরুরি।

আচ্ছা বেশ। তবে ওই অবধিই। তারপরে আর থাকব কিনা সেটা বলতে পারছি না।

শেষ অবধি রাত বারোটা নাগাদ প্রশান্তবাবুর গাড়িতে কাচ কারখানায় পৌঁছেছিলাম। ওরা জেগেই ছিল। ক্লান্ত লাগছিল খুব। সেটা যতটা না শরীরের ক্লান্তি, তার চেয়ে বেশি মনের। কোনোরকমে দুটো রুটি পেটে চালান করে, নিজের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম।

## নয়

তারপর আরো তিনটে দিন কেটে গেছে। কারখানা আর ব্যারাকবাড়ির পরিবেশটা উত্তরোত্তর কেমন যেন গুমোট হয়ে উঠছে। এই পরিবর্তনটা যে আমার কল্পনা নয়, সেটা ওদের তিনজনকে দেখলে বুঝতে পারি। যেমন, কয়েকদিন আগে হাসিদি হঠাৎ আমাকে বলল, সবকিছু কেমন যেন বদলে যাচ্ছে, তাই না?

আমি বললাম, মানে?

ও বলল, কিছুদিন আগে অবধিও মনে হত আমার শরীর-মনের মালিক আমি নিজে। এখন মনে হয় কে যেন ভেতর থেকে আমার দখল নিয়ে নিচ্ছে।

হাসিদির কথা শুনে আমি চট করে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পঙ্কজদা আর বিশাখার দিকে তাকালাম। সেটা হাসিদির চোখ এড়ালো না। হাসিদি আজকাল খুব কমই হাসে। তবু তখন একবার হেসে উঠল। হাসতে-হাসতেই বলল, হ্যাঁ, ওরাও। ওরা আমাকে বলেছে, মনে হচ্ছে যেন কেউ খুব কাছে...একেবারে বুকের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমারও কি এরকমই মনে হচ্ছে, রুদ্র?

আমি বললাম, আমার ভেতরে একজন তো অনেক আগেই থেকে রয়েছেন। তবে হ্যাঁ। ইদানিং তাঁকে খুব স্পষ্ট করে টের পাই।

কাল থেকে মাঝে-মাঝে শুধু কাচ কারখানার মাথার ওপরের আকাশে বারুদ-রঙের মেঘ জমা হচ্ছে। পঙ্কজদার শরীরের ঘন বাদামি লোমের ভেতরে চিরচির শব্দ করে স্ট্যাটিক-ইলেকট্রিসিটির নীল আগুন দৌড়োদৌড়ি করে। বোবা মানুষটা অসহায়ের মতন আকাশে মুখ তুলে আর্তনাদ করে ওঠে—ওওওউউউ ওহ ওহ ওহ!

সুন্দরী বিশাখা মাথা নীচু পা ওপরে করে বিশাল টিকটিকির মতন কুঁয়োর দেয়াল বেয়ে সরসর করে নীচে নেমে যায়। একটু বাদে আবার ঠিক টিকটিকির মতই দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠে আসে। তখন ওর সর্বাঙ্গ ভিজে সপসপ করে। ওর চুল থেকে, ওর সাদা কাপড়ের থান থেকে মোটা হয়ে জলের ধারা ঝরে পড়ে। সেই অবস্থাতেই ও কারখানা-ঘরের দরজা ঠেকে ভেতরে ঢুকে যায়।

কেন যায়, কার কাছে যায়, কে জানে। তবে তখনকার মতন মেঘ কাটে। শুধু কারখানা-চত্বরের মধ্যে স্থায়ী একটা গুমোট ভাব থেকেই যায়। ঝড়ের আগে যেমন গুমোট হয়ে থাকে, ঠিক সেইরকম।

দুদিন আগেও পালাবার কথা ভেবেছি। কাল থেকে আর তাও ভাবতে পারছি না। মনে হয় ওরাও পারে না। পারলে পালাতো।

ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির এই ভাঙাচোরা বাড়িটাকে মনে হচ্ছে একটা বিরাট মাকড়শা। বিশ্বনাথ কাপালি মারা যাওয়ার পরেও, গত পঞ্চাশ বছর ধরে মাকড়শাটা গোরে বিবির রোডের একধারে, এই পোড়ো জমির মাঝখানে বসে, বিষাক্ত জাল বুনে যাচ্ছিল। তারপর সেই জালে জড়িয়ে টেনে এনেছে বিরাজ কাপালি, হাসিদি, পঙ্কজ, আর বিশাখাকে। ওই জার্মান মহিলাদের। এবং শেষমেষ আমাকেও—এই রুদ্রনাথ দত্তকে। এরপর সে কী করবে? আমাদের রক্ত শুষে খাবে?

শেষমেষ সেই দিনটা এল। শুক্রবার, এগারোই এপ্রিল। রাত বারোটা। কাপালি স্যার খবর পাঠিয়েছিলেন, ওই মহিলারা আসবেন। ঠিক বারোটার সময় কারখানার গেটের বাইরে একটা কালো স্টেশন-ওয়াগন এসে দাঁড়াল। ওদের নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা আর দাঁড়াল না, দ্রুত উধাও হয়ে গেল।

কারখানা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, কালো গাউন, কালো লেসের ভেল দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে চারটে মেয়ে বাগানের রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। ওদের মধ্যে সামনের মেয়ে দুটি একটা হুইল-চেয়ার ঠেলে নিয়ে আসছে। চেয়ারটায় বসে আছেন বিরাজ কাপালি। আমি পঙ্কজদা আর হাসিদি ওদের অনুসরণ করে কারখানা ঘরে ঢুকলাম। আজ সন্ধে থেকেই ফার্নেসের আগুন দ্বিগুণ তেজে জ্বলছে। এখন শুনলাম, মেঝের নীচের রক্তের চৌবাচ্চার ভেতর থেকে জোরালো একটা ঘাই মারার শব্দ।

চারটে মেয়েই ঝটকা মেরে যে যার মুখের ভেল সরিয়ে দিল। দেখলাম ওদের নীল চোখের মণি প্রাইমাস স্টোভের শিখার মতন উজ্জ্বল। ওদের ঠোঁট রক্তরাঙা আর উদ্ধত চিবুকে একইসঙ্গে আগুনের কমলা আলো আর ইহুদি-ক্রুকারির সবুজ ফসফোরেসেন্সের আলো দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে কাপালি স্যারের হুইল চেয়ারটাকে খুব সাবধানে দাঁড় করিয়ে রেখে এমা, হানা, সোফিয়া, লীনারা একটু সরে দাঁড়াল। এতক্ষণে কাপালি স্যারকে ভালো করে দেখতে পেলাম। উনিও আজ একটা লম্বা ঝুলের কালো পাঞ্জাবি পরে এসেছেন। কোলের ওপরে পাতা রয়েছে একটা গাঢ় লাল চাদর। সেটা পায়ের পাতাদুটোকে ঢাকা দিয়ে মাটি অবধি লুটিয়ে পড়েছে। তফাতের মধ্যে আজ ওঁর গলায় একটা মোটা সোনার চেন—যেটা হয়তো সোফিয়াদের উপহার। সব মিলিয়ে সেদিন সার্পেন্টাইন লেনের বাড়িতে বিরাজ কাপালির চেহারা আর কথাবার্তার মধ্যে যে ক্লিষ্ট ভাব লক্ষ্য করেছিলাম, আজ তার কোনো চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। মানুষটিকে একটা পালিশ করা পেতলের মূর্তির মতন ঝকমকে লাগছিল।

দেখলাম, উনি সেই কাঠের বাক্সটা নিয়ে এসেছেন। দু-হাতে আলতো করে ওটাকে কোলের ওপরে ধরে রেখেছেন।

হঠাৎই কাপালি স্যার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন হাসিদি আর পঙ্কজদা ওঁর ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উনি খুব রূঢ় গলায় বললেন, গেট আউট। বেরিয়ে যাও এখান থেকে। না ডাকলে ঢুকবে না।

ওরা দুজন মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল।

আমিও ওদের পেছন-পেছন বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। কাপালি স্যার খুব অবাক হয়ে বললেন, একি রুদ্রনাথ। তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি তো আজকের যজ্ঞের ঋত্বিক। এসো, আমার পাশে এই বেঞ্চটায় বসো। ন্যুড মেয়েদের দেখতে ভালো লাগে না তোমার? দ্যাখো, এই জার্মান ছুঁড়িগুলোর জিনিসপত্র অসাধারণ।

এমা, লীনা, সোফিয়ারা ইতোমধ্যে কাপালি স্যারের কাছ থেকে সেই বাক্সটা নিয়ে ভেতরের জিনিসগুলোকে ফার্নেসের সামনে মেঝের ওপরে সাজিয়ে ফেলেছিল। সেই ঘট, সেই ছুরি আর আসন। তাছাড়াও আরো অনেক কিছুই ছিল ওদের সঙ্গে। তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে চোখ টানছিল, সেটা হল একটা তারের বাজনা। মেলায় যেরকম মাটির বেহালা কিনতে পাওয়া যায়, তারই একটা বড় সংস্করণ। সেটার তারে কয়েকবার টান দিল সোফিয়া বলে মেয়েটা। কান্নার মতন একটা আওয়াজ উঠল।

একটা কাচের বোতল থেকে ঘন সবুজ একটা আরক ওরা গলায় ঢেলে নিল। তারপর মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে যে যার গাউন খুলে ফেলল। গাউনের নীচে কোনো অন্তর্বাস ছিল না। কাপালি স্যারের শ্বাস টানার শব্দ পেলাম।

নারীশরীর সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তবু ওদের সরল তলপেট আর স্তনের গড়ন দেখে মনে হল ওরা কেউই আগে কখনো সন্তান ধারণ করেনি।

ওরা চারজনেই সুন্দরী। অসম্ভব সুন্দরী। ওদের অলিভ তেলের মতন সোনালি ত্বকে আগুনের আভা খেলা করে বেড়াচ্ছিল। আবছা অন্ধকারের মধ্যেও ভুট্টার কেশরের মতন ঝলমল করছিল ওদের যোনিকেশ। তবু আমার মনে কাম জাগছিল না। উল্টে প্রচণ্ড ঘৃণা হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এরা সুযোগ পেলে একজন কালো মানুষকে নীলনদীর জলে কুমিরের মুখে ফেলে দিয়ে মজা দেখতে পারে।

অবশ্য, খুব বেশিক্ষণ এসব ভাবতে পারলাম না। কারণ, এরমধ্যে ওরা চারজন নাচতে শুরু করেছিল। ওদের মধ্যে তিনজন মেঝেয় সাজিয়ে রাখা উপকরণগুলোকে ঘিরে গোল হয়ে ধীর লয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছিল।

আর চতুর্থজন সেই বেহালার মতন যন্ত্রটায় সুর তুলছিল।

আস্তে আস্তে ওদের নাচের গতি বাড়তে শুরু করল। একটা সময় এলো, যখন ওদের আর আলাদা করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল তিনটে দীঘল ইউক্যালিপটাস ঝড়ের মুখে দোল খাচ্ছে। ঠিক তখনই ফার্নেসের দরজাটা নিজে থেকেই খুলে গেল। কী এক অদ্ভুতভাষায় রিনরিনে গলায় ওরা জয়ধ্বনি করে উঠল। কিন্তু ওদের নাচ থামল না। শুধু যে-মেয়েটি এতক্ষণ বেহালার মতন যন্ত্রটা বাজাচ্ছিল, সে বাজনাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে তাক থেকে একপাঁজা চিনেমাটির প্লেট তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল ফার্নেসের ভেতরে। কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দকে ছাপিয়ে আগুনের শিখার ভেতর থেকে তৃপ্তির নিশ্বাসের মতন একটা শব্দ ভেসে এল।

আরো কিছুটা সময় চলে গেল। একবার স্কাই-লাইটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আকাশে কাগডিমে রঙ লেগেছে আর...আর একটা মাত্র বিশাল তারা সেই স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে এই কারখানা ঘরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। শুকতারাই, কিন্তু আমার হাতের মুঠির মতন বড়।

ঠিক তখনই লেলিহান আগুনের শিখার আড়ালে একটা গ্র্যানাইট রঙের মূর্তির আদল ফুটে উঠল। দু-হাত দিয়ে আগুনের পর্দা সরিয়ে ফার্নেসের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল বৃষমানুষ!

ওরা আবার জয়ধ্বনি করে উঠল এবং এবার নাচের পরিবর্তে যেটা শুরু করল সেটাকে এককথায় বলা যায় কামুক অঙ্গভঙ্গি। ফার্নেসের সামনের মেঝেয় শুয়ে বসে ওরা নানানভাবে নিজেদের স্তন উরু এবং যোনিকে মেলে ধরছিল সেই বৃষপুরুষের সামনে।

কিছুক্ষণ আগে অবধি ওরা একটা গান গাইছিল। ভারি দোলা লাগানো একটা সুর। হঠাৎ সেই গানের পর্দাও উচ্চগ্রাম থেকে অশ্লীল এক ফিসফিসানিতে নেমে এল। ভাষা না বুঝলেও, ওদের অঙ্গভঙ্গির কারণে সেই গানের অর্থ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না!—এসো। আমাকে তোমার প্রবল শিশ্ন দিয়ে বিদ্ধ করো। দেববীর্য উৎক্ষিপ্ত হোক আমার জরায়ুমুখে।

অনেক দূর থেকে মেঘের ডাক ভেসে এলে যেমন শোনায়, ফার্নেসের গভীর কোনো তলদেশ থেকে ঠিক সেইরকম একটা গর্জন ভেসে এল। চার নাৎসি তনয়ার মুখে ফুটে উঠল পরিষ্কার হতাশা। ওরা একসঙ্গেই ফিরে তাকাল কাপালি স্যারের মুখের দিকে। ওদের মধ্যে একজন ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বলল, হি ইজ এগেইন আস্কিং ফর হিজ সন।

কাপালি স্যার জোর গলায় উত্তর দিলেন, ইয়েস, ইট হ্যাজ বিন অলরেডি অ্যারেঞ্জড।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, রুদ্রনাথ! জুতোটা খোলো। তারপর ফার্নেসের দিকে হেঁটে যাও।

আমি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি। তোমাকে বলেছিলাম না, আজ বলব কেন তোমাকে পুরুলিয়া থেকে এখানে নিয়ে এসেছি। তুমি ওই শয়তানের বাচ্চা। তোমাকে আমি অর্ধেক সত্য বলেছিলাম। দু-বছর আগে নয়, আমি এখানে প্রথম এসেছিলাম আজ থেকে বাইশ বছর আগে। আমার সঙ্গে একটা মেয়েকে নিয়ে এসেছিলাম, আমাদের পাড়ারই গরিব ঘরের মেয়ে। অসামান্য সুন্দরী এবং ভার্জিন।

অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে ওকে রাজি করিয়েছিলাম। তবে ও সবটা জানত না। আসলে আমি দেখতে চেয়েছিলাম, ইভা স্টাইনবেক যেটা করতে পেরেছিলেন, সেটা তখনো সম্ভব কিনা। সম্ভব হয়েছিল। তুমি জন্ম নিয়েছিলে। কিন্তু তারপরেই মেয়েটি মারা গেল। মনে হয় সেটাই নিয়ম। শয়তানের বাচ্চার জন্ম দেওয়ার পরে মায়েরা বেশিদিন বাঁচে না। বড়জোর একবছর, যতদিন বাচ্চা দুগ্ধপোষ্য থাকে। তারপর সে মারা যায়।

আমি, হ্যাঁ, আমিই তোমাকে শর্বরী মোড়ের অনাথ আশ্রমে রেখে এসেছিলাম। জানতাম, একদিন না একদিন তোমাকে কাজে লাগবে।

আমার কাছে কাপালি স্যারের কথাগুলো একটুও নতুন ঠেকছিল না। মাথার ভেতরে সেই গুটিপোকাটা গত তিনদিন ধরে এইসবই আমার কানে ফিসফিস করে বলে গেছে। তাই বরফ গলায় বললাম, আমাকে আবার এর মধ্যে টানছেন কেন? আপনি নিজেই তো যেতে পারেন।

মানে! উনি চমকে উঠলেন।

মানে হচ্ছে—

বলতে বলতে একঝটকায় বিরাজ কাপালির কোলের ওপর থেকে লাল চাদরটা টেনে ফার্নেসের দিকে ছুড়ে দিলাম। হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতেই সেটা আগুনের তাপে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। তার মধ্যে আমি লাথি মেরে ওঁর দু-পায়ের দুটো জুতো খুলে ফেলে দিয়েছি। জ্বলন্ত চাদরটা তখনো হাওয়ায় ভাসছিল। সেই আলোয় আমরা সকলেই দেখতে পেলাম কাপালি স্যারের দুই পায়ের কোনোটাতেই আঙুল নেই। পায়ের পাতাও না। তার জায়গায় রয়েছে অবিকল ষাঁড়ের খুরের মতন দুটো চ্যাটালো খুর।

চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, অনেক কিছুই বলেননি আমাকে। লুকিয়ে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যপার হল, ইভা স্টাইনবেকের গর্ভে ওই বৃষদেবতার ঔরসে আপনারই জন্ম হয়েছিল। আপনিই ইভার সেই হারানো ছেলে, যার সম্বন্ধে আপনি নিজেই সেদিন বলেছিলেন, 'হয়তো মারা গেছে'। আসলে ইভা স্টাইনবেক মারা যাওয়ার পরে সোমেশ্বর কাপালি আপনাকে বুকে আঁকড়ে ধরে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সার্পেন্টাইন লেনের বাড়িতে পৌঁছেছিলেন। তারপর নিজের পুত্রবধূর হাতে আপনাকে তুলে দিয়েই মারা যান। আপনি যাদের বাবা-মা বলছেন, তারা কেউ আপনার জন্মদাতা নন, পালক বাবা-মা।

কথা বলতে-বলতেই আমি আমার নিজের পায়ের জুতোদুটোও খুলে একপাশে ছুড়ে ফেলে দিলাম। মুহূর্তে যে দৃশ্য বেরিয়ে এল, সে আমি জানি। দেখলেই মনে হয়, পাগল হয়ে যাব। তবু আজ অনেকদিন বাদে ফের দেখতে হল।

আসলে, সেই যে আঙুলগুলো কুষ্ঠ হয়ে খসে গেছিল, তারপর থেকে আমার চামড়ার জুতোর আড়ালে ক্রমশ পায়ের পাতাদুটোও বদলে গেল। রক্তমাংসের পাতাই রইল না পায়ে। তার বদলে গজিয়ে উঠেছিল হাড়সর্বস্ব দুটো খুর। ঠিক ওই কাপালি স্যারের মতন। আমরা দুজনেই তো আসলে শয়তানের বাচ্চা।

কাউকে বলিনি এতদিন, কাউকে দ্যাখাইনি। তবু এই খুরদুটো এখন আমাকে দেখতেই হবে। দেখাতে হবে ওদের—ওই নিও-নাৎসি মেয়েগুলোকে।

হ্যাঁ, ওরা দেখছে। আমি নিশ্চিন্তে খুরওলা পা দুটো ওয়ার্কিং বেঞ্চের ওপরে তুলে আরাম করে বসি। ওরা চারজনেই ছেড়ে ফেলা গাউনগুলো তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। এবার এগিয়ে আসছে।

হঠাৎই ওদের মধ্যে একজন, সোফিয়াই বোধহয় ওর নাম, কথথেকে একটা রিভলভার বার করে কাপালি স্যারের কপালে সাঁটিয়ে ভাঙা ইংরেজিতে চেঁচিয়ে উঠল—ইউ স্কাউন্ড্রেল! ইউ নেভার টোল্ড আস অ্যাবাউট দিস কার্স।

আমি হাসলাম। আমি জানতাম কাপালি স্যার এই খুঁতো পায়ের কথা ওদের বলবেন না। বললে ওরা তো এত পয়সা ঢালতে রাজিই হত না। তাই এখন ওঁর মুখটা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

এবার মেয়েগুলো আমার পায়ের দিকে তাকাল। বলল, অ্যান্ড হি ইজ অলসো আ কার্সড ওয়ান।

আমি বললাম, ইয়েস ডার্লিং, এভরি চাইল্ড ইউ বিগেট হিয়ার উইল আলটিমেটলি আর্ন টু হুভস, ফ্রি অফ কস্ট। এখান থেকে যে বাচ্চাই পেটে ধরো, শেষ অবধি সে পায়ে দুটো খুর পাবেই পাবে, একেবারে বিনিপয়সায়। বাট ডোন্ট ইউ থিঙ্ক দে উড মেক আ ফাইন নিও-নাৎসি রেজিমেন্ট?

সত্যি, দৃশ্যটা কল্পনা করে আমার নিজেরই বেদম হাসি পাচ্ছিল। সারি সারি যুবক অটোমেটিক মেশিনগান এবং আরো নানান ভয়ানক অস্ত্র নিয়ে রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আছে। তারা প্রত্যেকেই আমার আর কাপালি স্যারের মতনই শয়তানের সন্তান—এককথায় বেজন্মা। আমাদের মতনই রূপবান এবং বুদ্ধিমান—অভিজাত আর্য।

কম্যান্ডার হুকুম দিলেন, মার্চ। যুবকরা একবার ইউনিফর্মের বুকে আঁকা স্বস্তিকা চিহ্নে হাত বুলিয়ে নিল। তারপর পা ফেলল—লেফট রাইট লেফট! লেফট রাইট লেফট!

ব্যস! তারপরেই এলোমেলো কিছু খটখট আওয়াজ। পাথরের সঙ্গে জোড়া জোড়া খুরের সংঘাত। খিস্তি খেউড় হট্টগোল। একে-একে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়তে শুরু করল।

কারণ তারা আমার এবং বিরাজ কাপালির মতোই খোঁড়া।

নিজের কল্পনাতে নিজেই কিছুক্ষণের জন্যে ডুবে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কপালের ওপরে ঠান্ডা মেটালের চাপে সম্বিৎ ফিরল। সোফিয়া তার রিভলভারটা ঘুরিয়ে আমার কপালে চেপে ধরেছে। মেয়েটার চোখে খুনের ঝলক। ও দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, মিশন অ্যাবান্ডনড। ডেভিলকে আমরা আর কোনোদিনই ডাকবো না। আমরা চলে যাব। তবে তার আগে তোমাদের লাশ দুটো ওই বাইরের মাঠে ফেলে দিয়ে যাব। নাও মুভ!

আমি উঠে দাঁড়ালাম। এমা, হানা, লীনারা সেই কাঠের বাক্স আর শয়তান-পুজোর উপকরণগুলো টান মেরে ফার্নেসের ভেতরে ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে আগুনের আড়াল থেকে ভেসে এল সেই মন্দ্র মেঘগর্জন অথবা খ্যাপা ষাঁড়ের ডাক। তিনি চাইছেন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হোক। আমাদের ধুলোমাটির পৃথিবীতে পা রাখতে চাইছেন। কিন্তু চার জার্মান যুবতী সেই গর্জনের তোয়াক্কা করল না।

তবে ওরা তোয়াক্কা না করলেও অন্য কেউ করল।

আচমকা কারখানা ঘরের পেছনের দরজাটা খুলে গেল। একটা বিদ্যুৎ রেখা! শব্দহীন ছায়াশরীর নিয়ে ফার্নেসের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে একটা নেকড়ে বাঘ। তার শরীর নিমেষে জ্বলে উঠল। নেকড়েটা একটাও শব্দ করল না। জ্বলতে জ্বলতে ফার্নেসের মুখে শুয়ে পড়ল। মাংস পোড়ার গন্ধ উঠল।

নেকড়ে-পোড়া ছাইয়ের ওপরে একটা পা পড়ল। আমার মতোই খুরওলা পা। যার পা, তার বাকি শরীর তখনো আগুনের আড়ালে।

প্রায় নেকড়ের মতনই বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে আগুনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল হাসিদি। আবারও তৈরি হল একটা ছাইয়ের স্তূপ! বাতাসে ভেসে এল কিছুটা পোড়া মাংসের গন্ধ।

ভয়ংকর দেবতার দ্বিতীয় পা-টা এসে পড়ল হাসিদির ভস্মাবশেষের ওপরে। এখন তার বিশাল শরীরের অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। পেশল দুই পা, রোমশ তলপেট আর সরু কোমর।

ওই জার্মান মেয়েগুলোর মধ্যে কে একটা গোঙানির গলায় বলে উঠল, হায় ভগবান! ও যে বেরিয়ে আসছে।

আমি আর বিরাজ কাপালি তো বটেই, মেয়েরা সকলেই তখন তাকিয়ে রয়েছে খোলা দরজাটার দিকে। আর কি কেউ রয়েছে ওর ছাইয়ের সিঁড়ি সম্পূর্ণ করার জন্যে?

এইসময় ওদের সম্বিৎ ফিরে এল। চারটে মেয়েই একসঙ্গে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে উঠোনের দরজাটা বন্ধ করে, ভেতর থেকে খিল তুলে দিল। তারপরে দুজনে এসে ধরল কাপালি স্যারের হুইল চেয়ারের দুটো হাতল। ঠেলে নিয়ে যেতে শুরু করল সামনের দরজার দিকে। সোফিয়া আমার পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, মুভ মুভ মুভ। ডোন্ট স্টপ! থামলেই গুলি করব।

হোঁচট খেতে খেতে দরজার দিকে এগোচ্ছি। ওরা জিতে যাবে? একবার শুধু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে গ্রানাইটের খোদাই করা মূর্তির মতন দুটো পা স্থির হয়ে রয়েছে। কোমরের ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে আর একটা সিঁড়ি পেলেই সে বাইরে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু ওকে আনবে কে?

## দশ

একটা কর্কশ আওয়াজে কানে তালা ধরে গেল। প্রথমে কেউ বুঝতে পারিনি শব্দটা কোথা থেকে এল। সবাই হতবুদ্ধির মতন তাকাচ্ছি। তারপরে একসঙ্গেই সবাই বুঝলাম।

মেঝের ওপরে বসানো ম্যানহোলের ঢাকনাটা বিশাল এক বিস্ফোরণে ছাদের দিকে উড়ে গেল। রক্তের চৌবাচ্চা থেকে প্রথমে উঠে এল একটা মাথা। একঢাল কালো চুলে ভরা একটা নিটোল মুণ্ডু! তারপর শুভ্র সুন্দর দুটো কাঁধ...বাহু...নগ্ন পিঠ। সাটিন-মসৃণ ত্বকের ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছিল পশুরক্তের ধারা।

পরক্ষণে চৌবাচ্চার কিনারায় তার নগ্ন-শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল বিশাখা। একবার পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল আমার মুখের দিকে।

না না—এ তো বিশাখা নয়। আমার মা! আমার মৃতা মা।

এই মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখী এই পৃথিবীতে আর কে আছে? আমার ডানদিকে আমার জনক—ডেভিল। আমার বাঁ-দিকে আমার মা। তার বুকে ওই যে পরিপূর্ণ তিনটি স্তন! ওই মাঝের স্তনটির দুধ পান করে আমি জীবনের প্রথম একটা বছর বেঁচে ছিলাম, যতদিন না বিরাজ কাপালি আমাকে পুরুলিয়ার অরফ্যানেজে রেখে দিয়ে এসেছিলেন।

দু-এক মুহূর্তমাত্র। অথচ আমার মনে হচ্ছিল, কত যুগ ধরে যেন মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তারপর খুব নিশ্চিত-ভঙ্গিতে আমার মা আগুনের ভেতরে ঢুকে গেল। বাইশ বছর আগে যে মৃতদেহের সৎকার হয়নি, বাইশ বছরে যে-মৃতদেহের বয়স বাড়েনি, আজ, এইমুহূর্তে তার দাহকার্য সম্পন্ন হল।

তারপর যে ঠিক কী হল, বুঝিয়ে বলতে পারব না। চেতন-অচেতনের মাঝামাঝি এক অবস্থায় আমি দেখলাম ফার্নেস থেকে এক কালো আগুনের শিখার মতন বেরিয়ে এল সেই বৃষমানুষ। মুহূর্তে একহাজার চিনেমাটির প্লেট ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল মেঝের ওপরে। স্প্রিন্টারের মতন ছুটে যাওয়া অসংখ্য কাচের টুকরোর আঘাতে যুবতী-শরীরগুলি মুহূর্তের মধ্যে রক্তের আঁকিবুঁকি রেখায় ভরে গেল।

ওরা কি তখন আর্তনাদ করছিল? জানি না। জানা সম্ভব নয়। কারণ, পশুমানুষের ক্রুদ্ধ নিশ্বাস সেই মুহূর্তে ব্যাভেরিয়া পোর্সেলিন ইন্ডাস্ট্রির অত বড় ঘরটাকে ঝাঁকিয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। সেই শব্দকে ছাপিয়ে আর কিচ্ছু শোনা যাচ্ছিল না।

শুধু সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম! অবর্ণনীয়! বীভৎস!

দেখতে পাচ্ছিলাম, সোফিয়ার পিঠ দিয়ে ঢুকে বুক দিয়ে বেরিয়ে গেছে বৃষমানুষের একটা শিং। তার ডানহাতে তখনো রিভলভারটা ধরা। অবিশ্বাসী চোখে তখনো বিস্ময়। তাঁর মরতে তখনো কয়েক সেকেন্ড দেরি।

পরমুহূর্তেই ওর সঙ্গীর ঘাড়-মটকানো শরীরটা দেয়ালে আছড়ে পড়ল। বাকি দুজনকে যখন সে ধারালো খুরের নীচে থেঁতলে দিচ্ছিল, তখন আমি আর তাকিয়ে থাকতে পারিনি, আতঙ্কে চোখ বুজে ফেলেছিলাম।

একটু বাদে যখন চোখ খুললাম, তখন স্কাইলাইট দিয়ে ঘরের ভেতরে আলো এসে পড়েছে। আমাদের জনক, বৃষমানুষ, ফিরে গেছেন ফার্নেসের ভিতরে। সেখানে ধিকধিক করে অল্প একটু আগুন জ্বলছে যার বেশিরভাগটাই জ্বলছে হাসিদি, পঙ্কজদা আর আর আমার মায়ের অবশিষ্ট রক্তমাংসের ইন্ধনে। জার্মান মেয়েগুলোর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ এখানে-ওখানে নিথর পড়ে আছে। কাচ কারখানার ঘরটাকে দেখে মনে হচ্ছিল, বন্ধ ঘরটার মধ্যে একটা বিরাট বোমা ফেটেছিল।

বিরাজ কাপালি আমার পাশেই তাঁর হুইল-চেয়ারে নেতিয়ে পড়ে ছিলেন। আমাকে চোখ খুলতে দেখে ক্ষীণ গলায় বললেন, আমরা কি এই যাত্রায় বেঁচে গেলাম, রুদ্র?

আমার মাথার ভেতরের পোকাটা আমাকে যা বলেছিল, আমি ওঁকে তাই বললাম। বললাম, তিনি আমাদের ফিরে পেতেই চেয়েছিলেন। বাঁচা-মরা জানি না। ওঁর সঙ্গে আমাদের চলে যেতে হবে। ওই দেখুন, তিনি আমাদের টানছেন। নানা, হুইল-চেয়ারের হাতল চেপে ধরে কোনও লাভ নেই। আমাদের যেতেই হবে।

ভ্যাক্যুম-ক্লিনার যেভাবে ধুলোবালিকে টানে, ফার্নেসের ভেতর থেকে সেইভাবে এক প্রবল শূন্যতা আমাদের ধরে টান দিল। সেই টানে আমরা দুজন চারাগাছের মতন উপড়ে গেলাম।

তারপর থেকেই আমার চারিদিকে স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য, জন্ম মৃত্যু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ছুটে চলেছি মহাশূন্যের অনন্ত অন্ধকারে।



# পতঙ্গ সঙ্গম

## এক

নভেম্বর-মাসের সতেরো-তারিখ ছিল রবিবার। ওইদিন ভোররাতের দিকে দুর্গাপুরের 'সিমবায়োটিক ইনটারন্যাশনাল'-এর একটা ঘরে বৈজ্ঞানিক প্রদীপ কামাথ আত্মহত্যা করেন। কোক-আভেন থানার সাব-ইনস্পেক্টর বিপ্রদাস মণ্ডল খবরটা পায় বেলা দশটা নাগাদ, কারণ সেদিন সে ছুটির মুডে বাড়িতেই ছিল। ওদের বাড়িটা দুর্গাপুরের গোপালমাঠ অঞ্চলে।

বিপ্রদাস তখন খাটের ওপর বালিশে হেলান দিয়ে বসে, সাদা-তরকারি দিয়ে লুচি খাচ্ছিল। বালিশের পাহাড় বেয়ে তার ঘাড়ে মাথায় উঠে খেলা করছিল চারবছরের দস্যি ভাইঝি টুনাই। এমন আদর্শ ছুটির সকালটা মুহূর্তের মধ্যে ভণ্ডুল হয়ে গেল থানার ওসি সুধীর মাইতির একটা ফোনে। সুইসাইডের ঘটনাটা জানিয়ে মাইতিসাহেব বললেন, 'দুজন কনস্টেবলকে দিয়ে জিপ পাঠিয়ে দিয়েছি। পনেরো-মিনিটের মধ্যে ওই ইনস্টিটিউটে চলে যাও। ইট ইজ আর্জেন্ট।'

বিপ্রদাস একটু সন্দেহের সুরে জিগ্যেস করল, 'সুইসাইড যে, সেটা ঠিক তো স্যার? নাকি?'

'একদম কনফার্মড সুইসাইড। ইনসটিটিউটের ডিরেক্টর নিজেই ফোন করেছিলেন। বললেন, লোকটা ভেতর থেকে ঘরের দরজা আটকে বিষ খেয়েছে। তার ওপরে সি. সি. টিভির ফুটেজও রয়েছে। জলের মতন সহজ কেস। মর্গে চালান দেওয়া ছাড়া তোমার আর কোনো কাজ নেই। তবে আবারও বলছি, দেরি কোরো না। বড্ড চাপ আছে।'

বিপ্রদাস জিগ্যেস করল, 'চাপ কেন স্যার? লোকটা কি ভি.আই.পি.?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। সায়েন্টিস্ট হিসেবে নাকি ওয়ার্ল-ফেমাস। অনেক অ্যাওয়ার্ড-ট্যাওয়ার্ড পেয়েছে। তাছাড়া ''সিমবায়োটিক'' হচ্ছে আমেরিকান কোম্পানি। সেইজন্যেই চারদিক থেকে ক্রমাগত কোয়ারি আসছে—কী হল? কেমন করে হল?'

একটু দম নিয়ে মাইতিসাহেব বললেন, 'শোনো মণ্ডল, হাসপাতালের সুপার-কে একটু বলে দেখো, যাতে ইনকোয়েস্টটা দুপুরের মধ্যে সেরে দেওয়া যায়। তাহলে দমদম থেকে বডিটাকে রাতের ফ্লাইট ধরিয়ে দিতে পারব।'

'বডি কোথায় যাবে স্যার?'

'পুণে। ওখানেই মিস্টার কামাথের ফ্যামিলি থাকে। ওঁর এক ভাই অলরেডি বডি নিয়ে যাওয়ার জন্যে রওনা হয়ে গেছেন।'

মোবাইলটা নামিয়ে রেখে বিপ্রদাস শেষ দুটো লুচি একসঙ্গে মুখে পুরে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল। বিপ্রদাসের বউদি মৌসুমী প্রায় ওর সমবয়সি। সে একটা থালায় আরো কয়েকটা লুচি নিয়ে ঘরে ঢুকছিল। বিপ্রদাস হাত নেড়ে জানাল আর লাগবে না। তারপর বেসিনের দিকে হাত ধুতে দৌড়ল।

মৌসুমী অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'ব্যাপার কী? বেরোতে হবে?'

মুখভর্তি লুচি নিয়ে বিপ্রদাস কথা বলতে পারছিল না। ইশারায় জানাল, 'হ্যাঁ।'

মৌসুমী মুখ কালো করে বলল, 'খুরে দণ্ডবৎ বাবা এমন চাকরির। রোববারেও একটু শান্তি নেই গো? দুপুরে বাড়িতে খেতে আসা হবে, না কি?'

'খাব, খাব। আমার ফিরতে দু-তিনঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না।' বলতে-বলতেই বিপ্রদাস আলনা থেকে ধরাচুড়ো টেনে নিয়ে বাথরুমের দিকে পা চালাল এবং ঠিক পনেরো মিনিটের মাথাতেই জিপে চেপে রওনা হয়ে গেল দুর্গাপুর এক্সপ্রেস-ওয়ের দিকে। বছর তিনেক হল ওই রাস্তার ধারে চার-একরের ওপর জায়গা নিয়ে তৈরি হয়েছে সিমবায়োটিক ইন্টারন্যাশনালের রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

আগে কখনো এই ইনস্টিটিউটের ভেতরে পা রাখেনি বিপ্রদাস। গেট আগলে দাঁড়িয়ে-থাকা প্রাইভেট সিকিউরিটি-এজেন্সির লোকেরা পুলিশের গাড়ি দেখে স্যালুট দিয়ে সরে দাঁড়াল। তারাই বুঝিয়ে দিল,

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ- বিল্ডিংয়ের দিকে কীভাবে যেতে হবে।

সিকিউরিটির লোকেরাই নিশ্চয়ই ইন্টারকমে পুলিশ আসার কথা জানিয়ে দিয়েছিল। গাড়িটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর পোর্টিকোর নীচে দাঁড়াতেই দুজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। পরিচয় হওয়ার পরে বিপ্রদাস জানতে পারল, ওঁদের মধ্যে একজন এই ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর শুভময় চ্যাটার্জি। অন্যজন সিকিউরিটি অফিসার বলরাম রায়।

মিস্টার চ্যাটার্জির বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে। নির্মেদ ছিপছিপে চেহারা, ছফুট লম্বা। তীক্ষ্ন নাক, পুরু চশমার পেছনে বড়-বড় চোখ আর ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো কাঁচা-পাকা চুলের জন্যে মনে হচ্ছিল, ডিরেক্টরের এই রোলটা প্লে করার জন্যেই তিনি মেক-আপ নিয়ে বেরিয়েছেন।

বলরাম রায় এক্স-সার্ভিসম্যান। মজবুত চেহারা, চ্যাপটা নাক, সাবধানি চোখ। গায়ের রং কুচকুচে কালো। বয়স আন্দাজ করা কঠিন, তবে চল্লিশের ওপরে তো বটেই।

নিজের পরিচয় দিয়ে বিপ্রদাস বলল, 'ইনসিডেন্ট-টা যেখানে হয়েছে আগে সেখানেই চলুন।'

'চলুন স্যার।' বলরাম রায় ওদের নিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে, ডানদিকের রাস্তাটা ধরে হাঁটা লাগালেন। শুভময় চ্যাটার্জিও সঙ্গে চললেন। থানার ড্রাইভার সুজিত একবার গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'গাড়িটা নিয়ে আসব স্যার?' বলরামবাবু হাত তুলে বললেন,'দরকার হবে না। জাস্ট পেছনের বিল্ডিংটাতেই যাচ্ছি।'

রাস্তা ধরে হাঁটতে-হাঁটতে বিপ্রদাস সামনের দিকে তাকাল। একটা বড় মাঠকে ঘিরে ছ'টা বাড়ি মৌচাকের কুঠুরির স্টাইলে সাজানো। তার মধ্যেই একটার দিকে ওদের ছোট্ট মিছিলটা মোড় নিয়েছে। কোথাও কোনো মানুষের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। বিপ্রদাস অনেকক্ষণ ধরে যে প্রশ্নটা করবে ভাবছিল, সেটা করেই ফেলল, 'লোকজন এত কম দেখছি কেন বলুন তো?'

উত্তরটা দিলেন মিস্টার চ্যাটার্জি। বললেন, 'এমনিতে আমাদের এখানে এতটাই স্পেস প্রোভাইড করা হয়েছে যে, কখনোই আপনার মনে হবে না ভিড়ের মধ্যে কাজ করছেন। সেকেন্ডলি, আমাদের জুনিয়র সায়েন্টিস্টস, রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টস এরকম প্রায় পঞ্চাশজন স্টাফ নানান ফিল্ড-ওয়ার্ক নিয়ে বাইরে ঘুরছেন। সেইজন্যেই জায়গাটা আরো ফাঁকা লাগছে।'

'আই সি।'

ওরা প্রথম-বাড়িটার স্যুইং-ডোর ঠেলে ভেতরের লাউঞ্জে পা দিল। মোট চারজন সিকিউরিটি গার্ড ডেস্কে বসে ডিউটি করছিলেন—দুজন মহিলা, দুজন পুরুষ। ওদের দেখে চারজনেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বলরামবাবু হাতের ইশারায় তাদের মধ্যে একজনকে ডেকে নিয়ে বাকিদের নিজের ডিউটি করে যেতে বললেন। যাকে ডেকে নিলেন সেই ছেলেটি একটা চাবির গোছা হাতে নিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। তারপর সবাই মিলে এগিয়ে চলল করিডরের শেষে লিফটের দিকে।

বাড়িটার ভেতরে পা দিতেই একটা চেনা গন্ধ বিপ্রদাসের নাকে এসে লেগেছিল। স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়াশোনা করার সেই দিনগুলো থেকেই আরো অনেকের মতন বিপ্রদাসের স্মৃতিতেও এই গন্ধটা জড়িয়ে গেছে। অনেকগুলো আলাদা আলাদা গন্ধের যোগফল এই বিশেষ গন্ধটা। ক্লোরিন, বেঞ্জিন, হাইড্রোজেন সালফাইড, বুনসেন-বার্নারের গ্যাস, ফর্মালিন সব মিলিয়ে এই গন্ধটা পৃথিবীর যে-কোনো ল্যাবরেটরির গন্ধ। দেয়ালের বোর্ডগুলোর দিকে তাকিয়ে বিপ্রদাস নিশ্চিন্ত হল, সে ভুল করেনি। প্রাণী ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের নানান শাখাপ্রশাখার নাম লেখা ছিল বোর্ডগুলোর গায়ে। তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানোও ছিল কোন দিকে কোন বিদ্যার হাতেকলমে চর্চা হয়। অর্থাৎ, এই বাড়িটাই সিমবায়োটিকের মূল ল্যাবরেটরি।

করিডরের শেষে দুটো লিফট। প্রত্যেকটায় ষোলো জনের ক্যাপাসিটি। আপাতত একটা লিফটে উঠল মাত্র ছজন। দুজন কনস্টেবল, এই বিল্ডিংয়ের সিকিউরিটি গার্ড, বলরাম রায়, শুভময় চ্যাটার্জি আর বিপ্রদাস।

থার্ড ফ্লোরের যে ঘরটার সামনে গিয়ে ওরা দাঁড়াল সেই ঘরের দরজার মতন দরজা বিপ্রদাস এতদিন দেখেছে শুধু ব্যাঙ্কের লকার-রুমে। চওড়া স্টিলের পাল্লা, তার গায়ে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ের মতন একটা ব্যাপার। দরজার পাল্লায় চাবি ঢোকানোর পরে সিকিউরিটি গার্ড সেই স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে কম্বিনেশন লক খুলে দিল।

ঘরের ভেতর ঢুকে আরো অবাক হল বিপ্রদাস। প্রথাগত ল্যাবরেটরির সঙ্গে এই ঘরের যন্ত্রপাতির কোনো মিল নেই। চারিদিকে যে সব ইলেক্ট্রনিক সাজসরঞ্জাম সাজানো রয়েছে সেগুলো দেখলে ল্যাবরেটরির বদলে কোনো বড় হসপিটালের রেডিওলজি-রুমের কথাই মনে পড়ে। কম্পিউটার, ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ, সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি কয়েকটা মামুলি যন্ত্র চিনতে পারল বিপ্রদাস। বাকি সমস্তই তার অচেনা। একদিকে দেয়ালের গা ঘেঁষে একটা হসপিটাল-কট রাখা ছিল ডাক্তারদের চেম্বারে যেমন থাকে। সরু লোহার একটা খাট। ওপরে টান-টান করে সাদা চাদর বেছানো রয়েছে। খাটটাকে ঘিরে পর্দা ফেলে দেওয়ার বন্দোবস্তও রয়েছে ঠিক হাসপাতালের মতোই।

ঘরের জানলাগুলো ভেতরদিক থেকে এঁটে বন্ধ করা ছিল। এ.সি. মেশিন চলছিল বলে ঘরটা ঠান্ডা এবং মৃতদেহজনিত দুর্গন্ধ ছিল না। দিনের বেলা হলেও ঘরে জোরালো আলো। মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন, চব্বিশঘণ্টাই জ্বলে। এমনকী অন্য সব আলো ঘরের ভেতর থেকে সুইচ টিপে নিভিয়ে দিলেও, দরজার পাশের দেয়ালে যে চৌকোনা আলোটা, সেটা জ্বলতেই থাকবে। কারণটা বোঝা কঠিন নয়। প্রাকৃতিক আলো ঢুকবার উপায়ই তো নেই।

ওই ল্যাবরেটরি ঘরেই একদিকে একটা চেয়ারের ওপর বসে ছিলেন প্রদীপ কামাথ। তাঁর মাথাটা সামনের টেবিলের ওপর নামানো। মনে হতে পারত ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু আসলে ঘুমোচ্ছেন না। মারা গেছেন।

একটা চকোলেট কালারের কাচের শিশি কামাথের হাত থেকে মেঝের ওপর পড়ে কয়েক টুকরো হয়ে গিয়েছিল। ভেতরের লিকুইডটা যেখান-যেখান দিয়ে গড়িয়ে গেছে সেখানে-সেখানে মেঝের ভিনাইল ফ্লোরিং জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। কিছুটা লিকুইড কামাথের হাতের ওপরে পড়েছিল। সেই জায়গার মাংস পুড়ে হাড় বেরিয়ে গিয়েছে। ওই তরল আগুন যে প্রদীপ কামাথের শরীরের ভেতরের যন্ত্রপাতিগুলোর কী হাল করেছে সে কথা ভেবে বিপ্রদাস কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হুঁশ ফিরল পকেটের মোবাইল ফোনটার রিং টোনে।

কলটা রিসিভ করে সে বুঝল ফোন করেছেন ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার। মাইতি সাহেবের কাছ থেকে অর্ডার পেয়ে ওঁরা এখানে চলে এসেছেন। বলরাম রায় ওঁদের এই ঘরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন।

পরের এক ঘণ্টায় ফরেনসিকের লোকেরা নিখুঁত পেশাদারিত্বের সঙ্গে নানান অ্যাঙ্গেল থেকে মৃতদেহের ছবি তুললেন, ভাঙা বোতল আর লিকুইডের স্যাম্পেল কালেকশন করলেন। এমনকী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, ফাইল-কভার, গ্লাস, প্লেট, এইসবের সারফেস থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অবধি নিয়ে নিলেন।

কাজ শেষ করে সকলকে নিয়ে নীচে নেমে আসতেই বিপ্রদাস দেখল অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে। বিপ্রদাস মনে মনে স্বীকার করল, মাইতি সাহেবের ব্যবস্থাপনা নিয়ে জাস্ট কোনো কথা হবে না। ডেডবডিটাকে কফিন-ব্যাগে পুরে নিয়ে কনস্টেবল দুজন দুর্গাপুর মেন হাসপাতালের দিকে রওনা হয়ে গেল। ওরা গেল অ্যাম্বুলেন্সে। সুজিতের জিপগাড়িটা রয়ে গেল বিপ্রদাসের জন্যে।

সিকিউরিটি অফিসার বলরাম রায়, ডিরেক্টর শুভময় চ্যাটার্জি আর বিপ্রদাস পায়ে হেঁটেই আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ে ফিরে এল। বলরাম রায় আর বিপ্রদাসকে নিয়ে চ্যাটার্জিসাহেব নিজের চেম্বারেই বসলেন। বিপ্রদাস চট করে চারদিকটা একবার দেখে নিল। বাকি ক্যাম্পাসের সঙ্গে মানানসই বিশাল চেম্বার। ঝকঝকে স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, নানান শেডের মার্বেল, ভিনাইল আর টেন্টেড গ্লাসের এক নিখুঁত অর্কেস্ট্রা।

সিল্ক ফিনিশড দেওয়ালে ঝুলছে এম এফ হুসেনের ঘোড়া। দেখে তো অরিজিনালই মনে হল। বিপ্রদাস মনে-মনে বলল, কর্পোরেট সেক্টরের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা।

ইতিমধ্যে ওঁদের তিনজনের জন্যে অত্যন্ত দামি চা আর স্যান্ডউইচ এসে গিয়েছিল। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বিপ্রদাস প্রশ্ন করল, 'ডক্টর চ্যাটার্জি, মিস্টার কামাথ যে সুইসাইড করেছেন সেটা কখন বোঝা গেল?'

'যখন সুইসাইড করেছেন, সেই মুহূর্তেই। রাত চারটে সতেরোয়।'

'তার মানে? ওঁর সঙ্গে কেউ ছিলেন?'

এবার উত্তরটা দিলেন বলরাম রায়। তিনি বললেন, 'আমাদের নাইট-ডেস্কের লোকেরা সারা-রাত সি.সি. টিভি-র মনিটরে চোখ রেখে বসে থাকে। ওরা অ্যাকচুয়ালি মিস্টার কামাথকে সুইসাইড করতে দেখেছিল। অ্যান্ড ইনস্ট্যান্টলি দে রাশড টু দা স্পট। কিন্তু' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাতের পাতা দুটো ওলটালেন বলরাম রায়।

বিপ্রদাসের চোখের সামনে আরেকবার ভেসে উঠল পোড়া মেঝে আর মিস্টার কামাথের হাতের চেহারাটা। সত্যি। ওই অবস্থায় কারুরই আর কিছু করার থাকে না। বিপ্রদাস প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, যেটা উনি গলায় ঢেলেছেন, সেই জিনিসটা কী?'

মিস্টার চ্যাটার্জি উত্তর দিলেন, 'ডাই-মিথাইল সালফোক্সাইড। দুর্দান্ত সলভেন্ট, তাই যে-কোনো ল্যাবরেটরিতেই দু-এক শিশি পাবেন। প্রায় সবকিছুকেই মুহূর্তের মধ্যে গলিয়ে ফেলে। তার মধ্যে মানুষের চামড়া আর মাংসও আছে।'

রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছল বিপ্রদাস। তারপর বলল, 'সি.সি. টিভি-র ফুটেজটা একটু দেখা যাবে?'

বলরাম রায় বললেন, 'শিওর। এই ঘরেই তো একটা টার্মিনাল রয়েছে, ফর দা বেনিফিট অফ দা ডিরেক্টর। আসুন স্যার এই চেয়ারটায় বসুন।' তিনি ঘরের কোনায় একটা কম্পিউটারের সামনে বিপ্রদাসকে বসিয়ে মনিটর অন করলেন। কিছু অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে স্ক্রিনে ওই ল্যাবরেটরির ছবি ফুটে উঠল। ঘরটার চেহারা একটু আগে বিপ্রদাস যেমন দেখে এসেছে, সেইরকমই। শুধু প্রদীপ কামাথ বসে আছেন ঘরের অন্য কোনায় একটা রিক্লাইনিং-চেয়ারের ওপরে। অত্যন্ত এলিয়ে পড়া ভঙ্গি। হাবভাবের মধ্যে গবেষণার কোনো উদ্যোগই চোখে পড়ছে না।

বিপ্রদাস মনিটরের নীচের দিকে ডিজিটাল অক্ষরে ফুটে ওঠা সময় দেখে প্রশ্ন করল, 'রাত একটা?'

বলরামবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, গতকাল রাত একটার ছবি এটা। একটু ফাস্ট ফরোয়ার্ড করি স্যার? এই ধরুন আধ ঘণ্টা?'

'করুন।' মনিটরের দিকে ঝুঁকে উত্তর দিল বিপ্রদাস।

রাত দেড়টার ছবির সঙ্গে একটার ছবির কোনো তফাত ছিল না, যেমন তফাত ছিল না দেড়টার সঙ্গে সাড়ে তিনটের। দশ মিনিট পনেরো মিনিট আধঘণ্টা এগিয়ে পিছিয়ে অনেকগুলো ফ্রেম দেখল বিপ্রদাস। সবকটা ফ্রেমেই দেখা গেল ওই বৈজ্ঞানিক প্রদীপ কামাথ জড়ভরতের মতন রিক্লাইনিং-চেয়ারটার ওপর বসে আছেন। কখনো মাথাটা একটু পেছনে হেলিয়ে দিলেন, কখনো হাত দিয়ে কপালটা মুছে নিলেন, কিম্বা দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন—ব্যস, এইটুকুই।

সারা রাতের মধ্যে এর চেয়ে বেশি নড়াচড়া করলেন না ভদ্রলোক। প্রথমবার চেয়ার থেকে যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন ডিজিটাল-ক্লক সময় দেখাচ্ছে চারটে বেজে পাঁচ মিনিট। ওই সময়েই প্রদীপ কামাথ হঠাৎ মাথাটা তুলে সামনে তাকালেন, যেন দরজার বাইরে থেকে তাকে কেউ ডাকছে।

বিপ্রদাস ঘাড় ফিরিয়ে বলরাম রায়ের মুখের দিকে তাকাল। বলরাম রায় ফিসফিস করে বললেন, 'আপনি কী ভাবছেন বুঝতে পারছি স্যার। আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। বন্ধ দরজার ওপাশে কেউ এসে

দাঁড়িয়েছে। কিন্তু না। দরজার বাইরেও একটা সি.সি. টিভি আছে। তার করেসপন্ডিং ফুটেজ আমি চেক করেছি। এই দেখুন।'

মাউসের দুটো ক্লিকে ল্যাবরেটরির চৌখুপির পাশে আরেকটা চৌখুপি এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এটা দরজার বাইরের ভিডিও ক্লিপিং। ওই চারটে বেজে পাঁচ মিনিট থেকেই শুরু হয়েছে। না, ওখানে কেউ নেই। শূন্য করিডর।

বলরাম রায় আবার ল্যাবরেটরির ভেতরের দৃশ্যে 'জুম ইন' করলেন। প্রদীপ কামাথ উঠে দাঁড়িয়েছেন। চোখ বড় বড় করে কিছু শুনছেন। ওপরে নীচে ঘাড় নাড়ছেন। একবার বুকের কাছে হাতদুটো জোড় করে আবার নামিয়ে নিলেন। যে কেউ দেখলে ভাববে, ওঁর সামনে, ক্যামেরার লেন্সের আওতার বাইরে, আরেকজন কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে যার সঙ্গে ওঁর কথোপকথন চলছে। অথচ সি.সি. টিভি দেখাচ্ছে কেউ কোথাও নেই। উনি শুধু ছায়ার সঙ্গে কথা বলছেন। হাওয়ার সামনে হাতজোড় করছেন। অন্ধকারের আদেশ পালন করছেন।

ভোর চারটে বেজে পনেরো মিনিট। ছবিতে দেখা গেল প্রদীপ কামাথ পেছন ফিরে কোথায় যেন চলে গেলেন। বলরাম রায় বললেন, 'ওই কেমিকালটা আনতে গেলেন। অ্যান্টি-চেম্বারটা দেখলেন না, ওই জায়গাটা ক্যামেরায় ধরা পড়ে না।'

ঠিক দু-মিনিটের মধ্যে আবার চেয়ারে এসে বসলেন ডক্টর প্রদীপ কামাথ। এখন ওঁর হাতে সেই ডাই-মিথাইল-সালফোক্সাইডের বোতল। তারপর হঠাৎই উনি বোতলের ঢাকনা খুলে ঢকঢক করে মুখের মধ্যে চালান করে দিলেন এক-বোতল সলভেন্ট।

বিপ্রদাস তার পাঁচ বছরের পুলিশের চাকরিতে অনেক বীভৎস দৃশ্য দেখেছে। তবু তার মুখ দিয়েও একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

ডিরেক্টর শুভময় চ্যাটার্জি আর্তনাদ করলেন না, তবে দাঁতে দাঁত চিপে কোনোরকমে বললেন, 'ওহ, স্টপ ইট, স্টপ ইট, মিস্টার রয়। আই ক্যাননট বেয়ার দিস এনি মোর।' সত্যিই, শুভময় চ্যাটার্জিকে দেখে মনে হচ্ছিল উনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

বলরাম রায় কম্পিউটার শাট ডাউন করে বললেন, 'এই দৃশ্য দেখেই আমার লোকেরা ল্যাবরেটরিতে দৌড়ে যায়। দরজা ভেতর থেকে লক করা ছিল। কিন্তু সিকিউরিটির কাছে কোডনাম্বার ছিল। দরজা খুলতে অসুবিধে হয়নি। সি.সি. টিভির ফুটেজ দেখে বুঝতে পারছি, ইনসিডেন্টের পরে দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে ওদের ঠিক ছ'মিনিট সময় লেগেছিল। কিন্তু ততক্ষণে মিস্টার কামাথ মারা গেছেন। সেটা বুঝতে পেরেছিলাম বলেই আমরা কেউ আর ডেডবডিতে হাত ছোঁয়াইনি। আমাদের এখানে একজন রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান আছেন, ডাক্তার এ কে সামন্ত। উনি খবর পাওয়ার দশমিনিটের মধ্যেই স্পটে গিয়ে ভিকটিমকে এগজামিন করেন। তবে উনিই বা কী করবেন?'

বিপ্রদাস ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবছিল। একটু বাদে বলরাম রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা কথা জিগ্যেস করব মিস্টার রায়?'

বলরাম রায় বললেন, 'বলুন স্যার।'

'এই যে একজন বৈজ্ঞানিক আপনাদে ল্যাবরেটরিতে সারা রাত একা বসে ছিলেন, এর মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না? আপনার লোকেরা কেউ খোঁজ নিতে গেল না কেন?'

সিকিউরিটি অফিসার মুখ খুলবার আগেই শুভময় চ্যাটার্জি বললেন, 'উত্তরটা আমি দিই মিস্টার মণ্ডল? ইফ ইউ পারমিট।'

'শিওর।'

'দেখুন, মিস্টার কামাথ ছিলেন একজন সিনিয়র সায়েন্টিস্ট। হি ওয়জ আ জিনিয়াস। একজন জিনিয়াসের কাজের প্যাটার্ন ইনস্টিটিউটের ডিসিপ্লিনের সঙ্গে মিলবে এরকম কোনো কথা নেই। ইন ফ্যাক্ট গত প্রায়

একবছর ধরে মিস্টার কামাথকে আমরা দেখেছি, উনি রাত জেগে কাজ করতেই পছন্দ করতেন। কাজেই কাল রাতেও ওঁর ল্যাবরটরিতে থাকাটা কারুর কাছেই আনইউজুয়াল মনে হয়নি।

'আর চুপ করে বসে থাকার কথা বলছেন? আমাদের এই ক্যাম্পাসে চড়াইপাখির থেকে সায়েন্টিস্টের সংখ্যা বেশি। আমি দেখেছি, সায়েন্টিস্টরা সকলেই ওইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকতে পারেন। থাকেনও। কথা বলে জেনেছি, কাজের কাজগুলো ওঁরা ওইসময়েই করে ফেলেন—ব্রেন-স্টর্মিং-এর কাজ, মাথা তোলপাড় করে একটা রহস্যের উত্তর খুঁজে আনার কাজ, এলোমেলো চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে একটা প্যাটার্নে সাজিয়ে ফেলার কাজ।'

'বুঝলাম।' চায়ের কাপটা সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল বিপ্রদাস। বলল, 'আমি এখন চলি। পরশু আরেকবার আসব। অন্য কিছু নয়, মিস্টার কামাথের বায়োডেটা, উনি কী কাজে এখানে এসেছিলেন, এইসব একটু জানার প্রয়োজন হবে।'

'ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম।' শুভময় চ্যাটার্জি এবং বলরাম রায় দুজনেই পর পর বিপ্রদাসের সঙ্গে শেক হ্যান্ড করলেন। ডক্টর চ্যাটার্জি নিজের ভিজিটিং-কার্ড বার করে বিপ্রদাসের হাতে দিলেন। বিপ্রদাসও নিজের পার্সোনাল মোবাইলের নম্বর ওদের দুজনকে দিয়ে বলল, কোনো প্রয়োজন হলেই যেন ওর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

পোর্টিকোয় পৌঁছে যখন বিপ্রদাস গাড়ির দরজায় হাত রেখেছে তখন বলরাম রায় জিগ্যেস করলেন, 'আমরা কি কেসটাকে ক্লোজড বলে ধরব, স্যার?'

বিপ্রদাস বলল, 'আগে ফরেনসিক আর ইনকোয়েস্টের রিপোর্টগুলো পাই, তারপর বলব। ভালো কথা, কাইন্ডলি ওই সি.সি. টিভির ফুটেজের একটা কপি করিয়ে রাখবেন। আমি পরশুদিন এসে নিয়ে যাব।'

হাসপাতাল এবং থানা ঘুরে বিপ্রদাস যখন নিজের বাড়িতে ঢুকল তখন বাজে সাড়ে তিনটে। মৌসুমী বাইরের ঘরের সোফায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কলিংবেলের আওয়াজ পেয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলল। বিপ্রদাস অপরাধীর মতন মুখ করে বলল, 'না খেয়ে বসে আছ নাকি?'

উত্তর এল, 'যতদিন কাউকে বিয়ে করে ঘরে না নিয়ে আসছ ততদিন থাকতেই হবে। তাড়াতাড়ি চান সেরে এসো। নমিতাদির বাসন মাজতে আসার সময় হয়ে গেল।'

## দুই

দমদমের ইন্ডিয়ান-পটারি-ইন্ডাস্ট্রির কারখানার ঠিক পেছন থেকেই শুরু হয়েছে বিরাট লেবার-বস্তি। লেবার-বস্তির উত্তর সীমানায় পাঁক ভর্তি ড্রেনের ধারে একটা খোলার চালের ঘর। সেই এঁদো ঘরটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না তিতলি। আর ভুলতে পারে না একটা পোকার কথা।

তিতলির বাপুজি মারা গিয়েছিল যখন ওর ছ'বছর বয়স। বুকের রোগ হয়েছিল ওর বাবার। লেবার-বস্তির অনেকেই তখন ওই অসুখে মারা যেত। প্রশ্বাসের সঙ্গে সারাক্ষণ ফুসফুসে সিলিকনের গুঁড়ো টানলে সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

বস্তির একশোভাগ মরদের সঙ্গে নব্বইভাগ মেয়েও কাপ-ডিশ তৈরি করার ওই কারখানাটায় কাজ করত, কিন্তু তিতলির মা সে লাইনে ছিল না। ওর মা ছিল খুব সুন্দরী। সেইজন্যেই লেবারের কাজ করতে মায়ের ঘেন্না লাগত কিনা ঠিক জানে না তিতলি। কিম্বা এরকমও হতে পারে, বাবা তার সুন্দরী বউকে আগুনের আঁচ থেকে বাঁচিয়ে রাখত। এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে কোনোদিন কথা হয়নি তিতলির।

বাবা মারা যাওয়ার পর তিতলিরা মা-বেটিতে এক গলা জলের মধ্যে পড়ল। খেতে পায় না এমন অবস্থা। স্রেফ প্রাণে বাঁচবার জন্যেই মা ওই বস্তির রাজা সুরেশ সিং-এর রক্ষিতা হয়ে গেল।

সুরেশ সিং ছিল উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার লোক। তিতলির বাবা-মাও ওই বালিয়া থেকেই কলকাতায় এসেছিল। এই বস্তির বেশিরভাগ লেবারই আদতে বিহার কিম্বা ইউ.পি.-র লোক। সুরেশ সিং নিজে পঁচিশ-বছর বয়সে ইন্ডিয়ান পটারিতে জয়েন করেছিল। তখন ও ফার্নেসে কয়লা ঠেলত।

পরের বিশ-বছরের মধ্যে মস্তানি আর ইউনিয়নবাজি করে সে বকলমে কারখানার মালিকগোষ্ঠীর মধ্যেই ঢুকে পড়েছিল। তার অঙ্গুলিহেলন ছাড়া কারখানাতে একটা ট্রাকও ঢুকত না। কিম্বা কারখানা থেকে বেরোত না। স্ক্র্যাপ-ইয়ার্ড থেকে একটা পেরেকও কেউ নিলামে কিনতে পারত না। ড্রাইভার ইউনিয়ন, লেবার-ইউনিয়ন সবকটারই প্রেসিডেন্ট ছিল সুরেশ সিং। লোকাল এম. এল. এ. সুরেশের কথায় উঠতেন বসতেন।

চরিত্রের দিক দিয়ে সুরেশ সিংকে ছোটখাটো মাফিয়া ডন বলা চলত। আনুগত্য মেনে নিলে সুরেশ সিং তাকে রক্ষা করত কিন্তু তার বিরুদ্ধে হাত ওঠালে সেই হাত কেটে ফেলতে একটুও ভাবত না। রোগা খেঁকুরে শরীর, তোবড়ানো গালের সঙ্গে বেমানান কলপ দেওয়া চুল, দুধ সাদা সাফারি, চোখে কালো সানগ্লাস এই ছিল সুরেশ সিং-এর চেনা সুরত। এই সুরেশ সিংকেই ছ'বছর বয়সের পর থেকে তাদের পরিবারের কর্তা হিসেবে দেখেছে তিতলি।

কর্তা হলেও সুরেশ সবসময় ঘরে থাকত না, হঠাৎ হঠাৎ কোনোদিন চলে আসত। আসতো বেশিরভাগ সময় রাতের দিকে। ও এলে একটা সস্তার ক্যাসেট-প্লেয়ারে কাওয়ালির ক্যাসেট চাপিয়ে দিত মা। ছোলাসেদ্ধ আর লঙ্কা দিয়ে দেশি মদের গ্লাস সাজিয়ে দিত। সুরেশ সিং গান শুনতে শুনতে মদ খেত। তখন তিতলি চুপচাপ মেঝেয় বসে পড়াশোনা করতে পারত। ইচ্ছে করলে পুতুলও খেলতে পারত। অসুবিধে ছিল না। কিন্তু ঘণ্টাখানেক গানবাজনা চলার পরে মা ওকে ইশারা করলে যে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে, সেটাও জানত তিতলি। আবার ফিরতে পারত মা ভেতর থেকে দরজার খিল খুললে তবেই।

ওই ছ'-সাতবছর বয়সেই কোনো একটা সময় থেকে পটারি-বস্তির ছেলেমেয়েরা তিতলিকে এই রেন্ডির বাচ্চি, এই খানকির বেটি—এইসব বলে ডাকতে শুরু করে। ডাকত আর হাততালি দিত, সিটি বাজিয়ে হাসত। তিতলি বুঝতে পারত ওগুলো গালাগাল। কিন্তু কেন যে দাদা-দিদিরা ওকে গালাগাল দিচ্ছে সেটাই ও বুঝতে পারত না। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে ও মা-কে জিগ্যেস করেছিল 'মা, খানকির মেয়ে মানে কী? রেন্ডির বাচ্চি কাকে বলে? ওরা আমাকে ওইসব বলে খেপায় কেন?'

ওর মা সেদিন ওর গলা জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছিল আর বলেছিল 'আমি জানি না সোনা। নেহি জানতা হুঁ মেরি বেটি, মেরি লাল। ইয়ে সব গন্ধা বাতেঁকো মতলব নেহি জানতা হুঁ ম্যায়।'

তিতলি বুঝতে পেরেছিল, মা জানে। ভয়ঙ্করভাবে জানে। তাই সে আর কোনোদিন মাকে ও ব্যাপারে কিছু জিগ্যেস করেনি। তারপর যা হয়! ভাদ্রমাসে কুকুরের সঙ্গমদৃশ্য দেখিয়ে বস্তির ছেলেমেয়েরা ওকে শেখায় ওর মা সুরেশ সিং-এর সঙ্গে ওইরকম করে। তিতলি শান্তভাবে শোনে। বাইরে কোনো তাপ-উত্তাপ দেখায় না। আর সেইজন্যেই বোধহয় বস্তির ছেলেমেয়েরা আস্তে আস্তে ওকে খেপানো বন্ধ করে দেয়।

এইভাবে প্রায় পাঁচ-ছ'বছর কেটে যাওয়ার পর বোঝা গেল মায়ের শরীরে অনেকগুলো অসুখ বাসা বেঁধেছে। মা ভীষণ তাড়াতাড়ি বুড়ি হয়ে যাচ্ছিল। প্রায় রোজই জ্বর আসত। পেটের ব্যথাতেও মাঝে মাঝে সারারাত কাতরাতো। তিতলির তখন তেরো বছর বয়স। ওই বাচ্চা মেয়েই একদিন মাকে টানতে-টানতে নিয়ে গিয়েছিল কর্পোরেশনের বিনা পয়সার ডাক্তারখানায়। লেডি-ডাক্তার মায়ের পাতলা চুলের গোছা সরিয়ে ঘাড়ে একটা দগদগে ঘা দেখতে-দেখতে জিগ্যেস করেছিল, 'ওই মেয়েটো তোমার কে?'

'বেটি।' মা উত্তর দিয়েছিল।

'ওকে একটু বাইরে গিয়ে বসতে বলো।'

তিতলির পরিষ্কার মনে আছে, সেদিন ডাক্তারখানার বারান্দায় বসে সে লুকিয়ে-লুকিয়ে কেঁদেছিল। কেন তার মায়ের কাছ থেকে যখন-তখন যে কেউ তাকে হঠিয়ে দেবে? সুরেশ সিংতো দেয়ই, তাই বলে ডাক্তার-ম্যাডামও তাকে মায়ের অসুখের কথা শুনতে দেবে না? আর কারুর মা তো এমন নয়। তাদের মেয়েরা তো সারাক্ষণ মায়ের গায়ে গায়েই ঘোরে। কেউ তো তাদের সরিয়ে দেয় না। ওর মায়ের জীবনে এত লুকোনো কথা কেন?

বড় হওয়ার পর তিতলি দুয়ে দুয়ে চার করে বুঝতে পারে মায়ের অসুখটা ভেনারেল ডিজিজ-ই ছিল। গনোরিয়া কিম্বা সিফিলিসের মতন কিছু। সুরেশ সিং-এর দান।

যাই হোক, সেদিনের পর থেকে মাকে সপ্তাহে তিনদিন ডাক্তারখানায় সুঁই নিতে যেতে হত। মা তিতলিকে পইপই করে বলে দিয়েছিল, সুরেশচাচা যেন ঘুণাক্ষরেও সুঁই নিতে যাওয়ার কথা জানতে না পারে।

ওসব করেও উপকার বিশেষ কিছু হচ্ছিল না। মায়ের শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল। আর সেই ভাঙা শরীর ঢেকে রাখতে মা সুরেশ সিং-এর ঘরে আসার দিনগুলোয় রঙিন শাড়ি পরে, গালে রুজ-টুজ মেখে বসে থাকত। তখন মায়ের ঢঙ দেখে গা জ্বালা করত তিতলির, কিন্তু এখন সেই দিনগুলোর কথা ভাবলে মায়ের জন্যে ভারি মায়া হয়। তিতলির বয়স তখন চোদ্দো। ওর মা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল, ওই সময়টাতেই তার বেঁচে থাকাটা সবচেয়ে জরুরি। তা না-হলে তিতলি ভেসে যাবে।

মা মাঝে-মাঝে বলত, 'সুরেশবাবু যদি সাহারা না দেন, তাহলে আমাদের কী হবে রে তিতলি? তোর পড়াশোনার এত খরচ, স্কুলের ইউনিফর্ম, বাসভাড়া, সব কোথা থেকে জোগাড় করব?'

ছোটবেলা থেকেই তিতলি পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। বস্তির প্রাইমারি স্কুল থেকে নাগেরবাজারের বড় স্কুলে চলে যেতে তার কোনো অসুবিধেই হয়নি। সেইজন্যেই ওকে নিয়ে ওর মা অনেক স্বপ্ন দেখত। স্বপ্ন দেখত, তিতলি পড়াশোনা করে বিরাট চাকরি করবে। ওদের ঘৃণ্য জীবনে ইতি টানবে। কিন্তু সুরেশবাবুর দয়া ছাড়া তিতলি তো অতদূর যেতে পারবে না। সেইজন্যেই মায়ের কপাল থেকে চিন্তার ভাঁজ কিছুতেই সরত না।

চোদ্দো বছর মানে, তিতলি তখন বেশ বড় হয়ে গেছে। তাই সুরেশ সিং এলে সে আর রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারত না। সুরেশ সিং নিজেই সেই সমস্যা বুঝে একটা ব্যবস্থা করে দিল। ওদের বাড়ির পেছনেই একটা সিঙ্গল রুম ভাড়া নিয়ে নিল। ওইটা হল তিতলির নতুন পড়ার ঘর। তিতলি তখন থেকে দিনের মধ্যে বেশিরভাগ সময়টাই ওই ঘরটাতে নিজের বইখাতা নিয়ে কাটাতে শুরু করল।

ওই এঁদো ঘরটার কথাই সারাক্ষণ ভাবে তিতলি। ওই ঘরে নোংরা বিছানার ওপর বসে পড়াশোনা করতে-করতেই সে পাখির বাচ্চার সিঁইই সিঁইই ভয়ের ডাক শুনে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখত, এত বড় দাঁড়াশ সাপ চালের বাতা বেয়ে এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে। পায়রার বাচ্চা খেতে আসত সাপগুলো। ঘরের মেঝেটাও ছিল আস্ত একটা চিড়িয়াখানা। ভাঙা মেঝের ফাটলে ডেঁয়োপিঁপড়ে থেকে কাঁকড়াবিছে কী না ছিল? ওই পোকামাকড়গুলো তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল। তবে ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিখিয়েছিল নীলপরী।

চোদ্দো বছর বয়সে তিতলি পোকাটাকে নীলপরী বলেই ডাকত। বড় হয়ে জেনেছে ওটার নাম কুমোরে-পোকা, ইংরিজিতে Jewel Wasp।

পোকাটা ওই এঁদো ঘরের বাসিন্দা ছিল না। ওই ঘরের স্থায়ী বাসিন্দা ছিল আরশোলারা। সেই আরশোলাদের ধরার জন্যেই ওই নীলপরী হঠাৎ-হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে আসত।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। ফিনফিনে সরু উজ্জ্বল নীল পোকাটা ঘরে ঢুকলেই, মেঝেয় চরে বেড়ানো আরশোলাদের মধ্যে গর্তে লুকোবার জন্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। কিন্তু তারা পালানোর আগেই নীলপরী পোঁওও করে উড়ে এসে কোনো একটা আরশোলার ঘাড়ে হুল ফুটিয়ে দিত। কী যে থাকত সেই কামড়ে, কে জানে! আরশোলাটা সঙ্গে সঙ্গে একেবারে হিপনোটাইজড হয়ে যেত; সে আর পালাবার কোনো

চেষ্টাই করত না। নীলপরী তখন আরশোলাটার শুড় ধরে আলতো টান দিলেই সে সুড়সুড় করে যেদিকে নীলপরী তাকে নিয়ে যেতে চাইছে সেদিকে চলতে শুরু করত। এইভাবে নীলপরী নিজের চেয়ে দশগুণ বড় আরশোলাটাকে নর্দমার মধ্যে দিয়ে ঘরের বাইরে কোথাও একটা নিয়ে চলে যেত।

একদিন মেঝেয় উপুড় হয়ে শুয়ে তিতলি ওই দৃশ্যই দেখছিল। হঠাৎ তার কানে ভেসে এল মায়ের চিৎকার আর কান্নার শব্দ। মা এমনিতে খুব যন্ত্রণাতেও কাঁদত না। তাহলে? আজ কী হল মায়ের? তিতলি ওই ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে নিজেদের বাড়ির দরজায় দুমদুম করে ধাক্কা মেরে চেঁচাতে শুরু করল, 'সুরেশচাচা, দরবাজা খুলিয়ে, সুরেশচাচা।'

দরজা খুলে গেল। তিতলি দেখল মায়ের অর্ধোলঙ্গ শরীর মেঝেয় লুটোচ্ছে। সুরেশচাচা প্যান্টের জিপার আঁটতে আঁটতে দাঁতে দাঁত চিপে বলল, 'শুখা অওরত কাঁহিকা!'

তিতলি সুরেশচাচার পাশ কাটিয়ে মায়ের পাশে গিয়ে বসেছিল। বুঝবার চেষ্টা করছিল মায়ের চোট কতটা সিরিয়াস। দেখল গলায় পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেছে ঠিকই, কিন্তু মাথা-টাথা ফাটেনি। সে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে হারামি সুরেশচাচাকে কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেল। সে দেখল সুরেশচাচা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার ফ্রকের পাড় যেখানে থাইয়ের ওপর শেষ হয়েছে সেইদিকে তাকিয়ে আছে।

তিতলি উঠে যাওয়া ফ্রকটাকে সরানোর চেষ্টা না করে সুরেশ সিং-এর চোখে চোখ রেখে হাসল। তার মনে পড়ল নীলপরীর কথা। একটা সদ্য খোলশছাড়া সাদারঙের আরশোলার কথাও মনে পড়ল তার। নীল ফ্রকের তিতলির চোখে সেই মুহূর্তে সাদা সাফারি-স্যুট গায়ে চড়ানো সুরেশচাচাকে ওই সাদা আরশোলাটার মতনই মনে হচ্ছিল। তিতলি ভাবছিল, সুরেশচাচা সবদিক দিয়েই তার চেয়ে অনেক অনেক বড়। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? তার কি বিষ নেই?

মায়ের পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে সুরেশ সিং-এর কানে কানে বলল, 'বাবলুর দোকান থেকে কনডোম কিনে আনুন। আমি ও ঘরে ইন্তেজার করছি।'

সুরেশ সিং তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল। তিতলি ঘরের দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় দেখল, মায়ের ভুরুর ভাঁজগুলো এতদিন বাদে মিলিয়ে গেছে। মা মেঝেতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত ঠোঁটের কোণে নিশ্চিন্ততার হাসি।

নীলপরী আরো অনেক কিছুই শিখিয়েছিল তিতলিকে। তিতলি একদিন নীলপরীকে ফলো করে পৌঁছে গিয়েছিল রাস্তার নালির ধারে ভিজে মাটিতে ওর বাসার গর্তে। গর্তের মুখ খুলে ও খুঁড়ে বার করেছিল একটা আরশোলা। অবাক হয়ে দেখেছিল আরশোলাটা দিব্যি বেঁচে আছে, শুঁড় নাড়ছে। কিন্তু ওর বেঁচে থাকার কথা নয়, কারণ, ওর পেটের মাংস কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে নীলপরীর বাচ্চারা। তখনও বাচ্চাগুলোর শরীর কৃমির মতন। বড় হলে ওরাই কুমোরে-পোকার সৌন্দর্য পাবে।

তিতলি বুঝতে পেরেছিল, নীলপরীর বিষে ওই আরশোলাটা হয়ে গেছে একটা জিন্দা লাশ। এইভাবেই নিজের বাচ্চাদের জন্যে টাটকা মাংসের ব্যবস্থা করেছে নীলপরী। সেদিন পুরো দৃশ্যটা দেখে একটা গা শিরশিরে আনন্দে ভেসে গিয়েছিল তিতলির শরীর, ঠিক যেরকম আনন্দে সে ভেসে যেত সুরেশ সিং-এর সঙ্গে সঙ্গমের চূড়ান্ত মুহূর্তগুলোয়। আধখাওয়া আরশোলাটাকে হাতের তালুতে তুলে নিয়ে দাঁতে দাঁত চিপে তিতলি বলেছিল, 'সুরেশ সিং, তুমি আমাকে এইভাবে ক্যারি করবে। যতদিন বেঁচে থাকবে, ইউ মাস্ট ক্যারি মি।'

এর পাঁচ বছরের মাথায় তিতলির মা মারা গিয়েছিল। তিতলি তখন বি.এস.সি সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। শেষের ওই পাঁচ বছর সুরেশ সিং আর মাকে ছোঁয়নি। নিজের শরীরের বিনিময়ে মায়ের জন্যে ওই শান্তির ব্যবস্থাটুকু করতে পেরেছিল তিতলি।

মা মারা যাওয়ার পরে-পরেই তিতলিকে সুরেশ সিং পটারি-বস্তি থেকে তুলে নিয়ে গেল ফুলবাগানের একটা নিরিবিলি এক-কামরার ফ্ল্যাটে। তিতলি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কলেজে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার

নজর হয়ে গিয়েছিল উঁচু। পটারি-বস্তিটাকে মনে হত নরক।

সপ্তাহে দুদিন সুরেশ সিং ফুলবাগানের ফ্ল্যাটে আসত। সব মিলিয়ে ঘণ্টা চারেক হয়তো সুরেশ সিং-কে সঙ্গ দিতে হতো; তা ছাড়া বাকি দিনগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত তিতলি বই, সি.ডি. আর ল্যাপটপের মধ্যে ডুবে থাকত।

সঙ্গী হবার আগ্রহ নিয়ে আর কেউ কি এর মধ্যে আসেনি তিতলির কাছে?

এসেছিল বইকি। কলকাতা মহানগরীতে একলা এক তরুণী। বর্ষার নতুন মেঘের মতন তার গায়ের রং, বাঁশির মতন তার নাক, দোপাটিফুলের পাপড়ির মতন ঠোঁট আর ডাঁশা পেয়ারার মতন চিবুক। খয়েরি চোখের মণিতে জন্মসূত্রে পাওয়া মধুবনী রহস্য। এমন মেয়েকে কেউ পেতে চাইবে না তাই কী হয়? তবে তারা বেশিরভাগই তিতলির সহপাঠী। নাদান লড়কা সব। তিতলির মনের বয়স যে তাদের থেকে অনেক বেশি, সেটা তিতলিই সবথেকে ভালো বুঝত। বুঝত আর মনে মনে হাসত। শরীর নিয়ে কত রোমান্টিকতা ওদের! মেয়েদের শরীরের রহস্য নিয়ে কত কবিতা লেখে বাঙালি ছেলেগুলো। হুঃ! শরীরের যন্ত্রণা কাকে বলে তা যদি ওরা জানত।

সেই যন্ত্রণা জানে তিতলি পনেরো বছর বয়সে যার সতীচ্ছদ ছিঁড়ে রক্তারক্তি হয়েছে।

কবিতা শুনলে তাই তিতলির চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। প্রেমের কথা শুনলে তার মাথায় খুন চেপে যায়। নিদ্রাহীন রাতে বালিশে মুখ গুঁজে সে ভাবে বেকার বেকার। ধরতিমাঈ, অর্থাৎ মাদার-নেচার এসব কিছুই চান না। ধরতীমাঈ মন বোঝেন না, শরীর বোঝেন।

কেন বোঝেন?

অন্ধকার ঘরে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে তিতলি ডারউইনিজমের প্রথম পাঠ আওড়ায়। প্রকৃতি চায় এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে জিনের মসৃণ সঞ্চালন। যে স্পিসিস যত নিপুনভাবে এবং ব্যাপক-হারে নিজের জিনকে ছড়িয়ে দিতে পারবে, সেই স্পিসিস তত সাকসেসফুল। শরীর হচ্ছে সেই জিনের ক্যারিয়ার মাত্র, তার চেয়ে একটুও বেশি কিছু নয়।

তিতলি ভাবে সেই ফলের মাছির কথা, জীবনের পুরোটাই প্রায় মাটির নীচে পিউপা অবস্থায় ঘুমিয়ে কাটানোর পর, যে-পোকা একদিনের জন্যে মাটির ওপরের আকাশে ডানা মেলে। ওই একদিনই লক্ষ-লক্ষ মাছিতে আকাশ ছেয়ে যায়। কয়েকঘন্টার আলোর জীবন। তার মধ্যেই তাদের সঙ্গম, তাদের প্রসব। তাদের মরে যাওয়া।

বিস্ময়টা সেখানে নয়। বিস্ময় মাদার-নেচারের কিপটের মতন হিসেবিপনায়। যেহেতু ওই একদিনের জীবনে তাদের খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন হয় না, তাই মাটি ফুঁড়ে বেরোনোর আগেই ওই ফলের মাছিদের ডাইজেসটিভ-সিস্টেম লোপ পেয়ে যায়। তাদের ছোট্ট শরীরের সবটুকু জুড়ে মাদার-নেচার সাজিয়ে দেন জননতন্ত্র। শুধুই জননতন্ত্র।

আজ যদি প্রকৃতি বুঝত, মানুষ না খেয়েও চল্লিশবছর কাটিয়ে দিতে পারবে, তাহলে মানুষের শরীরেও অন্ত্র, অগ্ন্যাশয় কিম্বা পাকস্থলী বলে কিছু থাকত না। কিন্তু অবশ্যই থেকে যেত লিঙ্গ শুক্রাশয়, যোনি ডিম্বাশয় আর জরায়ু।

কিছুদিন আগে একটা সায়েন্স-জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের পাতায় তিতলির চোখ আটকে গিয়েছিল। নামিবিয়ার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নারী-পুরুষদের পরীক্ষা করে দুজন বিজ্ঞানী দেখেছেন যে, তাদের শরীরের অন্য সব সিস্টেম পুষ্টির অভাবে ভোগে চলে গেছে। কিন্তু টানা উপোসের পরেও প্রায় অক্ষত থেকে গেছে দুটি সিস্টেম—মস্তিষ্ক আর যৌনাঙ্গ।

আপনমনেই হেসে ওঠে তিতলি। এর পরে কোথায় থাকে কবিতা আর কোথায় থাকে প্রেম? তার সহপাঠী যুবকদের মুখ মনে পড়লে তাই হাসি পায় তিতলির। বরং সুরেশবাবুর যৌন-উন্মাদনাকে তার অনেক ন্যাচারাল লাগে।

## তিন

তিতলি সেদিন জানত না, তার হাসির আয়ু আর একবছর।

একবছর বাদে বি.এস.সি.-র রেজাল্ট বেরোল। তিতলি শুধু প্রথমই হয়নি, অনেকগুলো পেপারে রেকর্ড-মার্ক পেয়েছে। এই নম্বর নিয়ে কি ও কলকাতাতেই পড়াশোনা করবে, নাকি বিদেশের কোনো ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার চেষ্টা করবে? ওর রেজাল্ট দেখে কলেজের অনেক অধ্যাপক ওকে এই প্রশ্ন করছিলেন। তিতলি নিজেও প্রবলভাবে চাইছিল বিদেশের, বিশেষত আমেরিকার কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স এবং পি. এইচ. ডি. করে আসতে। গবেষণার বিষয়ও ততদিনে ঠিক করে ফেলেছিল তিতলি। সে হবে প্যারাসাইটোলজিস্ট। পরজীবীদের নিয়ে গবেষণা করবে সে।

তিতলির এই সিদ্ধান্তের মূলে ছিল ওর ছোটবেলার সেই নীলপরী। ততদিনে তিতলি জেনে গেছে, ওই জুয়েল-ওয়াস্প হচ্ছে একধরনের প্যারাসাইট, যাকে বাংলায় বলে পরজীবী। আর আরশোলারা হচ্ছে তার হোস্ট, অর্থাৎ পালক। একেক পরজীবীর একেক নির্দিষ্ট পালক থাকে। প্যারাসাইটরা হোস্টদের যেভাবে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে, যেভাবে তিলে-তিলে তাদের মারে, তা অকল্পনীয়। সাধে কি স্বয়ং ডারউইন বলেছিলেন যে, আমি কিছুতেই নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারি না, করুণাময় ঈশ্বর জেনেবুঝে ওই পিশাচ পরজীবীগুলোকে সৃষ্টি করেছিলেন!

তিতলি বুঝতে পারত না, ডারউইন সাহেবের কেন এমন মনে হয়েছিল।

সারভাইভাল। বেঁচে থাকা। তার ওপরে যে কিছু নেই সেটা ডারউইনের থেকে বেশি কে বুঝত? প্যারাসাইটরা যা করে তা তো বেঁচে থাকার জন্যেই করে। তিতলিও বাঁচতে চায়। শুধু বাঁচতে চায় না, রানির মতন বাঁচতে চায়। তার মতন নিঃসঙ্গ নির্যাতিত এক মেয়ের পক্ষে সেটা তখনই সম্ভব, যখন সে প্যারাসাইট হয়ে যেতে পারবে। যখন তার হোস্ট হবে পুরুষরা, পুরুষদের মাইন্ড কন্ট্রোল করবে সে—তিতলি যাদব।

তাই কলেজে অ্যাডমিশন নেওয়ার পর থেকেই তিতলি বইয়ের পাতায়, কম্পিউটারের স্ক্রিনে কিম্বা ফর্ম্যালিনে চোবানো স্পেসিমেনের জারে একের পর এক পরজীবী আক্রান্ত পশু-পতঙ্গের অবাক করা কাহিনি খুঁজে বেড়াত।

যেমন এককোষী এক পরজীবী, নাম তার Toxoplasma gondii। সে জীবন কাটায় ইঁদুরের অন্ত্রে! কিন্তু বাচ্চা পয়দা করার জন্যে তাকে ঢুকতে হয় বেড়ালের খাদ্যনালীতে। এর জন্যে Toxoplasma gondii করে কি, ইঁদুরের ব্রেনটাকেই পালটে দেয়! ইঁদুর তখন আর বেড়ালকে ভয় পায় না, বরং বেড়ালের গন্ধ শুঁকে শুঁকে তার কাছে গিয়ে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে। আশ্চর্য ব্যাপার! আর সব দিক দিয়ে কিন্তু ইঁদুরটা তখনো নর্মাল থাকে, শুধু তার মনে বেড়াল সম্বন্ধে ভয়ের বদলে ভালোবাসা জেগে ওঠে। তারপরে আর কি? বেড়ালে ইঁদুর খায় আর ইঁদুরের পেটের মধ্যে থেকে Toxoplasma চালান হয়ে যায় বেড়ালের পেটে।

কিম্বা Dicrocoelium dendriticum নামে আরেক পরজীবী! জীবনচক্রের একটা স্টেজে ওই আণুবীক্ষণিক জীবটি পিঁপড়েদের অন্ত্রের ভেতরে বেড়ে ওঠে। কিন্তু পরের স্টেজে তাকে আবার পৌঁছতে হয় গরু, ছাগলের মতন তৃণভোজী প্রাণীদের পেটে। সেখানে ওদের মেটিং হয়, ওরা ডিম পাড়ে। পিঁপড়ের পেট থেকে গোরু ছাগলের মতন প্রাণীর পেটে পৌঁছনোর তো একটাই উপায়। গরু, ছাগলকে ওই Dicrocoelium বয়ে নিয়ে বেড়ানো পিঁপড়েকে ঘাসের সঙ্গে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে হবে। আর তার জন্যে পিঁপড়েগুলোকে চড়ে বসে থাকতে হবে ঘাসের ডগায়।

কিন্তু ঘাসের ডগায় চড়ে বসে থাকার জন্যে তো পিঁপড়েদের জন্ম হয়নি।

আশ্চর্যের ব্যাপার, Dicrocoelium নামে সেই পরজীবী পিপড়েদের দিয়ে ঠিক সেই কাজটাই করিয়ে নেয়। দেখা গেছে পিপড়ের শরীরে ঢোকার পরেই দু-তিনটে Dicrocoelium তার ব্রেনে গিয়ে কেমিকাল ছড়াতে শুরু করে। পিপড়েরা তখন সকাল হলেই ঘাসের ডগায় চড়ে বসে থাকে। কিন্তু রোদ চড়ার পরেও যদি সেই পিপড়ে ঘাসের ডগায় বসে থাকে তাহলে তার রোদে ঝলসে মরে যাওয়ার চান্স থাকে আর সেই সঙ্গে তার পেটের মধ্যে বাসা বেঁধেছে যে Dicrocoelium-গুলো তাদেরও মরার সম্ভাবনা থাকে। তাই দুপুরবেলায় তারা পিপড়েদের স্বাভাবিকভাবে ছায়ায় ঘোরাফেরা করতে দেয়, কিন্তু রাত হলেই ভূতের মতন আবার তাদের ঘাড়ে চেপে বসে।

তিতলির এসব কথা পড়তে পড়তে কান গরম হয়ে যেত। সে কেবলই ভাবত, বীজাণুর মতন ছোট প্যারাসাইটগুলোর কী কম্যান্ড! কী নির্মম, কী নিখুঁত ওদের অপারেশন! ওরা মাইন্ড কন্ট্রোল জানে। মনকে মুঠোয় পুরে নেওয়ার জাদু জানে ওরা।

আসলে তো জাদু নয়, জটিল বায়োকেমিস্ট্রি। প্যারাসাইটের শরীরের কেমিক্যালের প্রভাবে তার হোস্ট অবশ হয়ে যায়। সম্মোহিত অবস্থায় যা করার নয়, তাই করে। যদি প্যারাসাইটদের কাছ থেকে এই রণনীতি শিখে নেওয়া যায়! পারবে না? পারবে না তিতলি মানুষকে চাকর বানাতে?

পরেরদিন যখন সুরেশ সিং ওর ফ্ল্যাটে এল, তখন তাকে আমেরিকায় পড়তে যাওয়ার ইচ্ছের কথাটা বলেই ফেলল তিতলি। সুরেশ শান্তস্বরে জিগ্যেস করল, 'কত টাকা লাগবে?'

তিতলি ইতস্তত করে বলল, 'ইনিশিয়ালি পনেরো লাখ মতন।'

'কতদিনের মধ্যে লাগবে?'

তিতলি হিসেব করে বলল, ছ'মাস।

বিছানা ছেড়ে উঠে সুরেশ সিং বলল, 'তার মানে মাসে আড়াই-লাখ। দিনে দশ হাজারের একটু কম। ঠিক আছে, হয়ে যাবে।'

তিতলি ওই দৈনিক হিসেবের মানে বুঝতে পারল না, তবে তাই নিয়ে আর ঘাঁটালোও না। সুরেশ সিং বলেছে, আমেরিকা যাওয়ার টাকা দেবে, এতেই সে মনে-মনে নাচছিল।

সুরেশ সিং ফুলবাগানের ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পরে তিতলি চান-টান করে আরাম করে চৌকির ওপরে পা ছড়িয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিল। অনেকদিন বাদে সে নিজেই নিজেকে পড়াশোনার থেকে ছুটি দিয়েছিল সেদিন। তার মনে হচ্ছিল, এটা সেলিব্রেট করার মতন একটা সন্ধে। কোল্ডড্রিংকস আর পোট্যাটো-চিপস সহযোগে তিতলি ওয়েব- সিরিজ দেখতে বসল।

এইভাবে বড়জোর ঘণ্টাদুয়েক কেটেছে। রাত তখন সাড়ে-ন'টা। যখন সবে সে ভাবছে এবার উঠে রাতের খাবারগুলো গরম করবে, তখনই দরজায় কলিংবেল বাজল। আই-হোলে চোখ রেখে তিতলি দেখল সুরেশ সিং ফিরে এসেছে। ওর পেছনে আরেকজন কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভারি অবাক হয়ে তিতলি দরজা খুলে দিল। জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার? ফিরে এলেন যে?'

সুরেশ সিং ওর কথার উত্তর না দিয়ে পেছনের লোকটাকে বলল, 'আইয়ে। অন্দর আইয়ে।'

ওরা দুজনে তিতলিকে প্রায় ধাক্কা মেরেই ভিতরে ঢুকে এল। সুরেশ সিং দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে তিতলিকে ঠেলে ঘরের একদিকে নিয়ে গেল। তারপর হিসহিস করে বলল, 'ইয়ে হ্যায় দ্বিবেদীসাব। মেরা মেহমান। রেভিনিউ ডিপার্টের বড় অফিসার। ঠিকঠাক খাতিরদারি করবি। কোনো লাফড়াবাজির কথা শুনলে জানে মেরে দেবো, মনে থাকে যেন।'

তিতলিকে ছেড়ে দিয়ে সুরেশ সিং দ্বিবেদীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি তাহলে চললাম, দ্বিবেদীসাহেব। আপ মস্তি মানাইয়ে। ফ্রেশ গার্ল চেয়েছিলেন, দিয়ে গেলাম। একটু দেখবেন ওকে।'

রাত এগারোটা নাগাদ পরিতৃপ্ত দ্বিবেদীসাহেব বেরিয়ে যাবার পরে তিতলি ওর ফ্ল্যাটের দরজা লাগিয়ে খাটের ওপরে এসে বসল। বালিশের পাশে একটা পাঁচশোর নোটের বান্ডিল পড়েছিল। ওটা হাতে না নিয়েও

তিতলি বুঝতে পারছিল, ওর মধ্যে দশহাজারই রয়েছে—ওর একরাতের রেট। এইভাবেই ওকে আগামী ছ'মাসে আমেরিকা যাওয়ার পনেরো লাখ টাকা তুলতে হবে।

বাণ্ডিলটাকে হাতের এক ঝটকায় মেঝেতে ফেলে দিয়ে, দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইল তিতলি। ও বুঝতে পারছিল, আমেরিকায় পড়তে যাবার কথায় সুরেশ সিং খেপে গেছে। যেতে তো দেবেই না, বরং ওকে বেশ্যা বানিয়ে ফেলবে।

ভোরের দিকে বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল তিতলি। রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে। কলকাতা জেগে উঠছে। রাতজাগা লাল চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে তিতলি নিজের মনেই বলল, 'সেটা তো হবে না সুরেশ সিং। তুমি বুঝতে পারছ না, বাজারি-বেশ্যা হবার জন্যে তিতলি যাদবের জন্ম হয়নি।'

ফুলবাগানে থাকলেও বেঙ্গল পটারির হালের খবর সবই তিতলির কাছে নিয়মিত পৌঁছে যেত। ওখানকার সাথী-সহেলিরাই তিতলিকে ফোনে সব খবরাখবর দিত। সেইভাবেই তিতলি জানতে পেরেছিল, বাজারে সুরেশ সিং-এর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী চড়চড় করে উঠে আসছে।

ইন্ডিয়ান পটারির রাজত্বে সে নতুন ডন। সে-ও বালিয়া জেলার বাহুবলী সম্প্রদায়ের ছেলে। ত্রিশ বছরের তরতাজা যুবক গোরখনাথ সিং। মুখে মুখে নামটা হয়ে গিয়েছিল গোখরো। সকেট গোখরো। 'সকেট', মানে দেশি পিস্তল চালাতে সিদ্ধহস্ত ছিল গোখরো।

সকেট গোখরো এককালে সুরেশ সিংএরই চ্যালা ছিল। এসব ক্ষেত্রে তাই হয়ে থাকে। সুরেশের তেজ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকেট গোখরো তোলাবাজি, মালচুরি, ড্রাগের পেডলিং ইত্যাদি সবকটা ব্যবসাতেই হিস্যা মারতে শুরু করল। এমনকি নিজের একটা আলাদা গ্যাঙ অবধি তৈরি করে ফেলেছিল গোখরো।

গোখরোর দল আর সুরেশের দলে গতমাসে যে কয়েকদিন ব্যাপক বোমাবাজি হয়েছে, সেটাও তিতলির কানে এসেছে। ও জানে, গোখরো এখন বেশ ব্যাকফুটে, কারণ, সুরেশ তো শুধু নিজের গ্যাঙ নিয়ে লড়ছে না সুরেশের হয়ে লড়ছে লোকাল থানার ঘুষখোর দারোগা, লোকাল এম.এল.এ.-র চ্যালাচামুন্ডা, সবাই। ইতিমধ্যেই গোখরোর দলের বেশ কয়েকজনকে পুলিশ লক-আপে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

সুরেশ সিং-এর সঙ্গে কীভাবে টক্কর নেওয়া যায় সেই কথা ভেবে যখন গোখরো মাথার চুল ছিঁড়ছে, তখনই একদিন তার কাছে পৌঁছে গেল তিতলি যাদবের টেলিফোন কল। তিতলি তাকে বলে দিল, ফুলবাগানের ফ্ল্যাটের হদিশ। কবে, কোন সময়ে সুরেশ সিং ওই ফ্ল্যাটের দিকে যাবে সেটাও খুব শিগগিরই জানাবে বলল।

সকেট গোখরো হাতে চাঁদ পেল। সে তিতলিকে আশ্বাস দিল, সুরেশ সিং-এর সদগতি হয়ে যাওয়ার পর তিতলিকে সে নিজের পার্টনার করে নেবে। তিতলি ফোঁস করে উঠল। বলল, খবরদার, ওসব কথা যেন সে স্বপ্নেও না ভাবে। সে শুধু সুরেশ সিং-এর হাত থেকেই মুক্তি চায় না, পুরো পটারি বস্তির হাত থেকেই মুক্তি চায়। পিছনের জীবনটাকে একেবারে মুছে ফেলে সে চলে যাবে নতুন জীবন শুরু করতে আমেরিকায়।

পরদিন তিতলি একবার কলেজে গেল। ডিপার্টমেন্টাল-হেড প্রফেসর সত্যপ্রিয় বসাক কিছুদিন আগে তাকে একটা চাকরির কথা বলেছিলেন। উনি জানতেন, তিতলির বাবা-মা নেই। আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। অথচ মেয়েটা ব্রিলিয়ান্ট। সেইজন্যেই তিনি ওর জন্যে একটা চাকরির চেষ্টা করছিলেন।

সেদিন তিতলি প্রফেসর বসাকের সঙ্গে দেখা করে বলল, 'স্যার। সেই যে চাকরিটার কথা বলেছিলেন, সেটা কি পাব?'

প্রফেসর বসাক ভারি খুশি হয়ে বললেন, 'আরে তিতলি, আমি তো কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়ে রেখেছিলাম। তুমি ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছিলে না বলে ফাইনাল করিনি।'

কথাটা সত্যি। ক'দিন আগে অবধিও তিতলি জানত, বিদেশে পড়তে যাওয়ার জন্যে তার টাকার অভাব হবে না। সুরেশ সিং ব্যবস্থা করবে। গত কয়েকদিনে সিচুয়েশন আমুল বদলে গেছে।

তিতলি ওড়নার পাড়টা আঙুলে জড়াতে-জড়াতে মুখ নীচু করে বলল, 'করব স্যার। চাকরিটা আমার খুব দরকার।'

প্রফেসর বসাক বললেন, 'এটা ঠিক সাধারণ চাকরি নয়। এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। তুমি ভালো স্যালারি তো পাবেই, তার সঙ্গে পাবে একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে একটা স্টেট অফ দা আর্ট ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সুযোগ। ডক্টর প্রদীপ কামাথের নাম শুনেছ?'

নামটা শুনেই তিতলির হৃদপিণ্ডে দামামা বেজে উঠল। ডক্টর প্রদীপ কামাথ! তিনি তো ভগবান। সারা পৃথিবীতে হাতে গোনা যে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক CRISPR টেকনোলজির নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ডক্টর কামাথ অগ্রগণ্য। CRISPR টেকনোলজিকে জিনোম অপারেশনের সূক্ষ্মতম ছুরি বলা যায়। একবার এই টেকনোলজিকে ঠিকঠাক আয়ত্ব করতে পারলে জিন-ঘটিত বহু রোগকে নির্মূল করে দেওয়া যাবে। সে কোনোরকমে বলল, 'শুনেছি স্যার!'

তিতলির মুখের চেহেরা দেখে প্রফেসর বসাক হেসে ফেললেন। বললেন, 'ফরচুনেটলি, ডক্টর কামাথ খুব শিগগিরই দুর্গাপুরের একটা ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে আসছেন। কোম্পানিটার নাম সিমবায়োটিক—আমেরিকান কোম্পানি। আমাদের এই সাব-কন্টিনেন্টের টিপিকাল কিছু অসুখের ওষুধ বার করার চেষ্টা করছে ওরা। সেইজন্যেই দুর্গাপুরে ল্যাবরেটরি আর রিসার্চ-সেন্টার বানিয়েছে।

'ডক্টর কামাথ আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেন। উনি কিছুদিন আগে আমাকে একজন মহিলা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের খোঁজ দিতে বলেছিলেন।'

তিতলির মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'মহিলাই কেন?'

প্রফেসর সত্যপ্রিয় বসাক প্রথমটায় একটু আমতা-আমতা করলেও নিজের নামের প্রতি সেদিন সুবিচার করেছিলেন। সত্য কথাই বলেছিলেন তিনি তিতলিকে। বলেছিলেন, 'শুধু রিসার্চ-অ্যাসিস্ট্যান্ট নয়, উনি চান ওঁর এক্সপেরিমেন্টের জন্যে একজন ভলান্টিয়ার; যার ওপরে উনি এক্সপেরিমেন্ট করে রেজাল্টগুলো দেখতে পারবেন। এবং সেটা এমন কোনো এক্সপেরিমেন্ট, পুরুষের শরীরে যেটা টেস্ট করা যাবে না। এর বেশি আমাকে কিছু বলেননি উনি। আর বুঝতেই পারছ, গবেষণার এই স্টেজে আমার পক্ষেও বেশি কিছু জানতে চাওয়াটা ডিসেন্ট নয়। বাট আই সাজেস্টেড ইওর নেম। এবার বলো, কাজটা করবে?'

'করব স্যার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি জয়েন করতে চাই। বেঁচে থাকার জন্যে আমার টাকার খুব দরকার, স্যার'।

নিজের সেলফোনে প্রদীপ কামাথের নাম্বার ডায়াল করতে-করতে, প্রফেসর বসাক বলেছিলেন, 'শুধু টাকা নয়। তোমার কাজ, তোমার কোয়ালিটিজ যদি ডক্টর কামাথের পছন্দ হয় হবেই আমি শিওর, তাহলে উনিই তোমার ভবিষ্যৎ তৈরি করে দেবেন। পরের ধাপে হয়তো তোমাকে বিদেশের... কোনো নামকরা ল্যাবরেটরিতে।'

ডক্টর কামাথ কল রিসিভ করলেন, 'গুড-ইভনিং মিস্টার বসাক। বলুন, কী খবর।'

প্রফেসর বসাক কিছুক্ষণ কথা বলে ফোনটা রেখে দিলেন। তারপর তিতলির দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বললেন, 'ডান। উনি ঠিক এক-সপ্তাহ বাদে দুর্গাপুর সিমবায়োটিকে জয়েন করছেন। তোমাকে যেতে বললেন দশদিন বাদে, মানে দেয়ালে ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে প্রফেসর বসাক বললেন, তেইশে ফেব্রুয়ারি।'

তিতলি প্রফেসর সত্যপ্রিয় বসাকের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, 'আপনার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না, স্যার।'

প্রফেসর বসাক তিতলির মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'ভালো থেকো। যোগাযোগ রেখো।'

কলেজ থেকে বেরিয়ে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির পাশের একটা টেলিফোন বুথ থেকে তিতলি পরপর দুটো ফোন করল। প্রথমটা সুরেশ সিংকে। সুরেশকে বলল, আগামী তেইশ-তারিখ সে কোনো গেস্টকে এনটারটেইন করতে পারবে না। কিন্তু সুরেশ নিজে যেন ওইদিন রাত দশটার সময় অবশ্যই আসে।

সুরেশ একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার? হঠাৎ এত পেয়ার?'

তিতলি কান্নাভেজা গলায় বলল, ওদিন তার মায়ের জন্মদিন। এই পৃথিবীতে সুরেশ ছাড়া তার মায়ের আর কোনো আপনজন ছিল না। তাই সেদিন সুরেশকে সঙ্গে নিয়ে ও একটু মায়ের ছবির সামনে বসতে চায়।

প্রত্যাশামতই সুরেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ভারী গলায় বলল, 'আয়েঙ্গে। জরুর আয়েঙ্গে।'

তিতলি জানে ওর মায়ের জন্যে সুরেশ সিং-এর মনে সত্যিই কিছুটা ভালোবাসা ছিল। সেইজন্যেই মায়ের জন্মদিনের টোপটা দিয়েছিল।

সুরেশ সিং-এর সঙ্গে কথা বলার পর তিতলি সকেট গোখরোকে ফোন করল। বলল, 'তেইশে ফেব্রুয়ারি রাত দশটায় পৌঁছে যাবি। আমি থাকব না, তবে সুরেশ সিং ওইসময়ে আসবে। আর শোন, যা করার করবি বড় রাস্তায়। আমার ফ্ল্যাটের ধারে-কাছে খুনখারাপির কোনো চিহ্ন যেন না থাকে।'

উল্টোদিক থেকে সকেট গোখরোর প্রাণখোলা হাসি ভেসে এল। 'বেফিকর রহে তু তিতলি। কাম বন যায়েগা। মগর সাচমুচ মিস করেঙ্গে তুঝকো।'

তেইশে ফেব্রুয়ারি সকালে তিতলি সিমবায়োটিকে ডক্টর কামাথের আন্ডারে ল্যাবরেটরি-অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে জয়েন করল। বিকেল চারটে অবধি ডক্টর কামাথ এই একুশ বছরের তরুণীকে বাজিয়ে দেখলেন এবং সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন। প্রফেসর বসাক তাঁর এই ছাত্রীটি সম্বন্ধে কোনো অতিশয়োক্তি করেননি। এ সত্যিই জিনিয়াস।

শুধু একটা জিনিসকেই তিনি জিনিয়াস দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারছিলেন না। তিতলির মতন একজন সাধারণ গ্র্যাজুয়েট-স্টুডেন্ট কেমন করে জিন ট্র্যান্সপ্ল্যান্টের টেকনিকাল খুঁটিনাটির দিকটায় এতটা পারঙ্গম হয়ে উঠল? এর জন্যে যে সব ইন্সট্রুমেন্টের ব্যবহার করতে হয়, গ্র্যাজুয়েশন-লেভেলের ল্যাবরেটরিতে তো সেসব থাকবারই কথা নয়। অথচ এই তিতলি যাদবের কাছে সেসব মেশিন কিম্বা ইনস্ট্রুমেন্ট মোটেই অপরিচিত নয়। এটা কীভাবে সম্ভব হল?

মনে-মনে শ্রাগ করলেন ডক্টর কামাথ। বোঝাই যাচ্ছে, তাঁদের স্টুডেন্ট-লাইফে যেমন ছিল, তার থেকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক এগিয়ে গেছে।

যাই হোক, দুর্গাপুরের একটা ল্যাবরেটরিতে যে এরকম দক্ষ একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট পাওয়া যাবে এটা ডক্টর কামাথ আশা করেননি। মনে-মনে প্রফেসর বসাককে একটা থ্যাঙ্কস দিলেন তিনি, আর সিমবায়োটিকের ডিরেক্টর শুভময় চ্যাটার্জিকে টেলিফোনে খুব সংক্ষিপ্ত একটা নির্দেশ দিলেন 'রিটেইন দিস গার্ল, দিস তিতলি যাদব, অ্যাট এনি কস্ট। হার সার্ভিস ইজ এসেনসিয়াল ফর মাই রিসার্চ।'

ল্যাবরেটরি থেকে ডিরেক্টরের অফিস ঘুরে তিতলি সেদিন সোজা লেডিজ-হস্টেলে নিজের ঘরে ফিরে এসেছিল। শুভময় চ্যাটার্জি যে স্যালারি এবং পার্কসের কথা তাকে বলেছিলেন, অন্তত পাঁচ বছর চাকরি না করলে সিমবায়োটিকের মতন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে সেই বেনিফিট পাওয়া যায় না। তিতলি মনে-মনে একটু হেসেছিল। এর পিছনে যে ডক্টর কামাথের রেকমেন্ডেশন কাজ করছে সেটা বুঝতে তার দেরি হয়নি।

কিন্তু এই সাফল্যকে সে ঠিকমতন উপভোগ করতে পারছিল না। তার কারণ, দিনটা ছিল তেইশে ফেব্রুয়ারি। রাত দশটার পর সকেট গোখরোর হাতে সুরেশ সিং-এর কোতল হওয়ার কথা।

দশটার পর থেকেই তিতলি ছটফট করতে শুরু করল। সকেট গোখরোর ফোনটা এবার আসার কথা নয়? কিন্তু না। ফোন এল না। সারা রাত জেগে রইল তিতলি। ভোরের দিকে অবশেষে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, তার নিরাপত্তার কথা ভেবেই গোখরো তাকে তার মোবাইলে ফোন করছে না। মোবাইলের কল থেকে

দুজনের যোগসাজশের কথা ধরা পড়ে যায়। এই কথাটা মাথায় আসার পর সে একটু শান্ত হল এবং তারপর ঘণ্টা চারেকের জন্যে ঘুমোতে পারল।

## চার

কথামতন ঠিক একদিন বাদেই বিপ্রদাস সিমবায়োটিকের ডিরেক্টর শুভময় চ্যাটার্জির অফিসে হাজির হল। না গেলেও ক্ষতি ছিল না। সি. সি. টিভি-র ফুটেজের কপি লোক দিয়ে আনিয়ে নেওয়া যেত। বিজ্ঞানী প্রদীপ কামাথের সিভি তো ওনারা মেল করেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবু বিপ্রদাস নিজেই জিপ নিয়ে গেল ওখানে। ওর সিক্সথ সেন্স ওকে বলছিল যাওয়াটা প্রয়োজন।

এই সিক্সথ সেন্সের ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। বিপ্রদাস বইয়ে পড়েছে, বাঘ-শিকারে গিয়ে অনেক শিকারিই সিক্সথ সেন্সের নির্দেশ মান্য করে বাঘের আক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছেন। কিছুই না, একটা অজানা অস্বস্তি। যেখানে বসে শিকারি বাঘের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন সেখান থেকে অকারণেই একটু এগিয়ে যাওয়া এবং তার পরেই ঠিক যে জায়গটায় তিনি দু-সেকেন্ড আগে বসেছিলেন, সেইখানে মানুষখেকো বাঘের লাফিয়ে পড়া।

এর আগে বেশ কয়েকটা কেসে বিপ্রদাস নিজেও সিক্সথ সেন্সকে গুরুত্ব দিয়ে ভালো ফল পেয়েছে।

গাড়িতে যেতে-যেতে বিপ্রদাস ভাবছিল, হয়তো পুরোটাই সিক্সথ সেন্স নয়। প্রদীপ কামাথ নামের ওই লোকটার অমন জড়ভরতের মতন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা, তারপর হঠাৎই অদৃশ্য কারুর কাছে সারেন্ডার করার মতন হাবভাব—এইগুলোই হয়তো তার মনের অস্বস্তিটাকে বাড়িয়ে তুলছে। রিপোর্টে সে মৃত্যুর কারণ লিখতে পারে—আত্মহত্যা। কিন্তু আত্মহত্যার কারণ লিখতে পারবে কি?

দ্বিতীয়দিন সিমবায়োটিকের অফিসে বসে এই প্রশ্নটাই সে শুভময় চ্যাটার্জিকে করল, 'মিস্টার কামাথ কেন সুইসাইড করলেন বলতে পারবেন?'

শুভময় চ্যাটার্জি মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন, 'আই হ্যাভ নো আইডিয়া মিস্টার মণ্ডল।'

হঠাৎই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল বিপ্রদাসের। এরা কি ভাবছে সে নিছক সময় কাটানোর জন্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে? সামনে খুলে রাখা প্রদীপ কামাথের পার্সোনাল ফাইলটায় চোখ রেখে সে বলল, 'একজন মানুষ প্রায় ছ'মাস আপনাদের সঙ্গে এক ছাদের তলায় বাস করেছেন। ছুটিতে গেছেন মাত্র দুবার, সব মিলিয়ে পনেরো দিন। এই সময়ের মধ্যে তিনি আর্থিক দিক থেকে কারুর কাছে চিটেড হয়েছেন কিনা, ওঁর গবেষণায় কোনো ফেইলিওর এসেছে কিনা, ওঁর কোনো অ্যাডিকশন ধরা পড়েছিল কিনা, ওঁর ওঁর কোনো অ্যাফেয়ার তৈরি হয়েছিল কিনা—এসব সম্বন্ধে যদি আপনার না আইডিয়া থাকে, তাহলে কার আইডিয়া থাকবে মিস্টার চ্যাটার্জি?'

বিপ্রদাসের গলায় অসন্তোষের সুরটা ধরতে অসুবিধে হল না শুভময় চ্যাটার্জির। তিনি তাড়াতাড়ি টেবিলের ওদিক থেকে হাত বাড়িয়ে বিপ্রদাসের হাতটা ধরে বললেন, 'স্যরি মিস্টার মণ্ডল। আমি আসলে নিজেই খুব ফ্রাস্ট্রেটেড। এই প্রশ্নটা তো শুধু আপনিই আমাকে করছেন না। প্রেস, মিডিয়া, আমার কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাবাভ অল কামাথের ফ্যামিলি, সবাই আমাকে জিগ্যেস করছে, হ্যাভ ইউ এনি আইডিয়া? হ্যাভ ইউ এনি আইডিয়া? অ্যান্ড আই হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাটঅল।

'আপনি যে পসিবিলিটি-গুলোর কথা বললেন, তার একটারও যদি উত্তর হত 'হ্যাঁ', তাহলে আমি হয়তো একটু স্বস্তি পেতাম। কিন্তু না। কামাথ ওয়াজ ফিনানসিয়ালি ভেরি স্ট্রং। হি হ্যাড টু বি। কারণ, আপনি ওর ডসিয়ার দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, ও ঠিক কলেজে পড়ানো বৈজ্ঞানিক ছিল না। গত কুড়ি বছর ধরে ও এমন সব জিনিস নিয়ে রিসার্চ করেছে যেগুলোর ইমেন্স ইকনমিক ইমপ্যাক্ট রয়েছে। ধরুন পেট্রোলিয়ামের

অলটারনেটিভ। কিম্বা ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জাদুকর ছিল কামাথ। আর সেইজন্যেই নানান মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ওকে যে রিটেনশন-মানি দিত সেটা অনেকের কাছেই অকল্পনীয়।

'আর কোন পসিবিলিটির কথা বলছিলেন যেন? হ্যাঁ, ফেইলিওর ইন ওয়ার্ক। ওটা সায়েন্টিস্টদের কাছে কোনো ব্যাপার নয়। একশোটা রাস্তায় এগিয়ে নিরানব্বইটায় ধাক্কা খাবে, একটায় সাকসেস আসবে। এটাই নিয়ম।

'আর অ্যাফেয়ার? না। কামাথের জীবনে একটাই ভালোবাসা ছিল, অ্যান্ড দ্যাট ওয়জ ফর মানি। টাকা টাকা টাকা। টাকার চেয়ে বেশি আর কিছুই ভালোবাসত না কামাথ। হি ওয়জ ট্যালেন্টেড, বাট অ্যাট দা সেম টাইম হি ওয়জ আ মারসিনারি। ও টাকার জন্যে কাজ করত। এ ব্যাপারে ওর কোনো লুকোছাপা ছিল না।

'তাহলে হাতে কী রইল মিস্টার মণ্ডল? জিরো। আ বিগ জিরো। কামাথের কোনো দুঃখ কিম্বা অভাব ছিল না, তবুও সে সুইসাইড করল।'

শুভময় চ্যাটার্জি দু-হাতের মধ্যে মুখ ঢাকলেন।

এবার বিপ্রদাস সান্ত্বনার ভঙ্গিতে ওঁর হাতের ওপর হাত রাখল। বলল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি! যদি ওঁকে কেউ আত্মহত্যার জন্যে প্ররোচিত না করে থাকে, তাহলে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের আর খুব বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। মানুষ অনেক সময় খুব তুচ্ছ কোনো দুঃখকেই বিরাট বড় করে দেখে। সাময়িক একটা আবেগ থেকে ট্রেনের চাকার সামনে ঝাঁপ মেরে দেয়, বিষ খায়। সেক্ষেত্রে তো কিছু করার থাকে না। মিস্টার কামাথের কেসটা হয়তো ওইরকমই কিছু। বাই দা ওয়ে, একটা জিনিস আমাকে একটু বলবেন? অবশ্যই যদি আপনাদের কোনো মন্ত্রগুপ্তির ব্যাপার না থাকে।'

মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে শুভময় চ্যাটার্জি বললেন, 'পুলিশের কাছে আবার মন্ত্রগুপ্তি কী মশাই? বলুন, কী জানতে চাইছেন।' 'সিমবায়োটিকে ওঁর মিশনটা কী ছিল?'

'অ্যান্টি-ইনফার্টিলিটি। জানেন কি, রিসেন্টলি একটা সেক্টরের ছেলেদের মধ্যে ইমপোটেন্সির গ্রাফ চড় চড় করে ওপরদিকে চড়ছে? আই মিন আই. টি. সেক্টর। ওদের লাইফ-স্টাইল আর ওদের ডেইলি রুটিন এমন উদ্ভট-রকমের বাজে যে, ব্যাটারা বাপ হতে পারছে না। আপনি জানেন ওদের লাইফ স্টাইল?'

বিপ্রদাস বলল, 'একটু-একটু জানি। রাস্তায় যেতে-আসতে গলায় কার্ড-ঝোলানো ছেলেগুলোকে দেখে বুঝতে পারি। তবু আপনিই বলুন না। একজন সায়েন্টিস্টের অ্যাঙ্গেল থেকে ব্যাপারটা বুঝি।'

'কে সায়েন্টিস্ট? আমি? ধুর মশাই!' শুভময় চ্যাটার্জি মুখ বেঁকালেন। 'অনেক বছর আগে বিজনেস-ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স করেছিলাম। সেসব ভুলেও গেছি।'

বিপ্রদাস মনে মনে বলল, 'বয়সের দোষ, বেশি কথা বলা।' মুখে বলল, 'তাহলে অন্যদের কাছ থেকে যা শুনেছেন সেটাই বলুন।'

'শুনেছি, আই-টি সেক্টরের ছেলেগুলো নাকি দিনে দশঘণ্টা টাইট প্যান্ট আর আন্ডারগার্মেন্টস পরে ঠায় কম্পিউটারের সামনে বসে থাকে। এতে টেস্টিকলসের ওপর যা-তা রকমের চাপ পড়ে। তা ছাড়া রাত জাগা, ফাস্ট-ফুড খাওয়া, স্মোকিং, ড্রিঙ্কিং, এসব তো আছেই। তারপর ওরা সাধারণত বিয়েটাও করে বেশি বয়সে। ফলে ওদের স্পার্মগুলো আর সেরকম চাঙ্গা থাকে না। আচ্ছা, আপনি শুনেছেন, স্পার্ম-সেলগুলোর মধ্যে একটা রেস হয়?'

বিপ্রদাস ওপর নীচে ঘাড় নাড়ল। বলল, 'শুনেছি। একটা ডিম্বাণু-কে পেনিট্রেট করার জন্যে কোটি-কোটি শুক্রাণু যোনির মধ্যে দিয়ে, জরায়ু পেরিয়ে, ফ্যালোপিয়ান টিউবের দিকে ছুটে চলে। সাঁতার কেটে চলেই বলা ভালো, কারণ ওদের তো পা নেই যে ছুটবে। শুক্রাণুগুলোর চেহারাটা ঠিক ব্যাঙাচির মতন। ল্যাজ নাড়তে নাড়তে দৌড়ায়। যে ফার্স্ট হয় তার কপালে জোটে বরমাল্য।'

'ও বাবা, আপনি তো অনেকটাই জানেন! বায়োসায়েন্স?'

'হ্যাঁ। জাস্ট গ্র্যাজুয়েট। তা-ও পাশ কোর্সে।'

'তাহলে যে স্পার্মগুলো সেকেন্ড হয়, কিম্বা থার্ড, তারা কেন ওভাম-কে পেনিট্রেট করতে পারে না তাও নিশ্চয় জানেন?'

'জানি। একটা স্পার্মসেল ওভামের দেওয়াল ছ্যাঁদা করে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া মাত্র, দেওয়ালটার চেহারাই বদলে যায়। যেটা এতক্ষণ ছিল নরম-সরম, সেটাই হয়ে যায় পাথরের মতন শক্ত। ফলে, নো সেকেন্ড এন্ট্রি। ওনলি দা ফার্স্ট কাস্টমার উইল বি সার্ভড।'

শুভময় চ্যাটার্জি বললেন, 'রাইট। আরো অনেক ব্যাপার আছে। প্রদীপ কামাথের সঙ্গে একদিন ড্রিঙ্ক করতে বসেছিলাম। সেদিন ও বেশ মুডে ছিল। গল্প করতে-করতে এসব বুঝিয়েছিল। বলেছিল, স্পার্মের আয়ুও বাঁধা। দু'দিন না কত যেন। তার মধ্যেই ওদের ফিনিশিং-লাইনে পৌঁছতে হয়। কামাথের প্রোজেক্ট ছিল ওই স্পার্মের লাইফ-স্প্যান আর স্পিড নিয়ে। বলেছিল, স্পার্ম-সেলের মাইটোকনড্রিয়াগুলোকে মডিফাই করে এই কাজটা করা সম্ভব, কারণ মাইটোকনড্রিয়াই স্পার্ম-সেলকে শক্তি জোগায়।'

বিপ্রদাস প্রশ্ন করল, 'ওঁর সেই কাজ শেষ হয়েছিল কি না বলতে পারবেন?'

'না, হয়নি। আমি কাল রাতেই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের ইলিনয়ের হেড অফিসের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। কামাথ হেড অফিসে শেষ রিপোর্ট পাঠিয়েছিল তিনমাস আগে। তাতে দেখা যাচ্ছে, কাজের অগ্রগতি কিছুই প্রায় হয়নি। তার পরে কামাথ আর কোনো রিপোর্ট পাঠায়নি।'

'উনি কি মান্থলি রিপোর্ট পাঠাতেন?'

'হ্যাঁ।'

'শেষ তিনটে রিপোর্ট পাঠালেন না কেন? এনি গেস?'

শুভময় চ্যাটার্জি দু-পাশে মাথা নাড়লেন।

বিপ্রদাসের মাথার মধ্যে সিক্সথ সেন্সের সেই অ্যালার্মটা হঠাৎই বেশ জোরালো আওয়াজ করে বাজতে শুরু করল। তবু মুখের ভাব একচুল না পালটে সে খুব শান্তগলায় প্রশ্ন করল, 'ওঁর এখানকার কাজের প্রগ্রেসের ব্যাপারে দু-একটা কথা যদি জানতে চাই, কার সঙ্গে কথা বলতে হবে? ওঁর কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন না?'

শুভময় চ্যাটার্জি একবার আড়চোখে বলরাম রায়ের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'দেখুন স্যার, আপনি একটা সরকারি এনকোয়ারিতে এসেছেন। আপনার কাছে কিছু লুকোনোটা অপরাধ। কিন্তু প্লিজ, যা বলছি সেটা অফ দা রেকর্ড নেবেন।'

বিপ্রদাস শুভময় চ্যাটার্জির হাবভাব দেখে অবাক হল। বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'দাঁড়ান, বলছি।' শুভময় চ্যাটার্জি সামনের টেবিলে রাখা জলের গ্লাস থেকে এক চুমুক জল খেয়ে বললেন, 'দেখুন মিস্টার মণ্ডল, কামাথের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল ঠিকই। তিতলি যাদব। কলকাতার মেয়ে। প্রথম থেকেই, মানে গত ফেব্রুয়ারি-মাস থেকেই সে ডক্টর কামাথের আন্ডারে কাজ করছিল। কিন্তু তিনমাস আগে থেকে সে অ্যাবস্কন্ডিং। পালিয়েছে। আমরা আর ওকে ট্রেস করতে পারছি না।'

বিপ্রদাসের চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠল। সে বলল, 'কিছু নিয়ে পালিয়েছে? কোনো ইনফর্মেশন? কোনো গ্যাজেট?'

'না না। সেটাই তো আরো আশ্চর্যের ব্যাপার। উল্টে আমাদের কাছেই মেয়েটার শেষ তিন-মাসের স্যালারি রয়ে গেছে। ফোন করছি, সুইচড অফ। মেল করছি, ডেলিভারড হচ্ছে না। অ্যাকাউন্ট ডিলিট করে দিয়েছে মনে হয়।'

'বাড়ির ঠিকানা? লোক পাঠিয়েছিলেন?'

'পাঠিয়েছিলাম। ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সব জায়গাতেই দমদমের পটারি বস্তির ঠিকানা রয়েছে। সেখানে একজন মেসেঞ্জার গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, অনেকদিন আগেই তিতলি ওখান থেকে অন্য

কোথাও শিফট করে গেছে।'

'তাহলে আমাদের জানালেন না কেন? একটা মিসিং-ডায়েরি করা উচিত ছিল না?' বিরক্ত গলায় বলল বিপ্রদাস।

'জানাতাম নিশ্চয়। সবে তো তিনমাস হয়েছে। ফ্র্যাঙ্কলি, ডক্টর কামাথের এই মিসহ্যাপটা ঘটে না গেলে তিতলিকে নিয়ে আমাদের কীসের মাথাব্যথা ছিল বলুন তো! পালিয়েছে পালিয়েছে। ওরকম তো কতজন চাকরি ছেড়ে চলে যায়। পরে হয় নিজেরাই সে-কথা জানায় কিম্বা আমরা তাকে স্যাক করি।'

বিপ্রদাস ভেবে দেখল, মিস্টার চ্যাটার্জির কথায় যুক্তি আছে। তবু আগের মতন কঠিন-গলাতেই বলল, 'তিতলি যাদবের পার্সোনাল-ফাইলটা আমাকে কপি করে দিন।'

ফাইলটা হাতে নিয়ে বিপ্রদাস সিমবায়োটিকের ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে এল। ঘড়ি দেখল, বিকেল সাড়ে-তিনটে। ড্রাইভার সুজিতকে বলল, 'থানায় চল।'

থানার দালানে পা রাখতে না রাখতেই ডিউটির হাবিলদার স্যালুট ঠুকে বলল, 'ও.সি. সাহেব বলেছেন, আপনাকে একবার দেখা করতে।'

বিপ্রদাস নিজের কামরায় না ঢুকে মাইতিসাহেবের চেম্বারেই ঢুকে পড়ল। সাহেব একাই ছিলেন। বিপ্রদাসকে দেখে গম্ভীর-গলায় বললেন, 'কী ব্যাপার বলো তো মণ্ডল। সিমবায়োটিকের কেসটা নিয়ে এখনো পড়ে আছ কেন? ওটা তো পেটি সুইসাইডের কেস। ছাড়ো এবার। অন্য কাজে হাত দাও।'

বিপ্রদাসের ভুরুদুটো কুঁচকে গেল। বলল, 'আপনার ওপর প্রেসার আসছে?'

মাইতিসাহেব হেসে ফেললেন। বললেন, 'বসো। হ্যাঁ, প্রেসার আসছে। তুমি মিস্টার কামাথের ল্যাবরেটরি সিল করে রেখেছ?'

বিপ্রদাস ঘাড় হেলাল।

'ওরা কমপ্লেন করেছে, তাতে ওদের কাজের অসুবিধে হচ্ছে। তাছাড়া কমপ্লেক্সের মধ্যে পুলিশের আনাগোনায় কর্মচারীদের মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি হচ্ছে। কমপ্লেনগুলো আমার কাছে আসেনি; ডাইরেক্ট হেড-কোয়ার্টারে গেছে। সিমবায়োটিকের মতন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিদের হাত অনেক লম্বা হয় মণ্ডল।'

বিপ্রদাস মাইতিসাহেবের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমাকে আর দুটো দিন সময় দিন স্যার। কিছু-কিছু ব্যাপার আমার অস্বাভাবিক লাগছে। সেগুলোর উত্তর পেয়ে গেলেই আমি হাত গুটিয়ে নেব।'

সুধীর মাইতির মুখ থেকে এতক্ষণের ক্যাজুয়াল-ভাবটা উধাও হয়ে গেল। তিনি বিপ্রদাসকে চেনেন। জানেন, এ-ছেলে বুনো হাঁসের পিছনে দৌড়োয় না। জানের তোয়াক্কাও করে না। তিনি ওর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'কোন ব্যাপারগুলো অস্বাভাবিক লাগছে?'

'যেমন আত্মহত্যা করার ঠিক আগে ডক্টর কামাথের আচরণ। যেমন গত তিন-মাস ওঁর কাজের রিপোর্ট না পাঠানো। আবার ঠিক ওই তিন মাস আগেই ওঁর রিসার্চ-অ্যাসিস্ট্যান্ট তিতলি যাদবের অন্তর্ধান। তার সঙ্গে আরো একটা এইমাত্র যোগ করলাম ইনভেস্টিগেশন বন্ধ করার জন্যে আপনার ওপর চাপ।'

সুধীর মাইতি সোজা হয়ে বসলেন। বেশ অবাক-গলায় প্রশ্ন করলেন, 'ওঁর রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট পালিয়েছে? নামটা কী বললে? তিতলি? তার মানে মহিলা? তোমার হাতে ওটা কী, তিতলির পার্সোনাল ফাইল?'

বিপ্রদাস ফাইলটা সসম্ভ্রমে মাইতিসাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'হ্যাঁ স্যার।'

একবার দ্রুত ভেতরের কাগজগুলোর ওপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাইতিসাহেব বললেন, 'এটা এখন আমার কাছেই থাক। আর তুমি ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে যাও। ওসব চাপ-টাপ আমি সামলে নেব। কেউ তোমাকে কাজ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করলে বলবে আমার সঙ্গে কথা বলতে।'

বিপ্রদাস নিজের চেম্বারে ঢুকে অন্যান্য কিছু রুটিন-ওয়ার্ক সেরে সন্ধে সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ নিজস্ব দু-চাকায় বাড়ির দিকে রওনা হল। বাড়ি থেকে বেশিরভাগ দিন এই মোটর-সাইকেলটাতেই ও যাতায়াত করে। মাঝের সময়টায় ইনভেস্টিগেশনের কাজে থানার গাড়ি ব্যবহার করে।

থানা থেকে বেরিয়ে ওর বাড়ির দিকে যেতে হলে মাঝে একটুকরো জঙ্গল পড়ে। ইস্পাত-নগরী গড়ে উঠবার আগে দুর্গাপুরে যে গহন শালবন ছিল, তার স্মৃতি হিসেবে এখন এইটুকুই অবশিষ্ট রয়েছে।

জঙ্গলটায় ঢোকার মুখেই, রাস্তার ধারে একজন মাঝবয়সি লোক দাঁড়িয়েছিল। ছোটখাটো চেহারা। খাঁকি হাফহাতা শার্ট আর ছাইরঙের ট্রাউজার। একটা গামছা দিয়ে মাথা আর মুখের অনেকখানি জড়িয়ে রেখেছে। লোকটা বিপ্রদাসকে আসতে দেখেই হাতের বিড়িটা রাস্তার ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাত দেখাল। ওকে থামতে ইঙ্গিত করছে। বিপ্রদাস স্টার্ট বন্ধ না করেই মাটিতে পা রেখে লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল।

লোকটা হাত জোড় করে একটা ছোট্ট নমস্কার ঠুকেই সরাসরি কাজের কথায় চলে এল। বলল, 'আমার নাম সুরেন পালোধি। সিমবায়োটিকে সিকিউরিটি-গার্ডের কাজ করতাম। ওরা আমাকে চাকরি থেকে তাড়িয়েছে।'

শুনেই বিপ্রদাস এক লাথিতে ইঞ্জিন শাট-ডাউন করে, বাইক থেকে নেমে সুরেনবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সে জানে, চাকরি থেকে বরখাস্ত-হওয়া লোকের চেয়ে ভালো ইনফর্মার আর হয় না। কারণ, তারা একদিকে যেমন কোম্পানির ভেতরের অনেক গল্প জানে, অন্যদিকে মনের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন নিয়ে ঘোরে।

ও বলল, 'সে কি! আপনার মতন ভালোমানুষের চাকরি খেল কেন?'

সুরেন পালোধির মুখ দিয়ে ভকভকে মদের গন্ধ ছাড়ছিল। বিপ্রদাসের গলার সহানুভূতিটুকু ওকে তাতিয়ে দিল। গড়গড় করে বলে গেল, 'তাড়াল, কারণ আমি একদিন একটা খারাপ সিন দেখে ফেলেছিলাম। সেদিন নাইট-শিফটে আমি একাই ল্যাবরেটরি-বাড়ির ডেস্কে ডিউটি দিচ্ছিলাম। হঠাৎ বলরাম-স্যার ফোন করে বললেন, কামাথ সাহেবের রুমের সি.সি.টিভি শাটডাউন করে দিতে। আমি দিইনি।'

'কেন? দেননি কেন?' জিগ্যেস করল বিপ্রদাস।

'কেন দেব? নিয়ম হচ্ছে, ল্যাবে কোনো লেডিস-ভলান্টিয়ার ঢুকলে তার সঙ্গে আরেকজন লেডিস অবশ্যই থাকবে। রাখতেই হবে। এটা হচ্ছে হোল-ওয়ার্ল্ডের ট্রোপোকল। ইয়ে...প্রোকোটল। না না, ধুস শালা।'

প্রচণ্ড উত্তেজনায় পালোধি মশাই আসল শব্দটা খুঁজে পাচ্ছিল না। বিপ্রদাস তাঁকে শব্দটা জুগিয়ে দিল 'প্রোটোকল।'

'ইয়েসস। হোল ওয়ার্ল্ডের প্রোটোকল। তাহলে নার্স-দিদিমনি নেমে আসার পরেও ওই তিতলি বলে মেয়েটা কেন রয়ে গেল? সেইটা দেখার জন্যেই সেদিন ক্যামেরা অন করে দিয়েছিলাম।'

বিপ্রদাস বলল, 'আপনি ভলান্টিয়ার কাকে বলছেন? তিতলি যাদব তো ছিল কামাথ সাহেবের রিসার্চ-অ্যাসিস্ট্যান্ট। সে একা থাকবে না তো কি দলবল নিয়ে ঘুরবে?'

'ধুর মশাই!' সুরেনবাবুর মুখটা ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেল। 'এইসব কোম্পানিকে আপনি চেনেন না। একটা মেয়েছেলেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে রাখলে তার ওপর আবার আরেকটা মেয়েছেলেকে ভলান্টিয়ার হিসেবে রাখবে? ওই লিট্টিকে দিয়েই দুটো কাজ করাত, বুঝলেন? এই আমিই যেমন, গার্ডের চাকরিও করতাম আবার হারামখোর বলরাম বললে বাগানের ঘাসও ছাঁটতে হত।'

বিপ্রদাস বলল, 'লিট্টি নয় দাদা, তিতলি। কিন্তু ভলান্টিয়ারের কাজটা কী তা তো বুঝলাম না।'

'আর্টটি...আর্টটিফিসিয়াল ইম স্যানি টেশন কাকে বলে জানেন?'

'আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেসন বলতে চাইছেন কী?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওই হল। ইয়ের বদলে সিরিঞ্জ দিয়ে মেয়েদের গর্ভে পুরুষের বীজ্জ ঢোকানো হয়...বুঝলেন না?'।

বিপ্রদাসের মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। তার মনে পড়ল, ডক্টর কামাথের ল্যাবরেটরির একপাশে একটা সাদা-চাদরে ঢাকা হসপিটাল-কট দেখেছিল বটে। একটা ফ্রিজও ছিল ঘরের মধ্যে। এখন তো মনে হচ্ছে স্পার্মকে প্রিজার্ভ করার জন্যেই ওটা ব্যবহৃত হত। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে বলল, 'আপনি তার

মানে সি.সি.টিভি-তে ওই মহিলার আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশনের দৃশ্য দেখে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেটা এমন কি বড় অপরাধ, যার জন্যে আপনার চাকরি খেতে হল?'

'আজ্ঞে না স্যার।' চোখ বড়-বড় করে বিপ্রদাসের মুখের কাছে মুখ এনে সুরেন বলল, 'আর্টটিফিসিয়াল নয়। একেবারে অজ্জিনাল ইমস্যানিটেশন। মানে, বুঝলেন তো? কামাথ স্যার আর ওই লিট্টি দুজনেই তখন পুরো নাঙ্গা, মানে ন্যুড।'

বিপ্রদাস মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'তারপর?'

'আমি স্যার সেদিন একটু দারু খেয়ে ছিলাম। বেশি নয় স্যার, খুউউব অল্প। তাই ওদের ওইসব করতে দেখে মনে ভারি ফুর্তি হল। আমি সোজা গিয়ে বলরাম স্যারের জামার হাতা টেনে ধরে বললাম, 'স্যার, স্যার! দেখবেন চলুন কী মস্তি হচ্ছে।'

'এবং আপনার চাকরিটা গেল, তাই তো? এটা কবেকার ঘটনা, মনে আছে?'

'হ্যাঁ স্যার। পয়লা মে। আমার নাইট শিফট ছিল।'

বিপ্রদাস মনে-মনে হিসেব করল পয়লা মে থেকে আজ বিশে নভেম্বর। তার মানে প্রায় সাত-মাস হতে চলল। সাতমাস আগেও যে-মেয়ে প্রদীপ কামাথের সঙ্গে বিছানা শেয়ার করত, সে তিনমাস আগে পালাল কেন? এবং ও পালিয়ে যাওয়ার পরে মাঝের এই তিনমাসে এমন কী ঘটল, যার জন্যে প্রদীপ কামাথকে সুইসাইড করতে হল? ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কি?

সুরেনবাবুর গলার আওয়াজে বিপ্রদাসের হুঁশ ফিরল। 'তিতলি মেয়েটা ডেঞ্জারাস। আমি আপনাকে বলছি স্যার, ওর চোখের দিকে তাকালে আপনার গা শিরশির করবে। আপনি চোখ সরাতে পারবেন না। ও কামাথ স্যারকে ফাঁসিয়েছিল। এই যে কামাথ স্যার সুইসাইড করলেন, এর পেছনেও ওই মেয়েটারই হাত আছে। আর ওকে হেল্প করছে বলরাম রায়। আপনি সিমবায়োটিকের কেসটা ধরেছেন জানতে পেরেই মনে হল আপনাকে বলে যাই, ওই মেয়েটাকে তুলুন। তুলে থার্ড ডিগ্রি দিন। সব বেরিয়ে আসবে।'

বিপ্রদাসের মুখ থেকে আরেকটু হলে বেরিয়ে যাচ্ছিল, 'থাকলে তো অ্যারেস্ট করব।' কোনোরকমে সামলাল। তারপর সুরেনকে জিগ্যেস করল, 'আপনি এখন কী করবেন বলে ভাবছেন?'

'দেশের বাড়িতে চলে যাব স্যার পুরুলিয়ায়। আবার চাষবাস শুরু করব। ছ'মাস ধরে চেষ্টা করেও এখানে আর কোনো কাজ জোগাড় করতে পারলাম না।'

বিপ্রদাস বলল, 'সেই ভালো। আমাকে বরং আপনার ফোন নম্বরটা দিয়ে যান। আর আমার নম্বরটাও রেখে দিন। আমি সময়মতন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব।'

সুরেনবাবু ফোন নাম্বার নিয়ে চলে যাওয়ার পরেও কয়েক মিনিট বিপ্রদাস ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। শালবনের মধ্যে খুব দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছিল। এখন কোথায় যাবে বিপ্রদাস?

মন চাইছিল বাড়ি যেতে।

আজ বিশে নভেম্বর। টুনাইয়ের আজ জন্মদিন। প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভাইঝিটা অপেক্ষা করে বসে আছে, কখন কাকুমণি একটা মস্ত বড় কেক আর গিফট নিয়ে বাড়ি ফিরবে। বাড়ি ফিরে কাকুমণি আগে শিকলি আর বেলুন দিয়ে ঘর সাজাবে। তারপর টুনাইয়ের বন্ধুরা আসবে। ওদের সবাইকে নিয়ে কাকুমণি খেলা শুরু করবে। কেক কাটার সময়ে কাকুমণিই গলা ছেড়ে 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ' গাইবে। টুনাইয়ের এই সব ইচ্ছের কথা জানে বিপ্রদাস।

অন্যদিকে রয়েছে সিমবায়োটিকের ক্যাম্পাস। একটা সিলড ল্যাবরেটরি, যেখানে তিন-দিন আগে এক বিশ্ববিখ্যাত গবেষক সুইসাইড করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে যে-আত্মহত্যার পেছনে কোনো স্পষ্ট কারণ নেই, কিন্তু অসঙ্গতি রয়েছে অনেক। সে কি তাহলে এখন ওই ইনস্টিটিউটতেই যাবে? শুভময় চ্যাটার্জির কাছে সরাসরি জানতে চাইবে, তিতলি যাদবের ভূমিকাটা ঠিক কী ছিল? রিসার্চ-অ্যাসিস্ট্যান্ট? ভলান্টিয়ার? কামাথের দেহসঙ্গিনী?

নাকি হুট করে এরকম কিছু করে বসার আগে আবার একবার থানাতেই ফিরে যাবে? মাইতি-সাহেবকে খুলে বলবে সবকিছু? পুলিশের নিজস্ব মেশিনারি কাজে লাগিয়ে আগে যতটা সম্ভব ইনফর্মেশন সংগ্রহ করে নিয়ে, তারপর সিমবায়োটিক-কে চার্জ করবে?

শেষমেষ বিপ্রদাস বাড়ি যাবে বলেই ঠিক করল। এক-রাতের মধ্যে সিচুয়েশন এমন কিছু বদলে যাবে না।

বাইক স্টার্ট করার আগে সে একবার বউদিকে ফোন করল, 'টুনাই কী যেন একটা কেকের নাম বলেছিল বলো তো, ওর যেটা ফেবরিট।'

## পাঁচ

সন্ধে সাড়ে আটটা। মোটামুটি যে-সময়ে টুনাই তার ছোট্ট হাতে প্লাস্টিকের ছুরি নিয়ে কেক কাটতে শুরু করল আর তার মতনই অনেকগুলো বাচ্চা বিপ্রদাসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে শুরু করল 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ ডিয়ার তৃণাঞ্জনা', সেই সময়েই তিতলি দেওয়াল-আলমারিটার পাল্লা খুলে, জামাকাপড়ের স্তূপ সরিয়ে, হাতটাকে বাড়িয়ে দিল আরো ভেতরে।

বাড়িটা জরাজীর্ণ, তাই ঠিক ওই-জায়গাটায় দেওয়ালের একটা ইট সরিয়ে ফেলতে তিতলির অসুবিধে হয়নি। এই বাড়িটায় ঢোকার পর প্রথমদিনেই গোপন ওই খুপরিটা বানিয়ে নিয়েছিল তিতলি।

ঠিক এরকমই একটা গোপন খুপরি ছিল তার পটারি-বস্তির ঘরে, দেওয়াল-আলমারির জামাকাপড়ের পেছনে। সুরেশ সিং বেহুঁশ হয়ে পড়লে মাঝেমাঝে ওর পকেট থেকে পয়সাকড়ি সরাত তিতলি। সেগুলো ওই খুপরির মধ্যে রেখে দিত সে।

ফুলবাগানের ফ্ল্যাটে দেয়াল ছিল খুব শক্তপোক্ত, তাই সেখানে তিতলি তার মূল্যবান জিনিসগুলোকে রাখত সোফার মোটা ফোমের গদির ভেতরে। তখন টাকাপয়সা আর গয়নাগাটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটা ষোলো জিবির পেনড্রাইভ।

ফুলবাগান থেকে সিমবায়োটিকে আসার পর মেয়েদের হস্টেলে সে যে-ঘরটা পেয়েছিল, সেখানে স্টিলের লকার ছিল। কম্বিনেশন-লক লাগানো লকার। তাই এসব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়নি। জিনিসগুলোকে সে ওই লকারেই রাখত। ততদিনে পেনড্রাইভের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরো দুটো জিনিস—

খুব স্লিক ডিজাইনের তিন ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চির একটা ক্রোমিয়াম প্লেটেড চ্যাপ্টা বাক্স। ওটা অরিজিনালি তাবাক ব্লন্ড পারফিউমের কৌটো। কাস্টমসের এক বড়কর্তা, যে সুরেশ সিং-এর মেহমান হওয়ার সুবাদে প্রায়ই তাকে ভোগ করত, সে তাকে ওই পারফিউমের সেটটা গিফট করেছিল। তিতলি পারফিউমের শিশি দুটো ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু কৌটোটা যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। সিমবায়োটিকে আসার পরে ওটা ঠিক যেভাবে ভেবেছিল, সেইভাবেই তার কাজে লেগেছে। এখন ওটার মধ্যে রয়েছে তিনটে কাচের ভায়াল আর একটা ছোট সিরিঞ্জ।

দ্বিতীয় যে জিনিসটা তার গোপন সম্পদের তালিকায় যুক্ত হয়েছে, সেটা হল একটা আই-ফোন থার্টিন। এটাও তিতলির নিজের পয়সায় কিনবার ক্ষমতা হয়নি; ফুলবাগান থেকে পাততাড়ি গোটাবার সময় মরিয়া হয়ে জোগাড় করেছে। যিনি দিয়েছিলেন, তাঁকে এই রাজ্যের অনেকেই চেনে। কারণ, তুমুল স্মার্ট, সুদর্শন এবং মাঝবয়সি ওই ডাক্তারবাবু প্রায়ই টেলিভিসনে নানান আলোচনাসভায় যোগ দেন। ডাক্তারবাবুর শর্ত ছিল, তিনি সঙ্গমের আগে তিতলির পিঠে সিগ্রেটের ছেঁকা দেবেন। চেঁচানো চলবে না। তিতলি শর্তটা মেনে নিয়েছিল এবং পারিশ্রমিক হিসেবে ওই আই-ফোনটা পেয়েছিল।

আই-ফোনটা তিতলি কারুর চোখের সামনে ব্যবহার করে না। ওটা শুধু হ্যাকিং-এর কাজে লাগে।

হালকা-পাতলা ওই কৌটো, অ্যাপল ফোন এবং পেনড্রাইভ এই তিনটে জিনিস তিতলি কখনোই কাছছাড়া করত না। বাইরে বেরোলে ও জিনিসগুলোকে অন্তর্বাসের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে বেরোত।

সেদিনও জিনিসগুলোকে সঙ্গে নিয়েই সে সিমবায়োটিকের ক্যাম্পাসের বাইরে বেরিয়েছিল। ভাগ্যিস সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল। তাই তো ওগুলো এখনো তার কাছে আছে।

সিমবায়োটিকে তার ঘর, তার ফেলে আসা লকার, সবকিছুই নিশ্চয়ই এই তিনদিনের মধ্যে পুলিশের লোকেরা তোড়ফোড় করে দেখেছে। না দেখলে দু-একদিনের মধ্যেই দেখবে। তবে দেখলেও তিতলির কিছু যায়-আসে না। জামাকাপড়, বইখাতা আর গর্ভনিরোধক পিলের মতন নিরীহ কিছু জিনিসের বাইরে আর কিছুই পাবে না ওরা।

তিতলি একবার দেওয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। সবে সন্ধে সাড়ে-আটটা। বিল্টুবাবু রাত দশটার আগে কোনোদিনই আসেন না। কাজেই এখন সে কিছু কাজ সেরে নিতে পারে।

সে ধীরেসুস্থে ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে সাঁটিয়ে-রাখা চৌকিটার ওপরে একটা ল্যাপটপ খুলে বসল। ল্যাপটপ-টা সস্তার জিনিস, এখানে আসার পরে কিনেছে। এটাকে তিতলি স্লেটের মতন ব্যবহার করে। স্লেট থেকে চকখড়ির দাগ মোছবার মতন করে, এই ল্যাপটপ থেকে ও প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন ডিলিট করে দিয়ে ওঠে। যদি কিছু সেভ করে রাখবার প্রয়োজন হয় স্টোর করে রাখবার প্রয়োজন হয় তার জন্যে রয়েছে আই-ফোন কিম্বা পেনড্রাইভ।

সমস্যা হয় অন্য জায়গায়। সমস্যা করে তার নিজের স্মৃতিগুলো। নানান অপমান আর যন্ত্রণার স্মৃতি। ভাগ্যের কাছে বারবার হেরে যাওয়ার শোক। কাজ করতে বসলে তিতলির প্রথমে কিছুক্ষণ নিজের মনকে শান্ত করতে সময় লাগে। তারপর সে কাজ শুরু করতে পারে।

আজও তিতলির মনে পড়ছিল সদ্য পিছনে ফেলে আসা ঘটনাবহুল নটা মাসের কথা।

দুর্গাপুরে রওনা হবার আগে সে ফুলবাগানের ফ্ল্যাটটাকে সাঁওতালবাড়ির উঠোনের মতন নিকিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে বেরিয়েছিল, যাতে কেউ তার চিহ্ন না খুঁজে পায়। এমনিতে ওই ফ্ল্যাটের মালিকানা থেকে ইলেক্ট্রিক-মিটার, গ্যাসের কানেকশন সবই ছিল সুরেশ সিং-এর এক চাকরের নামে। কাজেই ওই ফ্ল্যাটের সঙ্গে তিতলির যোগাসূত্র খুঁজে বার করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

একমাত্র যার কাছ থেকে কেউ কিছু জানতে পারত, সেই সুরেশ সিংকে যে গোরখনাথ সেদিন রাত্রেই হাপিস করে দেবে, সে-ব্যাপারে তিতলির সন্দেহ ছিল না। পটারি-বস্তিতে থাকার সময় সে অনেকবার এরকম জলজ্যান্ত ইনসানকে হাপিস হয়ে যেতে দেখেছে। ওটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

তাই যদি হয়, তাহলে অংশুমান ছাড়া আর কে তাকে খুঁজবে? আর অংশুমানের দম তার জানা ছিল। ও প্রেমিকা হারিয়ে যাওয়ার শোকে ছাদে উঠে তারা গুনতে পারে, দুটো কবিতা লিখতে পারে। কিন্তু থানা-পুলিশ করা কিম্বা তিতলির সহপাঠী অথবা হেড অফ দা ডিপার্টমেন্টের কাছে গিয়ে তিতলির খোঁজ নেওয়ার দম ওর যে হবে না সেটা তিতলি জানত। এমনিতেই ও অত্যন্ত আনস্মার্ট একটা লোক; তার ওপরে রিসেন্টলি তিতলি ওকে দিয়ে যে পাপকাজটা করিয়েছিল, তারপর থেকে ধরা পড়ার ভয়ে একেবারে শামুকের মতন নিজেকে খোলশের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছিল অংশুমান।

অংশুমান মানে অংশুমান দত্ত। বায়োসায়েন্স ডিপার্টমেন্টের কেয়ারটেকার... তখনো অবধি যে ছিল তিতলির সবচেয়ে বড় মুরগি। সামান্য শরীরের ছোঁয়াতেই যে তার জন্যে হাট করে খুলে দিয়েছিল অ্যাডভান্সড ল্যাবরেটরির দরজা। দিনের পর দিন অংশুমানের ঠোঁটে একটা চুমু দিয়ে, নিজের ব্লাউজের মধ্যে ওর হাতদুটো একবার ঢোকাতে দিয়ে, বদলে তিতলি ওর কাছ থেকে চাবি নিয়ে ঢুকে গেছে সায়েন্স-কলেজের রিসার্চ-ফেলোদের জন্যে সংরক্ষিত ল্যাবরেটরিতে। হ্যাক করেছে একের পর এক কম্পিউটারের ক্ল্যাসিফায়েড ডাটা।

সিমবায়োটিকে জয়েন করার পরে প্রদীপ কামাথ ওকে অনেকবার আড়েঠাড়ে জিগ্যেস করেছে এসব ইনস্ট্রুমেন্টের সঙ্গে ও কোথায় পরিচিত হল? কোথায় পেল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারের হদিশ? প্রত্যেকবারই তিতলি তানা-না-না করে কাটিয়ে গেছে। আসল উত্তরটা ছিল ওই বেওকুফ অংশুমানের কাছে। সবচেয়ে হাসির কথা, অংশুমান ভাবত তিতলি ওর প্রেমে পড়েছে চল্লিশোর্ধ সংসারী মানুষ অংশুমান দত্তের প্রেমে!

একা অংশুমানকে দোষ দেওয়া যায় না অবশ্য। তিতলি জানে, ওর চোখেমুখে এমন একটা গ্রাম্য সরলতা ছিল, যা দেখে অনেক পুরুষমানুষই ভেবে নিত যে, তাকে ইমপ্রেস করা খুব সহজ। অংশুমানও সেই একই ভুল করেছিল। বেচারা অংশুমান।

এইসব কথা ভাবতে-ভাবতেই তিতলি অন্যমনস্কভাবে ল্যাপটপটাকে অন করল। স্ক্রিন-সেভার হিসেবে একটা ছবি ফুটে উঠল। মাইক্রোলেন্সে তোলা ছবি একটা গঙ্গাফড়িং জলের দিকে লাফ মেরেছে, যেন সুইসাইড করছে।

সত্যিই তাই করছে কিন্তু। ওকে আত্মহত্যা করাচ্ছে যে, তার চেহারাটা প্রায় আণুবীক্ষণিক, কিন্তু নামটা রামপালতিলকসিং-এর থেকেও কঠিন। ওরা স্পিনোকর্ডোডেস্টিলিনি নামে একজাতের জলের পোকার লার্ভা একদম প্রথম-সারির এক প্যারাসাইট।

ঝিঁঝি আর গঙ্গাফড়িং-এর মতন পোকামাকড় জল খাবার সময় ওই লার্ভাগুলোকেও খেয়ে ফেলে। এরপরেই শুরু হয় স্পিনোকর্ডোডেস্টিলিনির খেলা। একবার ফড়িং-এর পেটের মধ্যে পৌঁছে গেলেই সেই সুতোর মতন লার্ভাগুলো বাড়তে শুরু করে। কিন্তু শুধু বেড়ে উঠলেই তো হবে না, বড় হওয়ার পরে তাকে তার আসল বাসা, অর্থাৎ জলে ফিরে যেতে হবে। তাই স্পিনোকর্ডোডেস্টিলিনি সত্যিকারেই গঙ্গাফড়িং বা ঝিঁঝিকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করায়। পেটের মধ্যে পরজীবী নিয়ে বেচারা ফড়িং জলে ঝাঁপ মারে আর তার শরীর থেকে বেরিয়ে জলের পোকা জলে ফিরে যায়।

'মাইন্ড-কন্ট্রোল।' ফিসফিস করে তার প্রিয় শব্দটাকে কয়েকবার উচ্চারণ করল তিতলি। আবার ল্যাপটপের দিক থেকে তার মন ঘুরে গেল।

কত সুন্দরভাবে এগোচ্ছিল তার মাইন্ড-কন্ট্রোলের প্রোজেক্ট; তার প্যারাসাইট হয়ে যাবার সাধনা। একদিকে প্রদীপ কামাথের জ্ঞানভাণ্ডার মামুলি হ্যাকিং-এর জোরে যার চাবি, মানে পাসওয়ার্ড, ততক্ষণে তিতলির করায়ত্ব। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় ইনস্ট্রুমেন্ট আর 'র-মেটেরিয়াল', সবই আসছিল সিমবায়োটিকের পয়সায়। প্রদীপ কামাথের নামেই আসছিল, কিন্তু ব্যবহার তো করছিল তিতলিই।

অতএব ফেব্রুয়ারি শেষ থেকে মে, এই তিনমাসের মধ্যে তিতলি যা চাইছিল, তা আবিষ্কার করে ফেলল। সে-এক ভয়ঙ্কর আবিষ্কার। কিন্তু তার কথা কাউকে বলা যাবে না। এমনিতেই জিন-মডিফিকেশনের ওপরে সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের শ্যেনদৃষ্টি থাকে, কারণ কাজটা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ তো বটেই। তার আলটিমেট রেজাল্ট মানবজাতির পক্ষে ভালো হবে কি মন্দ, সেটা কে বলতে পারে? তার ওপরে এই-ক্ষেত্রে তিতলির উদ্দেশ্যটাকে মোটেই সৎ বলা যায় না।

না বলতে পারলে বয়েই গেল। তিতলি একা ভোগ করবে বলেই তো জিনিসটাকে বানিয়েছিল। কিন্তু তার পর থেকেই শুরু হল সমস্যা। জুনমাসের শুরুতেই একদিন প্রদীপ কামাথ নিজের ডাটা-ব্যাঙ্ক ঘাঁটতে গিয়ে হ্যাকিং-এর ব্যাপারটা ধরে ফেলল। যে-তাস তিতলি এই দেশের মধ্যে ফেলবে না বলেই স্থির করে রেখেছিল, সেই তাস তাকে ফেলে দিতে হল। একটা সাদা আরশোলার মতন সুড়সুড় করে প্রদীপ কামাথ উঠে এল নীলপরীর প্রসারিত দুই উরুর মাঝখানে।

কাজটা সম্ভব হল ওই আবিষ্কারের প্রভাবেই। নাহলে এমনিতে সম্ভব ছিল না। কারণ, প্রদীপ কামাথ লোকটা সাদা চামড়ার মেয়ে ছাড়া শুত না। নিজের বউয়ের সঙ্গেও না। তার আগের তিনমাসে কতবারই তো সে তিতলির আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেসন ঘটিয়েছে। যদিও সবসময়েই পাশে একজন নার্স থাকত, তবু

প্রতিবারই তার ভ্যাজাইনার মধ্যে সিরিঞ্জ দিয়ে স্পার্ম পুশ করেছে তো ওই প্রদীপ কামাথই। কই, একবারের জন্যেও তো তার হাত কাঁপেনি।

সেদিন কাঁপল।

তার আগে অবশ্য বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটল। প্রথমত নার্স মহিলাটি হঠাৎই কেমন যেন ঘেমেটেমে অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন, তিনি একটা অস্বস্তিকর গন্ধ পাচ্ছেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, ল্যাবরেটরির কোনো যন্ত্র থেকে গ্যাস লিক করছে, যদিও সেক্ষেত্রে অ্যালার্ম বাজার কথা। বাজেনি।

প্রদীপ কামাথ তাঁকে দাবড়ানি দিয়ে বলল, 'কী আবোলতাবোল বকছেন! গন্ধ একটা আমিও পাচ্ছি বটে, বাট ইট ইজ কোয়াইট অ্যালিওরিং। নেশা-ধরানো গন্ধ। যাই হোক, শরীর খারাপ লাগলে আপনি চলে যান। প্রসিডিওরটা আমি একাই সামলে নেব।'

তিতলি দুধসাদা চাদরে ঢাকা বিছানার ওপরে শুয়ে সবটাই খেয়াল করছিল। তার ঠোঁটে ফুটে উঠেছিল রহস্যময় এক হাসি। নার্সটি বেরিয়ে যাবার পরে প্রদীপ কামাথ প্রতিদিনের মতন ফ্রিজ থেকে একটা কাচের ভায়াল বার করে, সিরিঞ্জের মধ্যে সংরক্ষিত পুরুষ-বীর্য টেনে নিয়েছিল। তারপর পায়ে-পায়ে তিতলির দিকে এগিয়েও এসেছিল। কিন্তু ওই অবধিই। তারপরেই তার হাতদুটো হঠাৎই থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। মুখটা রক্তচাপে লাল হয়ে উঠল আর সারা কপালে ফুটে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম। সিরিঞ্জটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, নিজের অ্যাপ্রনের বোতামগুলো দ্রুতহাতে খুলতে শুরু করল প্রদীপ কামাথ।

তিতলির ঠোঁটের হাসিটা আরো একটু প্রসারিত হল। চোখের মণির মধুবনী আকাশে ঝলসালো বিদ্যুৎ। সে বুঝতে পারছিল, তার গবেষণার প্রথমভাগকে এখনই সফল বলা যায়।

বিছানার মাথার কাছেই একটা বেসিন ছিল। মুখের ভেতর থেকে একটা চিবোনো চিউইংগাম বার করে তিতলি সেটাকে হাত বাড়িয়ে বেসিনের মধ্যে ফেলে দিল। চিউইংগামটা সাধারণ চিউইংগামই ছিল। কিন্তু ওটা চিবোনোর ফলে ওর মুখে যে-লালা জমেছিল, সেটা সাধারণ লালা ছিল না।

গত তিনমাস ধরে তিতলি নিজের শরীরটাকে নানাভাবে বদলে ফেলেছে। তাই ওর মুখের লালাতেও এখন একধরণের উদ্বায়ী অ্যালিফ্যাটিক অ্যাসিডের প্রাবল্য। পুরুষের কাম-জাগানো গন্ধটা ওই লালা থেকেই আসছিল। নার্সটি যেহেতু নারী, তাই গন্ধটা তার কাছে অসহ্য ঠেকছিল। প্রদীপ কামাথ যেহেতু পুরুষ, তাই সে গন্ধটার মাদকতায় সম্মোহিত।

চিউইংগামটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে, তিতলি প্রদীপ কামাথকে বলল, 'স্যার! একটু ওয়েট করুন। আগে বলরাম রায়কে বলুন, সি.সি. টিভি অফ করতে। যদি প্রশ্ন করে কেন, বলবেন যেহেতু নার্স ভদ্রমহিলার শরীর খারাপ হয়েছে, তাই আপনাকে বাধ্য হয়েই আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ একা থাকতে হচ্ছে। আপনি চান না ঘটনাটার কোনো রেকর্ড থাকুক। আর ঘরের লাইটটাও নিভিয়ে দেবেন।'

এইখানটায় একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল তিতলির। কটের চারিপাশে কার্টেনটা সে টেনে দেয়নি। অবশ্য ভুলও ঠিক বলা যায় না ওটাকে। কামাথ যেভাবে মুহূর্তের মধ্যে তাকে শরীরের নীচে চেপে ধরে ঠোঁটদুটো কামড়ে ধরেছিল, তাতে তার আর কিছু করার উপায় ছিল না। শুধু বিদ্ধ হওয়ার আগে নিজের পাতলা শালোয়ারটা ওই দরজার পাশের এমার্জেন্সি-লাইটটার ওপরে ছুঁড়ে দিতে পেরেছিল। ওই আলোটাকে ঘরের ভেতর থেকে নেভানো যায় না।

ওই প্রথম রাতে তিতলি যে সামান্য ভুলটুকু করে ফেলেছিল, তাই নিয়েই নাকি পরে একটু শোরগোল উঠেছিল। সিকিউরিটি ডেস্কের কোন একটা উজবুক নাকি ওদের পাপকাজটা দেখে ফেলেছিল। বলরাম রায় অবশ্য লোকটাকে সঙ্গেসঙ্গেই দূর করে দিয়েছেন। যাই হোক, এগুলো মাইনর ইস্যু। কেউ জানবে না।

যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল, প্রদীপ কামাথের পুরুষাঙ্গ তার শরীরে প্রবেশ করার চব্বিশ-ঘণ্টার মধ্যে তিতলি বুঝতে পেরেছিল, তার গবেষণার দ্বিতীয়ভাগও সফল। আর শুধু একটা পর্যায়ের কাজই বাকি ছিল। সেই

কাজটুকু শেষ করতে পারলেই তিতলি যাদব বিশ্বজয়ে বেরোতে পারত। কিন্তু ভাগ্য যার খারাপ, তার কোনো কাজই কি সহজে হয়?

তিতলিরও হল না।

হল কি, অগাস্ট-মাসের আঠারো-তারিখ সন্ধেবেলায় তিতলি বেনাচিতি বাজারে গিয়েছিল কিছু জিনিস কিনতে। একাই। ক্যাম্পাসের অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে সে খুব একটা মেলামেশা করত না। মানুষ বড় কৌতূহলী জীব। কৌতূহল জিনিসটা তিতলির মতন মেয়ের পক্ষে ক্ষতিকর।

বাজার করে ফেরার পথে তার মোবাইলে একটা কল এল।

স্ক্রিনে নামটার দিকে তাকিয়ে তিতলির হার্ট দুটো বিট মিস করল। গোরখনাথ! সকেট গোখরো।

এই ফোনটার জন্যেই তো সে কতদিন ধরে অপেক্ষা করছে। কতবার ভেবেছে একবার এই নম্বরে ফোন করে গোখরোকে জিগ্যেস করে, হ্যাঁ রে, সব কাজ ভালোয়-ভালোয় মিটেছে তো। তবু শেষ মুহূর্তে হাত সরিয়ে নিয়েছে। ফোন করা মানেই রেকর্ড থেকে যাওয়া।

কলটা রিসিভ করেছিল তিতলি। খুব চাপা গলায়, টিপিকাল বালিয়া জেলার জবানে গোখরো বলেছিল, 'পাশের গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়, তিতলি। আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি। এতদূর ছুটে এসেছি মানে বুঝতেই পারছিস, কথাটা জরুরি।'

তিতলি সন্দেহ করেনি। ঢুকে পড়েছিল সেই অন্ধকার গলিটায়। দু-পা দূরে একটা অ্যাম্বাসাডর পার্ক করা ছিল। তিতলিকে দেখামাত্রই সেই অ্যাম্বাসাডর থেকে দুটো ছেলে নেমে এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন ওর মাথার পেছনে ভারী কিছু দিয়ে সপাটে মেরেছিল। জ্ঞান ফেরার পর তিতলি দেখেছিল, তাকে একটা সরু কাঠের বেঞ্চির ওপরে পিছমোড়া করে বেঁধে ওরা শুইয়ে রেখেছে। আর সকেট গোখরো নয়, তার মুখের ওপরে ঝুঁকে আছে সুরেশ সিং।

'অবাক হয়ে গেছিস, তাই না তিতলি?' তিতলিকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে প্রাণ খুলে হাসছিল সুরেশ সিং। 'ভেবেছিলিস, এতদিনে কোনো জলার পাঁকের নীচে পচে গলে মিশে গেছি, তাই না?'

ঘরটা ছিল ভাঙাচোরা। একটাই কম পাওয়ারের বালব জ্বলছিল। সেই আলোতে তিতলি দেখেছিল সেই ছেলেদুটোও ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ওরাও খুব মজা পাওয়ার ভঙ্গিতে হাসছিল।

তিতলি বুঝতে পারছিল কী হতে চলেছে। তবুও একবার শেষ চেষ্টা করেছিল সে। চোখেমুখে যতটা সম্ভব সরলতা ফুটিয়ে বলেছিল, 'আপনি কী বলছেন সুরেশচাচা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, দুর্গাপুরে আসার আগে আপনাকে একবার বলে আসা উচিত ছিল। কিন্তু আপনি যদি বারণ করেন সেই ভয়ে...।'

'খামোশ!' হঠাৎই হাসি থামিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল সুরেশ সিং। আঙুল তুলে বলেছিল, 'ওই যে ছেলেটাকে দেখছিস, ও ছিল গোখরোর দলের মধ্যে আমার ঢুকিয়ে-রাখা ইনফর্মার। তোর সঙ্গে গোখরোর যা-যা কথা হয়েছিল, সব ও আমাকে ডিটেইলসে বলে দিয়েছিল। সেইজন্যেই সেদিন জানে বেঁচে গিয়েছিলাম। তোর মায়ের মৃত্যুদিনে গেছিলাম অবশ্য। রাত দশটাতেই ফুলবাগানে গিয়েছিলাম। তবে একা যাইনি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে তিতলির ফ্যাকাশে মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল সুরেশ সিং। তারপর সাফারির বুকপকেট থেকে একটা কালার্ড ফোটোগ্রাফ বার করে তিতলির মুখের সামনে এনে বলেছিল, 'এই নে। দেখে নে তোর নাগরের ছবি।'

তিতলি দেখেছিল, সকেট গোখরোর দুটো-চোখই সকেট থেকে বেরিয়ে দুই গালের ওপরে ঝুলছে। ওকে মারার পর নিজের হাতে ওর চোখ উপড়ে নিয়েছিল সুরেশ।

ছবিটা দেখেই তিতলির ভীষণ গা গুলোচ্ছিল। তবু কোনোরকমে বলেছিল, 'এ কে? একে আমি চিনি না। আমার প্রেমিক যদি কেউ থাকে তাহলে সে আপনিই, সুরেশচাচা। আপনার কাছেই আমার কুমারী-মন জমা রেখেছিলাম। কতদিন আপনি আমাকে আদর করেননি। আপনি কি আজ আরেকবার?' তিতলি প্রাণপণে চেষ্টা অরছিল মুখে লালা আনতে, কিন্তু পারছিল না। ভয়ের চোটে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

সুরেশ সিং মন দিয়ে ওর কথাগুলো শুনল। তারপর হাসল, তবে জোরে নয়। ওর এবারের হাসিটার মধ্যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে একটু বিষণ্ণতাও যেন মিশে ছিল। হাসতে-হাসতেই সে বলল, 'না রে তিতলি। তোকে যদি নিজে রেপ নাও করি, এই ছোকরা দুটোকে বলতে পারতাম করতে।

কিন্তু এই যে কোঠিটা দেখছিস, ষাট বছর আগে এখানে আমার মা শরীর বেচত। তখন স্টিল প্ল্যান্ট সবে চালু হচ্ছে। এই কোঠিতেই বেজন্মা সুরেশ সিং-এর জন্ম। তাই এই কোঠির ছাদের নীচে আমি কোনো অওরৎকে নাঙ্গা করতে পারব না। আর রেপ তো তোর মতন মেয়ের পক্ষে খুব ছোট শাস্তি, তাই না? তোকে জানে মেরে দিতে পারতাম। তবে সেটাও কিছু না। তোর জন্যে আমাদের অন্য প্ল্যান আছে। এই! শুরু কর!'

শেষের কথাগুলো সুরেশ ওর সঙ্গী ছেলেদুটোকে উদ্দেশ্য করে বলল। ওদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে তিতলির মাথার মাথার নীচে একটা প্লাস্টিকের শীট গুঁজে দিল। অন্যজন একটা বোতল নিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল। তিতলি ততক্ষণে বুঝে গেছে, কী হতে চলেছে। ও চিৎকার করতে শুরু করেছিল। তবে এক-দুবারের বেশি গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয়নি। তারপরেই সুরেশের সঙ্গীরা ওর মুখের একদিকে অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছিল।

ঠিক কতদিন বাদে জ্ঞান ফিরেছিল তা জানে না তিতলি। এই কোঠিতেই ওর জ্ঞান ফিরেছিল। কোঠির মাসিকে জিগ্যেস করলে মারতে আসে। বলে, 'তুই কি চাস আমার মুখেও সুরেশ সিং অ্যাসিড ঢেলে দিয়ে যাক?'

তবে জ্ঞান ফেরার পরে তিতলি প্রথমেই ঘরের মধ্যে যে কমবয়সি মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছিল, তার কাছে একটা আয়না চেয়েছিল। মেয়েটি দেয়নি। ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে তিতলি আই-ফোনটা হাতে তুলে নিল। স্ক্রিন-সেভার হিসেবে তার নিজের মুখের ছবিই সেভ করা আছে। অ্যাসিড অ্যাটাকের পরের মুখ।

কিছুক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তিতলি। টাইমটাও একবার ওই ফোনে স্ক্রিনেই দেখে নিল। পৌনে-দশটা। বিল্টুবাবু এখনই চলে আসবেন; আজ আর কাজ হবে না। অবশ্য কাজ আর কী? বসে বসে এটা-ওটা ডিজাইন করা। এখানে কোথায় ল্যাবরেটরি আর কোথায় ইনস্ট্রুমেন্টস?

তিতলি স্বগতোক্তি করল, 'বেরোতে হবে, তিতলি যাদব। খুব শিগগিরই তোমাকে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। রসদ তো জোগাড় করেই ফেলেছ। তাহলে আর দেরি করছ কেন?'

তারপর পেনড্রাইভ, সেলফোন, ভায়ালের কৌটো সবকিছু আবার চোরাকুঠুরিতে ঢুকিয়ে রেখে সে বিছানার চাদরটা টানটান করে পাততে শুরু করল।

## ছয়

একুশে নভেম্বর বিপ্রদাসের ডিউটি ছিল দুপুর দুটো থেকে। কিন্তু তার অনেক আগে, সাড়ে-বারোটা নাগাদ মাইতিসাহেবের ফোন এল, 'চলে এস। জরুরি কথা আছে।'

মৌসুমী শুনে বলল, 'তোমাদের মাইতিসাহেব কবে মরবে?' তারপর থমথমে মুখে মাছ ভাজতে বসল; শুধু ডাল-ভাত তো আর দেওরকে দেওয়া যায় না।

থানার বারান্দায় পা রাখতেই ডিউটি বলল, 'স্যার, ওসি-সাহেব দু-বার খোঁজ নিয়েছেন, আপনি এসেছেন কিনা।'

বিপ্রদাস বুঝল, সত্যিই খুব সিরিয়াস কিছু ঘটেছে। সে পা চালিয়ে মাইতিসাহেবের ঘরে ঢুকল। ঢোকামাত্রই মাইতিসাহেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্তস্বরে বললেন, 'বোসো মণ্ডল। বোসো, চা খাও। তোমার জন্যে বোধহয় কিছু ব্রেক-থ্রু জোগাড় করতে পেরেছি। তার জন্যে অবশ্য এই ফাইলটা নিয়ে কাল অনেক রাত অবধি কাজ করতে হয়েছে।'

তিতলি যাদবের পার্সোনাল-ফাইলটাকে তাঁর চাঁপাকলার মতন মোটা- মোটা আঙুলের এক টুসকিতে টেবিলের কাচের ওপর দিয়ে বিপ্রদাসের দিকে হড়কে দিলেন মাইতি-সাহেব।

বিপ্রদাস ভারি অবাক হয়ে বলল, 'আপনি স্যার ওই ফাইলটাতে তো তেমন কিছু।'

'ঠিকই বলেছ। ফাইলটাতে অ্যাপারেন্টলি তেমন কিছু ছিল না, দুটো তথ্য ছাড়া। এক, তিতলি যাদব মেয়েটি বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ পটারি বস্তিতে। জায়গাটা সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া আছে?'

বিপ্রদাস দুদিকে ঘাড় নাড়ল।

'আমার আছে। ক্রিমিনালদের ডেন। দু-নম্বর তথ্য হচ্ছে, ওর ভোটার-কার্ড আধার-কার্ডে যে অ্যাড্রেসই থাকুক, সায়েন্স-কলেজ থেকে সমস্ত সার্টিফিকেট পাঠানো হয়েছিল ফুলবাগানের একটা ঠিকানায়। খুব সম্ভবত তিতলি নিজেই কলেজের কাছে নিজের প্রেসেন্ট-অ্যাড্রেস হিসেবে ওই ঠিকানা দিয়ে রেখেছিল।'

বিপ্রদাস কিছু একটা বলতে গেল। মাইতি-সাহেব তাকে হাত তুলে থামালেন। বললেন, 'শোনো শোনো। এর পরের পার্টটাই ইন্টেরেস্টিং। জাস্ট এই দুটো তথ্যের ওপরে নির্ভর করে আমি ক্যালকাটা পুলিশের ক্রাইম-ইনফর্মেশন-ব্যুরোতে ফোন করে জানতে চেয়েছিলাম, গত একবছরের মধ্যে পটারি বস্তি আর ফুলবাগান এই দুটো পয়েন্টকে ছুঁয়ে গেছে, এরকম কোনো ক্রাইমের রেকর্ড তাদের কাছে আছে কিনা।

'সল্টলেকে আমাদের ওই অফিসটা ব্যাপক; মানে ক্রাইম-ইনফর্মেশন- ব্যুরোর কথা বলছি। আমি নিজেও তিন-বছর কাজ করেছিলাম ওখানে। এক-ঘণ্টার মধ্যে ওরা আমাকে উত্তর পাঠাল, গোরখনাথ নামে পটারি-বস্তির এক উঠতি মাফিয়া গত ফেব্রুয়ারি মাসে ফুলবাগানের একটা বাই-লেনের মধ্যে ব্রুটালি খুন হয়েছিল। দিনটা খেয়াল কোরো তেইশে ফেব্রুয়ারি। যেদিন সকালে তিতলি যাদব কলকাতা থেকে এখানে, এই দুর্গাপুরে ল্যান্ড করেছিল।

'জানতে চাইলাম, কেসটার ফলো-আপ কিছু হয়েছে কিনা। ওরা বলল, না। গোরখনাথের আর্চ-রাইভাল সুরেশ সিং-কে আটক করা হয়েছিল। কিন্তু সেরকম সলিড প্রমাণ দেওয়া যায়নি বলে সে ব্যাটা ছ'মাসের মধ্যে বেরিয়ে গেছে।

'আমি হতাশ হয়ে ফোন নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যে অফিসার আমার কোয়ারির উত্তর দিচ্ছিলেন, গড ব্লেস হিম, তিনিই বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমি বললাম, কী হল? তাতে সেই অফিসার বললেন, লোকাল থানা গোরখনাথের মোবাইল-নাম্বারটা ওর চ্যালাদের কাছ থেকে জোগাড় করেছিল। আমিই তখন সাইবার-ডিভিশন থেকে ওটাকে ট্রেস করার চেষ্টা করেছিলাম, পাইনি। খুনের পর থেকেই সেই সিমকার্ডের ফোনটা সুইচড অফ ছিল। বুঝতেই পারছেন, মার্ডারাররাই ওটা নিয়ে পালিয়েছিল। তারপর গত তিন-চারমাস আর দেখিনি। আমাকে একটু সময় দিন। একবার এখনকার পজিশনটা চেক করে দেখে নিই।

'পাঁচমিনিট বাদেই সেই অফিসারের গলা পেলাম। ভয়ঙ্কর উত্তেজিত। বললেন, মাই গুডনেস! আঠারোই অগাস্ট, সেভেন থার্টি পি এম; ভিকটিম গোরখনাথের মোবাইল-ফোনটা চালু হয়েছিল। তারপর থেকে আবার বন্ধ। গত ন'মাসের মধ্যে ওই একবারই ফোনটা খুলেছিল। দশ-সেকেন্ডের একটা আউটগোইং কল ছিল স্যার। যে-নাম্বারে কলটা গিয়েছিল সেটা বলছি। নোট করুন। কী বলছেন? লোকেশন? দাঁড়ান দেখছি। হ্যাঁ স্যার, লিখুন। লোকেশন দুর্গাপুর।'

মাইতি-সাহেবের কথা শুনতে-শুনতে বিপ্রদাস নিজের অজান্তেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থাতেই বলল, 'আঠারোই অগাস্ট, স্যার! ওইদিন থেকেই তো তিতলি যাদবকে পাওয়া যাচ্ছে না'।

মাইতিসাহেব বিপ্রদাসকে আবার বসে পড়ার জন্যে ইঙ্গিত করলেন। ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, 'জানি। সিমবায়োটিক তিতলিকে যে নোটিশটা পাঠিয়েছিল, এই ফাইলে তার কপি রয়েছে। আমি দেখেছি অ্যাজ ইট অ্যাপিয়ারস দ্যাট ইউ আর অ্যাবসেন্ট ফ্রম ইওর ডিউটিস সিন্স এইটটিনথ ডে অফ অগাস্ট এটসেটরা এটসেটরা...। যাগগে, শোনো। এই কিছুক্ষণ আগেই এস.পি. সাহেবের কাছ থেকে ঘুরে এলাম। ওনাকে তিতলির অন্তর্ধানের সঙ্গে এই মার্ডারারের কল, তারপর প্রদীপ কামাথের অসংলগ্ন আচরণ এইসব অনেকরকম হ্যাড্ডাব্যাড্ডা বুঝিয়ে দুটো পারমিশন জোগাড় করেছি।'

বিপ্রদাস সুধীর মাইতিকে মনে-মনেই বলল, 'আপনার ঘাড়ের ওপরে ওটা মাথা না আইস-চেম্বার স্যার?' মুখে বলল, 'কী পারমিশন?'

'একনম্বর, সিমবায়োটিকের ওই ল্যাবরেটরি এখন সিল করাই থাকবে, আনটিল ফার্দার অর্ডার। আর দুই, ওই কলটার ব্যাপারে তুমি, বিপ্রদাস মন্ডল, এখন থেকেই এনকোয়ারি শুরু করবে। দ্যাখো, আমার তো মনে হচ্ছে ওই কল ধরেই তিতলি যাদবের কাছে পৌঁছে যেতে পারবে। অবশ্য তাতে যে কী উপকার হবে সে তুমিই জানো।'

কথা থামিয়ে সুধীর মাইতি দেখলেন, বিপ্রদাস কী যেন বলার জন্যে উসখুস করছে। তিনি বললেন, 'কী হল? আবার কী চাও?'

'কিছু চাই না স্যার। একটা কথা শুধু বলব। কাল বাড়ি ফেরার পথে সুরেন পালোধি বলে একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বলল...'

সুরেন পালোধির কাছে যা-যা শুনেছিল, সবটাই মাইতিসাহেবকে বলল বিপ্রদাস। উনি শুনলেন ঠিকই। কিন্তু তারপর হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বললেন, 'তোমার কেসের ব্যাপারে এটা তেমন কিছু এসেনসিয়াল নয়। আগুন আর ঘি, একসঙ্গে থাকলে এসব হবেই। তবে ওই সিকিউরিটি অফিসার কী যেন নাম, জগন্নাথ না কি, ওকে কখনো ভড়কাবার দরকার পড়লে ঘটনাটার কথা উল্লেখ করতে পারো। আর শোনো, ক্রাইম ব্যুরোর ওই অফিসার আমাকে কথা দিয়েছেন, আজ বিকেলের মধ্যে সার্ভিস-প্রোভাইডারের সঙ্গে যোগাযোগ করে, গোরখনাথের ফোন থেকে যে-নম্বরে কল গিয়েছিল তার টাওয়ার-লোকেশন আমাদের দিয়ে দেবেন। ব্যস, আর কী? তখন দুর্গা বলে বেরিয়ে পোড়ো।'

বিকেল নয়। টাওয়ার-লোকেশন জানা গেল সন্ধে সাড়ে-ছ'টায়। থানার গেটের বাইরে সুজিত গাড়ি নিয়ে ওয়েট করছিল। ওর পাশের সিটে বসে বিপ্রদাস দরজাটা টেনে দিল। তারপর বলল, 'সুজিত, ওয়ারিয়া জায়গাটা চিনিস? দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের ময়লা ফেলা হয় যেখানে ''স্ল্যাগ ব্যাঙ্ক''। চিনিস?'

'চিনি স্যার। কিন্তু এখন যাবেন? কাল গেলে ভালো হত না স্যার?'

'কেন?'

'না, মানে সন্ধে হয়ে গেছে। ওয়েদারটাও খারাপ। আর জায়গাটা কেমন আপনি তো জানেন। সঙ্গে আর দু-একজন থাকলে ভালো হত স্যার।'

বিপ্রদাস কব্জি উলটে ঘড়ি দেখল। সন্ধে সাতটা বেজে গেছে। ওয়েদারটাও সত্যিই খুব খারাপ। নভেম্বরের একুশ তারিখ আজ। তবু অসময়ের ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমেছে। তার সঙ্গে জোরালো একটা হাওয়াও বইছে। গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের ওপর বড়-বড় কয়েকটা জলের ফোঁটা পড়ে ছিটকে গেল। বিপ্রদাস বলল, 'নারে

সুজিত। কাল যাওয়ার সময় পাব না। কাল কোর্টে একটা হিয়ারিং রয়েছে। চল চট করে ঘুরে আসি। আর কাজটা সেরকম কিছু নয়। একটা মেয়েকে একটু ইনটারোগেট করব। ব্যস।'

'ঠিক আছে, চলুন।'

মিনিট কুড়ি বাদে জি.টি. রোড ছেড়ে বাঁদিকে বাঁক নেওয়া মাত্রই বিপ্রদাসের মনে হল সভ্যসমাজ যেন কত দূরে পড়ে রইল। এখন ওদের সামনে সভ্যতার চিহ্ন বলতে শুধু ওই দূরে স্টিল-ফ্যাক্টরির চিমনির মাথায় দপদপানো লাল আলোগুলো। রাস্তার দুদিকে কোনো জনবসতির চিহ্ন নেই। বেঁটে-বেঁটে খেজুরগাছের মাথায় মুঠো-মুঠো জোনাকি জ্বলছে। হেডলাইটের আলোর বিমের মধ্যে অজস্র মথের ওড়াউড়ি। তবে আরো মিনিট-কুড়ি এইভাবে যাওয়ার পরে হঠাৎই আবার জনবসতি শুরু হয়ে গেল।

এইখানে স্টিল ফ্যাক্টরির যতরকমের 'ওয়েস্ট' মানে বর্জ্য এনে ফেলা হয়। সেগুলো জমতে-জমতে ছোট ছোট টিলার চেহারা নিয়েছে। অন্ধকার টিলাগুলোর গা বেয়ে উঠে গেছে সরু রেল-লাইন, আর সেই লাইন বেয়ে চার কামরা, পাঁচ কামরার ছোট ছোট মালগাড়ি যাতায়াত করছে। ঢাকা বাক্সের মতন ওয়াগনগুলোর মধ্যেই রয়েছে জ্বলন্ত স্ল্যাগ, মানে লোহাপাথর থেকে লোহা বার করে নেওয়ার পরে যে গাদ পড়ে থাকে সেই গাদ-টা। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছনোর পরে লিভারের হ্যাঁচকা টানে ওয়াগনের ঢাকনা খুলে দিলে সেই জ্বলন্ত গাদ আগুনের ঝরনার মতন ঝরে পড়ছে স্ল্যাগের জমাট পাহাড়ের ওপর। খালি ওয়াগনগুলো আবার ফিরে যাচ্ছে ব্লাস্ট-ফার্নেসের মুখে, নতুন স্ল্যাগ বয়ে আনবার জন্যে।

এই অন্ধকার টিলা, নাক জ্বালানো গন্ধ আর আকস্মিক আগুনঝরনা—তারই মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রায় ল্যাংটো কিছু মানুষ। তাদের প্রেতাত্মার মতন শীর্ণ শরীরের চলাচল দেখলে অবধারিতভাবে দান্তের নরকের কথা মনে পড়ে।

আসলে ওরা স্ল্যাগ ব্যাঙ্কের গা থেকে খুঁটে খুঁটে নানা রকমের নন-ফেরাস মেটালের টুকরো উদ্ধার করছে। ওদের খুঁটে-তোলা সিসে, তামা, দস্তার টুকরোর দাম কয়েক কোটি টাকা। বলাই বাহুল্য, টাকাটার খুব সামান্য অংশই এই গরিব লোকগুলোর হাতে পৌঁছয়। স্টিল-প্ল্যান্টও তার থেকে কিছুই পায় না। লাভের গুড় পুরোটাই খায় অন্ডালের দু-তিন জন মাফিয়া। ওয়ারিয়া স্ল্যাগ-ব্যাঙ্কে সেই মাফিয়াদের সরকার চলে। পুলিশ প্রশাসন এখানে আউটসাইডার।

বিপ্রদাস গাড়ির কাচটা তুলে দিয়ে বলল, 'সুজিত, তুই কয়লাবস্তি চিনিস?'

'চিনি স্যার। ওখানে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

সুজিত একটা বড় গাড্ডা থেকে গাড়িটাকে কোনো রকমে তুলে বলল, 'পুরোটা যেতে পারব কিনা জানি না স্যার। রাস্তার হাল দেখেছেন তো।'

'যতটা যেতে পারিস চল।'

আরো দশমিনিট ঝাঁকানি খেতে খেতে চলার পর একটা জায়গায় গিয়ে সুজিত হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন স্যার। এরপরে আর এগোনো রিস্কি হয়ে যাবে।' বিপ্রদাস গাড়ি থেকে নেমে কোমরে হাত দিয়ে সামনের রাস্তাটাকে মাপল। সত্যিই। এ রাস্তার যা চেহারা, তাতে গাড়ি চালালে খোয়ায় ঠোক্কর লেগে মোবিল-ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে যেতে পারে। সে বলল, 'তুই তাহলে এখানেই দাঁড়া সুজিত। আমি ঘুরে আসছি।'

সুজিতের তবু অস্বস্তি যায় না। সে খালি বলে, 'একলা যাবেন স্যার? জায়গাটা ভালো নয়। যত ড্রাগখোর, ছিনতাইবাজদের আড্ডা। আমি যেতাম স্যার আপনার সঙ্গে। কিন্তু ভদ্রলোকের জায়গা নয় তো এটা। গাড়ি ফাঁকা রেখে গেলে পার্টস খুলে নিয়ে পালাবে। এরা পুলিশ ফুলিশ মানে না।'

বিপ্রদাস বলল, 'কেন ভয় পাচ্ছিস বল তো? বললাম তো, কোনো অ্যাকশনে যাচ্ছি না। একজনের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলেই চলে আসব। তোর টর্চটা দে।'

সুজিত গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা এল-ই-ডি টর্চ বার করে বিপ্রদাসের হাতে দিল। সেইটা জ্বালিয়ে বিপ্রদাস সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

একটা বাঁক ঘোরার পরেই হঠাৎ সে অদ্ভুত একটা লোকালিটির মধ্যে গিয়ে পড়ল। এখানে পিচ নয়, কয়লার ঘেসের রাস্তা। রাস্তার দুপাশে সারিসারি কালো প্লাস্টিকের ঝুপড়ি। দশ-বারোটা দোকানঘর। তেলেভাজা, সস্তার স্টেশনারি, মুদিখানার জিনিস আর শুয়োর কিম্বা মুরগির মাংস বিক্রি হচ্ছে দোকানগুলো থেকে। পুরো জায়গাটাতে কোথাও ইলেট্রিকের কানেকশন নেই। থাকার কথাও নয়, কারণ এটা স্টিল-প্ল্যান্টের জমি জবরদখল করে গড়ে ওঠা কলোনি। এদিকে ওদিকে হ্যারিকেন কিম্বা কুপি জ্বলছে। বৃষ্টির জোরটা একটু বেড়েছে বলেই বোধহয় রাস্তায় বিশেষ লোকজন নেই। যে দু-একজন লোক দোকানঘরের সামনে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে কিম্বা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, বিপ্রদাসের চোখে তাদের সকলকেই মনে হল নেশাগ্রস্ত।

তবে এইসব কারণে জায়গাটাকে অদ্ভুত মনে হয়নি বিপ্রদাসের। অদ্ভুত মনে হয়েছিল ঝুপড়ির সারির পেছনে ছড়িয়ে পড়ে থাকা কালো জলের বিলটা দেখে। জল থেকে হিলহিল করে সাদাটে ধোঁয়া উঠছে। সালফারের গন্ধে নাক জ্বলে যাচ্ছিল বিপ্রদাসের। তবু ওই জলের মধ্যেই পা ডুবিয়ে মেয়ে পুরুষ এমনকী বাচ্চারা অবধি কী যেন করছিল।

মাছ তো নিশ্চয় ধরছে না। এমন বিষাক্ত জলে মাছ থাকবে না। তাহলে?

একটা স্টেশনারি দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বিপ্রদাস। বুড়ো দোকানদার একটা শতচ্ছিন্ন গেঞ্জি আর ময়লা লুঙ্গি পরে বসেছিল। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা লোক দেখে কোনঠাসা জন্তুর মতন ছটফট করে উঠল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যে বিপ্রদাস বলল, একটা গোল্ড ফ্লেক দিন কাকা। দেশলাইটাও দেবেন। ওইখানে দাঁড়িয়েই সে সিগারেট ধরাল। তারপর দোকানদারকে জিগ্যেস করল, লোকগুলো ওই জলের ভেতর দাঁড়িয়ে কী করছে?

দোকানদার ততক্ষণে একটু সহজ হয়েছিল। বলল, 'ওই জলাটাই তো কয়লাবস্তির ভাত-ভিত্তি স্যার। ব্লাস্ট-ফার্নেস থেকে বেরিয়ে আসা ওই জলের মধ্যে কয়লার গুঁড়ো মিশে থাকে। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে যাবার আগেই এখানকার হারামি লোকগুলো ওই জল পাইপ কেটে বার করে বিলের মধ্যে জমায়। তারপর জল থেকে কয়লার গুঁড়ো ছেঁকে বার করে তাই দিয়ে গুলকয়লা বানিয়ে বিক্রি করে।'

'বটে? বিক্রি হয় কোথায়?'

'কোথায় হয় না স্যার? এ তো কোক-ওভেনের কয়লা। দারুণ কোয়ালিটি। উখড়া, পাণ্ডবেশ্বর, রানীগঞ্জ সর্বত্র এখানকার গুল-কয়লা সাপ্লাই যায়। দিনে পনেরো-ষোলো লরি গুল-কয়লা বেরোয় এখান থেকে। মাসে তিন থেকে চারকোটি টাকার লেনদেন হয়।'

'কে চালায় এই ব্যবসা?'

দোকানদার হাত জোড় করে বলল, 'আমি গরিব লোক স্যার। এখানেই ব্যবসা করে খেতে হয়। এরপর আপনার সঙ্গে আর বেশি কথা বললে আমার লাশ পড়ে যাবে।'

বিপ্রদাস মুচকি হেসে সিগারেটের টুকরোটা টুসকি মেরে নালায় ফেলে দিল। তারপর পকেট থেকে ফোন বার করে সেই নম্বরটায় একটা ফোন করল, যে-নম্বরে গোরখনাথের ফোন থেকে কল গিয়েছিল। ফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বাজল। স্বাভাবিক। অচেনা নম্বরের কল দেখলে রিসিভ করার আগে তো ভাববেই। তারপরেই ওদিক থেকে এক মহিলার গলা ভেসে এল, 'হ্যালো!'

'তিতলি যাদব বলছেন তো? আমার নাম বিপ্রদাস মণ্ডল। কোক-আভেন থানার সেকেন্ড অফিসার। আপনার সঙ্গে দেখা করব বলে এখানে এসেছি কয়লা বস্তিতে। কিন্তু আপনি ঠিক কোন বাড়িটায় আছেন বুঝতে পারছি না। একটু বলবেন?'

তিতলির যা প্রোফাইল, তাতে ও নিজের পরিচয় অস্বীকার করা বা বাড়ি ছেড়ে পালানোর মতন কাঁচা কাজ যে করবে না, সে বিশ্বাস ছিল বিপ্রদাসের। ধারণাটা মিলে গেল দেখে সে খুশি হল। তিতলি বেশ সপ্রতিভভাবেই বলল, 'যে কাউকে জিগ্যেস করুন মিশিরজির কোঠি কোথায়। দেখিয়ে দেবে। আমি আপনার জন্যে ওয়েট করছি।' বিপ্রদাস সেই মনিহারি দোকানের দোকানদারকেই বলল, 'কাকা। আমাকে একটু মিশিরজির কোঠার রাস্তাটা বাতলে দিন।'

দোকানদার হাঁ করে বিপ্রদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বিপ্রদাস জিগ্যেস করল, কী হল?

'না, মানে...আপনি উর্দি পরে আছেন।'

'তো?'

'মিশিরজির কোঠায় উর্দি পরে আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি সোজা গিয়ে একটা দেশি মদের দোকান পাবেন। ওটার বাঁ-দিকের গলি ধরে কিছুটা গিয়ে আবার বাঁদিকে বেঁকবেন। পেয়ে যাবেন মিশিরজির কোঠা।'

দোকানের ছাউনির নীচ থেকে বেরিয়ে জমা জলের মধ্যে দিয়ে ছপছপ করে হাঁটতে হাঁটতে বিপ্রদাস পৌঁছে গেল মিশিরজির কোঠার দরজায় এবং ওখানে পৌঁছিয়েই বুঝতে পারল, দোকানদার উর্দি পরে তাকে এই কোঠায় আসতে দেখে কেন অবাক হয়েছিল।

মিশিরজির কোঠা আদতে বেশ্যাবাড়ি। এই বৃষ্টির মধ্যেও পাঁচ-ছ'টা ক্ষয়াটে চেহারার মেয়ে মুখে রং মেখে আর যথাসাধ্য ছোট সাইজের পোশাক পরে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশ দেখে ওদের মধ্যেই একজন দৌড়ে ভেতরে চলে গেল।

পুরো তল্লাটের মধ্যে একমাত্র এই বাড়িটাতেই বিদ্যুত সংযোগ রয়েছে। কোনো ক্ষমতাবান কাস্টমারের দাক্ষিণ্য ছাড়া যে এটা সম্ভব হয়নি সে-কথা একটা বাচ্চাও বুঝতে পারবে। বিপ্রদাসের ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। পুলিশের চাকরির অভিজ্ঞতায় তার প্রায়ই ইচ্ছে করে, ক্ষমতা জিনিসটা কোথায় কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার একটা মানচিত্র তৈরি করে।

তার এই ভাবনার মধ্যেই সবক'টা মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে যে বেরিয়ে এল, সেই যে এই কোঠাবাড়ির মাসি তা বলে দিতে হয় না। বিপ্রদাসের পা থেকে মাথা অবধি এক পলকে মেপে নিয়ে মাসি হাসল। মনে হল একটা মেছোকুমিরে হাই তুলল। বলল, 'কী সৌভাগ্য! আসুন সাহেব, ভেতরে আসুন।'

কোঠাবাড়িটা বহু পুরনো। মনে হয় স্টিল-প্ল্যান্ট তৈরি হওয়ারও অনেক আগে এদিকে কোনো গ্রাম ছিল এবং সেই গ্রামে মিসিরজি নামে কোনো পয়সাওলা লোকের বাড়ি ছিল এটা। আপাতত বাড়ির হাল মিউজিয়ামে সাজিয়ে রাখার যোগ্য। পলেস্তার খসা দেয়াল, ঘুনধরা চৌকাঠ আর দরজা জানলার পাল্লা। এমনকী দোতলার টানা বারান্দার লোহার রেলিংগুলো অবধি জায়গায় জায়গায় মরচে লেগে খসে পড়েছে। মাতাল কাস্টমাররা যাতে রেলিংবিহীন বারান্দা থেকে খসে নীচে না পড়ে যায় তার জন্যে মাসি সেইসব বিপজ্জনক জায়গায় বাঁশের বেড়া বেঁধে দিয়েছে। মাসির পেছন পেছন বিপ্রদাস এই বাড়িরই নীচের তলার একটা বড় ঘরে ঢুকে চৌকির ওপর বসল।

যে ঘরটায় বিপ্রদাসকে নিয়ে আসা হল, সেই ঘরে শুধু একটা কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছিল। এদিক থেকে ওদিকে টানা দেওয়া নারকোল-দড়িতে মাসির শাড়ি শায়া ইত্যাদি শুকোচ্ছিল। একদিকে দেয়ালের কুলুঙ্গির মধ্যে কার্তিক ঠাকুরের ছবি। অন্যদিকে কয়েকটা টিনের তোরঙ্গ, একটার ওপর আরেকটা ডাঁই করে রাখা। তেলচিটে চাদরে ঢাকা বড় চৌকিটা ছাড়া এই হল সাকুল্যে ঘরের আসবাব।

ও হ্যাঁ। একটা বড়সড় চামড়া-বাঁধানো শ্রীনিকেতনের মোড়া ছিল। সেইটাই টেনে নিয়ে মাসি বিপ্রদাসের মুখোমুখি বসে কণ্ঠিতভাবে হাসল। বলল, 'আমার ছোট ব্যবসা সাহেব। কুড়িটা মোটে মেয়ে এখানে কাজ করে। কাস্টমার সব ট্রাকের ড্রাইভার আর খালাসি। বুঝতেই পারছেন, তাদের হাত দিয়ে কিরকম পয়সা বেরোয়। তবু যদি বলেন, আপনাদের থানার হিস্যা পরের মাস থেকে পৌঁছে দেব।'

বিপ্রদাস বলল, 'আমি হিস্যার জন্যে আসিনি।'

মাসি আবার সেই কুমির-হাসি হেসে বলল, 'সে আমি বুঝতেই পেরেছি। আপনার মুখ দেখলেই বোঝা যায় আপনি ওসবের উদধে। তাহলে আর কী করতে পারি বলুন।'

বিপ্রদাস মাসির চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি তিতলি যাদবের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। তিনি জানেন যে আমি এসেছি। তার কাছেই নিয়ে চলুন।'

মুহূর্তের মধ্যে মাসির চোখেমুখে রাগ আর ভয়ের যমজ-ছায়া খেলা করে গেল। দাঁত কিড়মিড় করে মাসি বলল, 'জানতাম ওই বিদ্যেধরী মাগি একদিন ঠিক আমাকে বিপদে ফেলবে। কী করেছে সেই পোকায় খাওয়া সুন্দরী, একবার আমাকে বলুন তো বাবু।'

'বিদ্যেধরী মাগি' আর 'পোকায় খাওয়া সুন্দরী' দুটো বিশেষণই বিপ্রদাসকে একটু অবাক করল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'না, না। উনি অন্যায় কিছু করেননি। আমি শুধু ওঁর কাছ থেকে দু-একটা ইনফর্মেশন নেওয়ার জন্যে এসেছিলাম।'

মাসিকে দেখে বিপ্রদাসের যতটা আতাক্যালানে বলে মনে হয়েছিল, দেখা গেল অতটা নয়। চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, 'মাগি দুর্গাপুরে যেখানে ভেজলিনের বাটি ভাড়া দিত, সেখানেই কিছু কাণ্ড বাঁধিয়ে আসেনি তো? ও বাবু?'

'এই চুপ!' পুলিশি হুঙ্কার দিয়ে উঠল বিপ্রদাস। 'একদম মুখখারাপ করবে না। শিগ্গির ডাকো ওনাকে।'

মাসি থতমত খেয়ে বলল, 'এখানে ডাকব? নাকি আপনি ওর ঘরে যাবেন?'

বিপ্রদাস এই প্রশ্নে ভারি দোটানায় পড়ে গেল। সত্যিকারে খোঁজখবর পেতে হলে তিতলির নিজের ঘরে যাওয়াই উচিত। কোথা থেকে কোন ক্লু বেরিয়ে আসে তা কি বলা যায়? এদিকে আবার যে-ঘরে লরির খালাসি আর ড্রাইভারেরা বিছানা পেতে শোয়, সেরকম ঘরে ঢোকার কথা ভেবেও তার গা গুলোচ্ছিল।

মাসি দেখা গেল মন পড়তে পারে। বিপ্রদাসের মুখের ভাব লক্ষ করে বলল, 'না বাবু, যা ভাবছেন তিতলির ঘর সেরকম নয়। ও বেবুশ্যে নয়। এই গুল-কয়লার ব্যবসায় একজন মস্ত বড় বিজনেসম্যান রয়েছেন নাম শুনে থাকবেন অন্ডালের বিল্টুবাবু। ভালো নামটা কী যেন বিজন উপাধ্যায় বোধহয়। তিনিই তিতলিকে ঘরভাড়া করে এখানে রেখেছেন। ওর আসল কাজ বিল্টুবাবুর কোম্পানির খাতা লেখা।'

বিপ্রদাস অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'খাতা লেখা? মানে অ্যাকাউন্টস মেইনটেইন করা?'

'তাই হবে। আমি অশিক্ষিত মেয়ে মানুষ, সঠিক বলতে পারব না। এখান থেকে ক'লরি মাল বেরোলো, কোথায় গেল, কার কাছে কত টাকা পাওনা রইল, এইসব হিসেব রাখে। তিতলির তো নিজের ল্যাকপ্যাক আছে, জানেন না?'

'ল্যাকপ্যাক!'

মাসি কোলের ওপর দু-হাতের আঙুল দিয়ে কি-বোর্ডের বোতাম টেপার ভঙ্গি করল। বিপ্রদাস হেসে ফেলল। 'ল্যাপটপ?'

'হুঁ।' মাসি লজ্জা পেল। 'ও মেয়ের এখানে আসার কথাই নয়। খুব শিক্ষিত মেয়ে। কেমন করে এসে পড়েছিল বলতে পারব না। সত্যি কথাই বলি আপনাকে স্যার, ও শরীর বেচবার কথাই আমাকে বলেছিল প্রথমে। শরীরও চাবুকের মতন। মুনিদেরও মতিভ্রম হয়ে যাবে। কিন্তু।'

'কিন্তু কী?'

'যতই কামপোকার কামড় খেয়ে হারামিগুলো ঘরে ঢুকুক, ওই মুখ দেখলে কি কেউ কিছু করতে পারে? কতজন ঘরে ঢুকে তিতলির মুখ দেখে আবার হাঁউমাঁউ করে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে।'

বিপ্রদাস কিছুই বুঝতে পারছিল না। ভাবছিল, ভুল জায়গায় চলে এলাম নাকি? পার্সোনাল ফাইলে তিতলি যাদবের পাসপোর্ট সাইজ ছবি দেখে তো তার মেয়েটিকে রীতিমতন চটকদার মনে হয়েছিল।

মাসি কথা থামায়নি। তখনো বলে চলেছিল, 'ভগবানের দয়ায় সেই সময়েই মেয়েটা বিল্টুবাবুর চোখে পড়ে গেল। বিল্টুবাবুর যে একটা পাড়ভাসান আছে, সে আমরা অনেকদিন থেকেই জানতাম।'

'পাড়ভাসান?' বিপ্রদাস আবার আকাশ থেকে পড়ল।

'আহা, আমি অশিক্ষিত মেয়েমানুষ। অত কি সঠিক করে বলতে পারি? বুঝতে পারেন না কেন? পাড়ভাসান মানে মনের বিকার।'

'ওঃ! পারভারসান।'

'ওই হল। উনি বরাবর খুঁজতেন কুচ্ছিৎ মেয়ে। তা তিতলির থেকে কুচ্ছিৎ মেয়ে উনি কোথায় পাবেন। বিল্টুবাবু তখন থেকেই তিতলিকে প্রায় রাখেল বানিয়ে ফেললেন। তিতলির কপাল খুলে গেল।'

'তারপর?'

'তারপর তো বললামই আপনাকে। এখন তিতলি ওঁর ম্যানেজারের কাজ করে। বিল্টুবাবু খুব পেয়ার করেন ওকে। রোজ রাতে একবার অন্তত অন্ডাল থেকে আমার এই কোঠায় ঢুঁ মেরে যান। ব্যাবসার খাতাও চেক করেন আবার খাতা যে লেখে তাকেও চেক করেন। খি খি খি খি!'

বিপ্রদাস আবার ধমকাল। 'চুপ করো। ওকে এখানেই ডাকো। দুটো কথা বলে চলে যাই। আর শোনো, যে এই ঘরে আড়ি পাতবে, তার কপালে দুঃখ আছে।'

## সাত

মিনিট দশেক বসে থাকার পরে ঘরের দরজায় একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো। মুখ দেখার আগেই তার ফিগার দেখে বিপ্রদাসের বুকটা কেঁপে উঠল। তন্বী শ্যামা বলতে যা বোঝায় একেবারে তাই। একটা সাধারন সুতিশাড়ি পরে আছে মেয়েটা। সাপের মতন লম্বা বিনুনি বুকের ওপর এনে আঙুল দিয়ে ডগাটা একবার জড়াচ্ছে, একবার খুলছে। মেয়েটার মুখটা তখনো দরজার পাল্লার ছায়ায় ঢাকা। বিপ্রদাস বলল, 'আপনি তিতলি যাদব? ভেতরে আসুন। কয়েকটা কথা জিগ্যেস করার আছে।'

মেয়েটা জড়তাহীন পায়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে এল। বিপ্রদাসের বুক দ্বিতীয়বারের জন্যে কাঁপল, তবে এবার রিখটার স্কেলে তার মাপ অনেকটাই বেশি। সে দেখল, তিতলির মুখের বাঁ-পাশটা অপূর্ব সুন্দর কিন্তু ডানদিকটা পুড়ে ঝামাপাথরের মতন কুঁকড়ে গেছে। বাঁ-দিকে হরিণের চোখ, ডানদিকে চোখের জায়গায় একটা মাংসরঙের ছোট গর্ত। ভুরু নেই, পলক নেই। এমনকী ডানদিকের কানের পাতাটা অবধি গুটিয়ে সাজা পানের মতন ছোট্ট হয়ে গেছে।

'কী করে হল?' কথাগুলো যেন আপনা থেকেই বিপ্রদাসের মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

তিতলি মাসির ছেড়ে যাওয়া মোড়াটা টেনে নিয়ে বসল। তারপর বলল, 'সুরেশ সিং-এর নাম শুনেছেন কি?'

'সুরেশ সিং মানে পটারি-বস্তির সুরেশ সিং? সে আপনাকে কোথায় পেল?'

'দুর্গাপুর বাজারে। দেখুন স্যার, আপনি আমার কাছে এসেছেন মানে ডক্টর প্রদীপ কামাথের মৃত্যুর তদন্তের ব্যাপারেই এসেছেন, তাই তো! কিন্তু ওটা সুইসাইড। ওর পেছনে আমার কোনো হাত নেই। বরং বলতে পারেন, সকেট গোখরোর মৃত্যুর ব্যাপারে পরোক্ষে আমার হাত ছিল। কীভাবে ছিল, আমি না বললে আপনি জানতে পারবেন না। কারণ আর যে জানে, অর্থাৎ সুরেশ সিং, তার কাছে আপনার মতন ছোটমাপের অফিসার কোনোদিন পৌঁছতে পারবেন না। আপনি যদি চান আমি পুরো ঘটনাটাই বলতে পারি।'

কিছুটা রেখেঢেকে প্রায় পুরোটাই বলল তিতলি। রুগ্না মায়ের কথা থেকে শুরু করে তার নিজের সুরেশ সিং-এর রক্ষিতা হয়ে যাওয়ার কথা, বি এস সি-তে তার ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করার কথা, তার আমেরিকায় যাবার স্বপ্নের কথা সবই বলল ধীরে-ধীরে। বলল, অকপটভাবে, শান্তস্বরে। বাচনভঙ্গি আর শব্দ নির্বাচনের

মধ্যে বিপ্রদাস ওর শিক্ষার পরিচয় পাচ্ছিল; আর একইসঙ্গে ওর মনে হচ্ছিল, একটা মেয়ের কপালে এত দুর্গতি থাকতে পারে?

সবশেষে তিতলি বিপ্রদাসকে বলল ওর স্বপ্নের কথা জানবার পরে সুরেশ সিং কীভাবে ওকে বেশ্যাবৃত্তিতে নামিয়ে দিয়েছিল তাও।

এতক্ষণ তিতলি শিরদাঁড়া সোজা করে বসেছিল। এবার বিপ্রদাসের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে খুব করুণ-গলায় বলল, 'কিন্তু বিশ্বাস করুন, খুনটা আমি করাইনি। গোখরো আমার এক সহেলির কাছ থেকে জানতে পেরে গিয়েছিল যে, আমার ফ্ল্যাটে সুরেশ সিং-এর নিয়মিত যাতায়াত আছে। সুরেশকে মারতে এসে ও নিজেই বলি হয়ে গেল, কারণ, গোখরোর দলের মধ্যে সুরেশ সিং-এর ইনফর্মার ছিল। ব্যস, এই ঘটনায় আমার ভূমিকা এইটুকুই।

'আর আমার দুর্গাপুরে আসার দিনটার সঙ্গে গোখরোর মৃত্যুদিন যে মিলে গিয়েছিল, সেটা নিতান্তই কো-ইনসিডেন্স।'

বিপ্রদাস উঠে দাঁড়াল। বলল, 'গোরখনাথের মার্ডারের কেসটা রি-ওপেন করাব। তখন আপনার এজাহার লাগবে। আপনি পালাবেন না আশা করি।'

তিতলি তার ভালো চোখটায় একরাশ বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে বলল, 'আমি পালাব! কোথায় পালাব? পালালেও লুকোব কীভাবে? এই কোঠির মালকিন সুরেশ সিং-এর নিজের লোক বলে আমাকে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছে। না-হলে বেশ্যাবাড়িতেও তো আমার স্থান হত না। আর শুনুন স্যার। আজ এই-মুহূর্তে আমার হাতে ঠিক পাঁচশোটি টাকা আছে।'

তিতলি ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা নোট বার করে বিপ্রদাসকে দেখিয়ে আবার ঢুকিয়ে রাখল। বলল, 'বিল্টুবাবুর থেকে চেয়েচিন্তে নিয়েছিলাম। মাসির নজর থেকে লুকিয়ে রেখেছি। তবে এখন ভাবছি, এটা নিয়েই বা কী করব? বাজারে বেরিয়ে শখের কেনাকাটা তো করতে পারব না। এখন আমার জীবনে একটাই ইচ্ছে পূরণ হতে বাকি আছে। সুরেশ সিংকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে দেখা। আপনি যদি আমার সেই শখটা মিটিয়ে দেবেন বলেন, তাহলে আপনার জন্যে আগামী একশোবছর আমি এখানেই অপেক্ষা করব।'

বিপ্রদাস বলল, 'ঠিক আছে। আমি দু-একদিনের মধ্যেই আবার আসব। তবে আজ আর একটা কথাই জেনে যেতে চাই। প্রদীপ কামাথের আত্মহত্যা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা? কেন উনি আত্মহত্যা করলেন? অন্য কিছু না, আপনি দীর্ঘদিন ওনার সহকারী ছিলেন, তাই আপনাকে জিগ্যেস করছি।'

তিতলি ভাবতে সময় নিল না। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তর দিল, 'জিনিয়াসরা অনেক সময়েই এক্সেন্ট্রিক হন, উনিও তাই ছিলেন। যখন-তখন মুড স্যুইং করত। এই হাসছেন তো এই গবেষণার কাগজপত্র হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছেন। এক্সেন্ট্রিক না হলে কেউ মৃত্যুর আগের মুহূর্তে ওরকম ক্রীতদাসের মতন ব্যবহার করে? হাতজোড় করছেন, ঘাড় নাড়ছেন, অদৃশ্য কারুর সঙ্গে কথা বলছেন। এসব দেখেও আপনাদের মনে কোনো সন্দেহ হয়নি? আশ্চর্য!'

বিপ্রদাস তিতলিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে প্রথমেই বুক ভরে শ্বাস টানল। হোক সালফারে আর পাঁকের গন্ধ মেশা হাওয়া; তবু সেই হাওয়াটাকেই তখন তার বসন্তের বাতাসের মতন মিষ্টি লাগছিল। তিতলির ঘরের মধ্যে, তিতলির সামনে বসে তার কথা শুনতে-শুনতে মন যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল বিপ্রদাসের। কিছুটা সাড় ফিরল।

সিঁড়ির নীচে মাসি দাঁড়িয়েছিল। বিপ্রদাস যাবার সময় তাকে বলে গেল, 'তিতলি যাদবের মুখে যখন অ্যাসিড ঢালা হচ্ছিল, তখন তুমি এইখানে, এইভাবেই দাঁড়িয়েছিলে তো? কান খুলে শোনো মাসি! এমনিতে তুমি বাঁচবে না। তবে আমি তোমাকে বাঁচিয়ে নেব যদি কথা দাও কাল কিম্বা পরশু আমি যখন ফিরছি, তার আগে একটা মাছিও এই কোঠি থেকে বেরোবে না।'

মাসির থলথলে মুখটা নিমেষের মধ্যে কাগজের মতন সাদা হয়ে গেল। সে বোধহয় ভাবতে পারেনি, তিতলি পুলিশকে সবকথা বলে দেবে। তাই বিপ্রদাসের কথা শুনে মাসি কোনোরকমে শুধু ঘাড়টাকে একদিকে হেলাতে পারল।

অবশ্য পাঁচমিনিটের মধ্যে ওই মাসিই সুরেশ সিংকে ফোন করে বলল, 'আব হামারা কেয়া হোগা? তিতলিনে পোলিশবালোকো যো সবকুছ বাতা দিয়া।'

সবকিছু শুনে সুরেশ সিং উত্তর দিল, 'কিঁউ আপ ঝুটমুট ঘাবড়াতি হ্যায় বুয়া? বেফিকর রহিয়ে। হাম সবকুছ সামহাল লেঙ্গে। বিল্টুবাবু আভি উধারই হ্যায় না? বাহার তো নেহি গিয়া?'

মিশিরজির কোঠি থেকে বেরিয়ে একটা মোড় ঘোরার পর বিপ্রদাস পকেট থেকে মোবাইল বার করল। সুধীর মাইতি সাহেবের সঙ্গে এক্ষুনি একবার কথা বলাটা ভীষণ জরুরি। কিন্তু পাঁচ-সাত মিনিট ধরে ক্রমাগত চেষ্টা করেও কনেক্ট করতে পারল না। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। টাওয়ারের কানেকশন এখানে মাঝে-মাঝেই এরকম গড়বড় করে।

ইতিমধ্যে সে সুজিতের গাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। কী যেন ভেবে নিয়ে বিপ্রদাস সুজিতকে বলল, 'গ্লাভস কম্পার্টমেন্টে একটা রাইটিং-প্যাড আছে, দে তো।'

সুজিতের হাত থেকে প্যাডটা নিয়ে খসখস করে কাগজে লিখল, 'ফোনে আপনাকে কানেক্ট করতে পারছি না। তিতলি প্রদীপ কামাথের আত্মহত্যার ব্যাপারে অনেক কিছু জানে, যেগুলো বলছে না। ওকে এক্ষুনি কাস্টডিতে নেওয়া দরকার। আপনি স্যার একটা টিম পাঠান। সেই টিমে অন্তত দুজন হলেও লেডি-অফিসার রাখবেন। অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টও পাঠাবেন। বিপ্রদাস।'

কাগজটা ভাঁজ করে সুজিতের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বিপ্রদাস গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বলল, 'যা। এটা বড়সাহেবের হাতে দিবি। অন্য কাউকে নয়।'

সুজিত ভয়ার্ত স্বরে বলল, 'আপনি? আপনাকে একা রেখে আমি যাব না স্যার।'

বিপ্রদাস কঠিন গলায় বলল, 'আমার যাবার উপায় নেই। চিন্তা করিস না। আমার কিছু হবে না। তুই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘুরে আয়।'

সুজিত আর কথা না বাড়িয়ে দুর্গাপুরের দিকে রওনা হয়ে গেল। বিপ্রদাস একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল, কেউ ওকে দেখছে কিনা। না। আপাতত ধারে কাছে কেউ নেই। ঘড়ি দেখল। রাত ন'টা। বৃষ্টিটা এবার জোরে নেমেছে। সেটা একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। তবে অন্যদিকে ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটায় তার কাঁপুনি লেগে যাচ্ছিল।

কিছু করার নেই। আজ ভিজতে হবে।

ভিজতে-ভিজতেই আবার মিশিরজির কোঠির দিকে ফিরে চলল বিপ্রদাস। তবে পুরোটা গেল না। কোঠি থেকে কিছুটা দূরে একটা চালাঘর ছিল। এমনিতে সেটার নীচে নিশ্চয় কোনো চায়ের দোকান-টোকান বসে; তবে তখন শুধু একটা নেড়িকুকুর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। বাড়িটার দিকে লুকিয়ে নজর রাখবার পক্ষে এত ভালো জায়গা আর হয় না। বিপ্রদাস মাথা নীচু করে চালাটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। কুকুরটা ওকে দেখে ভুক-ভুক করে দুবার ডাকল। তারপর আবার থাবার মধ্যে মাথা গুজে ঘুমিয়ে পড়ল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একটা কালো মার্সিডিজ খানাখন্দের ওপর দিয়ে টলতে টলতে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। নেড়িটা যেভাবে একবার মাত্র ঘাড় তুলে গাড়িটাকে দেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ল, তাতে বিপ্রদাসের মনে হল গাড়িটা ওর চেনা।

গাড়ির দরজা খোলা আর বন্ধ করার আওয়াজে বিপ্রদাস বুঝতে পারল গাড়ি থেকে কেউ নামল।

মিসিরজির কোঠির ভাঙাচোরা সদর দরজার ঠিক মাথার কাছে খোলা তার থেকে একটা বালব ঝুলছিল। স্বাভাবিক-রাতে ওই আলোতেই নিশ্চয় এ-বাড়ির খরিদ্দাররা জিনিস পছন্দ করে। আজ বাদলার রাতে না আছে খরিদ্দার, না বিক্রেতা। গাড়ি থেকে যে নেমেছিল, সে ওই আলোর বৃত্তের মধ্যে দিয়েই কোঠির মধ্যে ঢুকল। তখনই কয়েক সেকেন্ডের জন্যে বিপ্রদাস লোকটাকে দেখতে পেল। বেঁটে মোটা কদাকার একটা অবয়ব। কিন্তু আয়তনের তুলনায় অসম্ভব চটপটে পায়ে ছোট্ট একটা লাফে উঁচু চৌকাঠ ডিঙিয়ে লোকটা বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

এ-ই নিশ্চয়ই বিল্টুবাবু! কোল-মাফিয়া বিজন উপাধ্যায়। ওর অপারেশনের জায়গা রানিগঞ্জ, তাই বিপ্রদাস ওর সুরত কখনো দেখেনি।

হঠাৎই বিপ্রদাসকে অবাক করে দিয়ে আরো একটা গাড়ি প্রায় নিঃশব্দে বিল্টুবাবুর গাড়িটার ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল। এতটা নিঃশব্দে যে আসতে পারল, তার কারণ, গাড়িটা বিদেশি। অন্ধকারের মধ্যে গাড়ির মেক কিম্বা মডেল কিছুই বুঝতে পারছিল না বিপ্রদাস। তবে ল্যান্ডরোভার হবার সম্ভাবনা বেশি। কোনো দেশি গাড়ির চাকায় অত চওড়া রেডিয়ালের টায়ার লাগানো থাকে না। এসব গাড়ি জাঙ্গল-সাফারির পক্ষে উপযুক্ত, কিম্বা পাথর ছড়ানো পাহাড়ি উপত্যকা র‍্যাফলিতে। ওয়ারিয়ার খানাখন্দে ভরা রাস্তা তো এই-গাড়ির কাছে রাজপথ।

ওই দ্বিতীয়-গাড়িটা থেকে কিন্তু কেউ নামল না উঠলও না। ততক্ষণে অন্ধকারে চোখদুটো অনেকটা সয়ে এসেছে বলেই বিপ্রদাস বুঝতে পারল, গাড়িটায় ড্রাইভার ছাড়াও আরো দুজন লোক রয়েছে। একজন ড্রাইভারের পাশের সিটে। আরেকজন পেছনের সিটে। তার মানে বিল্টুবাবু একা আসেননি। সঙ্গে খুনখারাপির জন্যে হেঞ্চম্যান নিয়ে এসেছেন।

ব্যাপারটা বোঝামাত্রই বিপ্রদাস শেলটার নিল। চালাঘরটার ভেতরে এককোণায় একটা পাকাপোক্ত মাটির উনুন আর তার ঠিক পাশেই একটা লোহার তৈরি জলের ড্রাম নামানো ছিল। বিপ্রদাস খুব সাবধানে বেঞ্চি ছেড়ে ওই উনুন আর জলের ড্রামের পেছনে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল। তারপর পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে দেখল, যদি মাইতি-সাহেবকে একটা মেসেজ অন্তত পাঠানো যায়।

নাঃ, চান্স নেই। এখনো টাওয়ারের নাগাল পায়নি ওর সেলফোন।

বেকার-যন্ত্রটাকে পকেটে ভরে রেখে কোমরের হোলস্টার থেকে কাজের যন্ত্রটাকে বার করে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল বিপ্রদাস। দুটো খুনে গুন্ডা যখন দশফিট দূরত্বে বসে জমি মাপে, তখন মোবাইলের চেয়েও একটা কোল্ট রিভলভার যে অনেক বেশি ভরসা জোগায় সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

মিশিরজির কোঠার দোতলার সবচেয়ে বড় ঘরটা মাসি তিতলির জন্যে ছেড়ে দিয়েছে। দিতেই হয়েছে। বিল্টুবাবু যে কেন ওই মুখপোড়া মেয়েটার জন্যে এরকম পাগল হল, পঞ্চাশ বছরের ওপর কাম-রিপুর কারবারি হয়েও মাসি তা বুঝতে পারে না। মাঝে-মাঝে মনে হয় যাদুটোনা জানে মেয়েটা।

সত্যিই জানে। মাসি নিজে অনেকবার বিল্টুবাবুকে নিয়ে দরজা বন্ধ করার পর তিতলির ঘরের জানলায় কান পেতেছে। কানে কিছু শুনতে পায়নি কখনো, তবে প্রতিবারই মাসির নাকে ভারি অদ্ভুত একটা গন্ধ এসেছে। গন্ধটা কোনো জানোয়ারের শরীরের গন্ধের মতন। মাদি-জানোয়ারের। সহ্য করা যায় না।

কিছুক্ষণ পরেই সেই গন্ধ মিলিয়ে গেছে। তারপর শুরু হয়েছে শীৎকার আর ঘন শ্বাসের শব্দ। সেগুলো তো স্বাভাবিক। কিন্তু তার আগের ওই গন্ধটা কিসের? একদিন আর না পেরে মাসি তিতলিকে গন্ধটার উৎস জিগ্যেস করে বসেছিল। ধূর্ত মেয়েটা বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল, অমন কোনো গন্ধের কথা তার জানা নেই।

ওই ঘরেই এখন তিতলি শুয়ে আছে। তার পেটিকোট আর শাড়ি পায়ের কাছে জড়ো করা রয়েছে, ব্রা আর ব্লাউজ মাথার পাশে। বকফুলের পাপড়ির মতন মসৃণ বুক পেট আর উরু থেকে নাইটল্যাম্পের নীল

আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে ওই নীল আলো যেন তার শরীরের চামড়া ফুঁড়েই ফুটে বেরোচ্ছে। এই অবস্থায় তিতলির পোড়ামুখের দিকে তাকালে তাকে মনে হবে এক অন্য গ্রহের প্রাণী, যার অনিন্দ্যসুন্দর শরীরটা মানবীর কিন্তু মুখটা দুঃস্বপ্ন দিয়ে তৈরি।

তিতলি অন্যমনস্কভাবে হাতের ফোনটা নিয়ে খেলা করতে-করতে একটা কথাই ভাবছিল। এত বড় বোকামিটা সে কেমন করে করে বসল? কেমন করে সে বিপ্রদাসের সামনে বলে বসল প্রদীপ কামাথের শেষ প্রতিক্রিয়াগুলোর কথা। তার তো জানার কথা নয়। যদি ইনস্টিটিউটের ওরা সি.সি. টিভির ফুটেজ দেখে থাকে তাহলে আলাদা কথা। না-হলে ওদেরও জানার কথা নয়।

সে জানত, কারণ প্রদীপ কামাথের শরীরে যে-জাতের মডিফায়েড প্যারাসাইট সে ঢুকিয়েছে, তাতে হ্যালুসিনেসনের ধরনটা ওরকমই হবার কথা।

ঠিক আছে। জানত তো জানত। পুলিশ অফিসারের সামনে বলতে গেল কেন?

এর একটা উত্তর তিতলির কাছে আছে। সে নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। বাইরে যতই শান্ত-ভাব দেখাক, বিপ্রদাস মণ্ডল নামে ওই অফিসারটির সামনে বসে থাকতে তার ভয় করছিল। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল, নামটা মান্ধাতার বাবার আমলের হলেও ছেলেটা আধুনিক। সাজপোশাকে নয়, দৃষ্টিভঙ্গিতে। ও এই জমানার ব্যুরোক্রাট যে ব্যুরোক্রেসির সঙ্গে কর্পোরেট-ওয়ার্ল্ডের খুব বেশি তফাত নেই। এরা আগের চেয়ে অনেক বেশি ইনফর্মড, অনেক বেশি টেক-স্যাভি। এরা প্রয়োজনে বাঁধা গতের বাইরে বেরিয়ে ভাবতে পারে। যাকে বলে 'প্যারালাল থিঙ্কিং'।

ওর সামনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে, যে প্রদীপ কামাথের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো কেমন হতে পারে সেটা বলে ফেলেছিল।

এবং ওর সেই কথাগুলো শোনামাত্রই বিপ্রদাসের ভুরুদুটো এক মুহূর্তের জন্যে কুঁচকে গিয়েছিল। একমুহূর্তের জন্যে কিন্তু সেটাই তিতলির পক্ষে ছিল যথেষ্ট। সে বুঝতে পেরেছিল যে, ধরা পড়ে গেছে।

যাগগে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন এই জায়গাটা ছেড়ে পালাতে হবে। পালাতে হবে অনেক দূরে, শুরু করতে হবে জীবনের নতুন একটা চ্যাপটার। তারই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে ওখানে।

তিতলি কনুইয়ের ওপরে ভর দিয়ে রতিক্লান্ত শরীরটাকে একটু তুলল। দেখল, ঘরের অন্যদিকে একটা টেবিলের ওপরে টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় বিল্টুবাবু একটা একটা করে কাগজ চেক করে অ্যাটাচি-কেসের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখছেন। ওখানেই রয়েছে তার স্টুডেন্ট-ভিসা, পাসপোর্ট, প্লেনের টিকিট, মেলবোর্ন-ইউনিভার্সিটির রিসার্চ ফেলোশিপের কাগজপত্র। বিজন উপাধ্যায়ের মতন একজন মাফিয়া ছাড়া মাত্র তিনমাসের মধ্যে এই জিনিসগুলো জোগাড় করা কোনো ভদ্রলোকের সাধ্য ছিল না।

বেচারা বিজন উপাধ্যায়! বেচারা বিল্টুবাবু। তিতলির সঙ্গে গত তিনমাসের সহবাসে যার শরীর ভরে গিয়েছে প্যারাসাইটে। প্যারাসাইটগুলো যতই ওর সেন্ট্রাল-নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে জমিয়ে বসছে, ততই ওর কাজকর্ম হয়ে উঠছে আরো নিখুঁত, আরো একমুখী। পয়সার লালচ নয়, প্রতিপত্তির গরম নয়। এখন বিজন উপাধ্যায়ের সমস্ত অ্যাক্টিভিটির অভিমুখ শুধু তিতলির কেরিয়ার।

তিতলির মাথার মধ্যে একটা ছবি ভেসে উঠল। কতবার কতরকমের মিডিয়ায় যে সে ছবিটা দেখেছে তার সীমা-পরিসীমা নেই। বইয়ে দেখেছে, ইন্টারনেটে দেখেছে, অ্যানিমেটেড ফিল্মে দেখেছে। চাক্ষুষ দেখেনি কখনো। তবে সেই শখটাও মিটে গেছে বিল্টুবাবুকে দেখে।

ছবিটা আর কিছুই না একটা গাছের ডালে ছোট-ছোট মুড়ির দানার মতন অনেকগুলো পোকার লার্ভা, আর সেই ডালেই, লার্ভাগুলোর পাশে বসে রয়েছে একটা শুয়োপোকা। দেখলে মনে হবে কী সুন্দর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। কিন্তু পেছনের গল্পটা অন্যরকম।

Glyptapanteles হচ্ছে এক-জাতের পরজীবী বোলতা, যারা শুয়োপোকাদের শরীরে ডিম পেড়ে যায়। তারপর শুয়োপোকার সঙ্গে-সঙ্গে তার পেটের মধ্যে বোলতার লার্ভাগুলোও বাড়তে শুরু করে। পুরোপুরি

বেড়ে উঠলে লার্ভাগুলো শুয়োপোকার শরীর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, কিন্তু তার আগে লার্ভাগুলো শুয়োপোকাটার ওপর কি জাদু করে আসে কে জানে, দেখা যায় শুয়োপোকাটা মায়ের মতন ওই বোলতার বাচ্চাগুলোকে আগলাচ্ছে।

মুখের লালা দিয়ে তাদের ঢেকে রাখছে, পিপড়ে-টিপড়ের মতন ক্ষতিকর জীবরা কাছে এলে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে তাদের তাড়া করছে। সহজ কথায়, যে-লার্ভাগুলোর জন্যে সে মরতে বসেছে, মৃত্যুর আগের মুহূর্ত অবধি তাদের বাঁচানোর জন্যেই সম্মোহিত শুয়োপোকাটা প্রাণপাত করে যায়।

বিল্টুবাবুও বাঁচবে না। কিন্তু মরার আগে অবধি ও তিতলিকে বাঁচিয়ে যাবে।

কাকে বাঁচাবে? না, সেই তিতলিকে, যার অর্ধেকটা মুখ অ্যাসিডে পোড়া।

কে বাঁচাবে? না, সেই বিজন উপাধ্যায়, যে কিনা কয়েকমাস আগেও তার গলফগ্রিনের ফ্ল্যাটে, মাসে অন্তত একদিন, টালিগঞ্জের কোনো না কোনো রূপবতী উঠতি নায়িকার সঙ্গে রাত কাটাত।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই তিতলি তাড়াহুড়ো করে শাড়িটা কোনোরকমে গায়ে জড়িয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে এল। তারপর অর্ধনগ্ন-শরীরেই বিল্টুবাবুর পেছনে দাঁড়িয়ে, ওর মাথাটা দু-হাতে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলল, 'শোনো ডার্লিং! থানার ওই ছোটবাবু মোস্ট প্রোব্যাবলি হারুদার ঝুপড়ির নীচে বসে এই বাড়ির ওপরে নজর রাখছে। তুমি এসে পৌঁছবার একটু আগে কুকুরটা কয়েকবার ডেকে উঠেছিল। তখন এই জানলার ফাঁক দিয়ে ভেতরে মানুষের নড়াচড়াও দেখতে পেয়েছিলাম। সেইজন্যেই বলছি, ছোটবাবুর সঙ্গে একটু ট্রিক্স খেলতে হবে। পারবে তো?'

বিল্টুবাবু অ্যাটাচি-কেসটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। তেতো-গলায় বলল, 'ওসব ট্রিক্স-ফিক্স আমার লাইন নয়। পেছনের গাড়িতে আখতার আর শীতলের হাতে দুটো আমেরিকান মেশিন আছে। ওরা আমাদের কভার করে নিয়ে যাবে। বস্তিতে ঢোকার মুখেও একটা দলকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। বলে রেখেছি বিপ্রদাস মণ্ডলের গাড়ি যেন এখান থেকে দুর্গাপুরে ফেরত না যায়।'

'গাড়ি তো আটকাবে। ফোন-কল আটকাতে পারবে? ও তো ফোন করে ফোর্স ডেকে নেবে।'

বিল্টুবাবু মুচকি হেসে বলল, 'এখান থেকে ফোনের কানেকশন পাওয়া অত সহজ? জবরদখল বস্তিকে গভর্মেন্ট কতভাবে কোনঠাসা করে রেখে দিয়েছে জানো না।'

তিতলি কিছুক্ষণ দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'উঁহু। আমি সিওর, থানা থেকে আরো ফোর্স আসছে। শোনো, মুখে যাই বল, ওদের সঙ্গে তুমি পেরে উঠবে না। তাই একটু মন দিয়ে আমার প্ল্যানটা শোনো।'

বেশ কিছুক্ষন ধরে তিতলি বিল্টুবাবুকে কী যেন বোঝাল। তারপর অ্যাটাচড ওয়াশ-রুমে ঢুকে ড্রেস পরে বেরিয়ে এল। ওকে দেখে বিল্টুবাবু একবার হেসে উঠেই চুপ করে গেল।

জলের ড্রামটার পেছনে বসে বিপ্রদাস সেই হাসির শব্দটা পরিষ্কার শুনতে পেল। সে মনে-মনে বলল, 'আর কিছুক্ষণ এইভাবে হেসেখেলে কাটা শুয়োরের বাচ্চা। আর একটু সময় দে আমাকে। তারপর তোদের নিয়ে কী করতে হয় আমি দেখে নিচ্ছি।'

## আট

বিপ্রদাস ওয়ারিয়ার কয়লা-বস্তির উদ্দেশে বেরিয়ে যাবার একঘণ্টার মধ্যে ও.সি. সুধীর মাইতি থানা থেকে বেরিয়ে দুর্গাপুর রেলওয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। একাই। আপ অগ্নিবীণা এক্সপ্রেসের এ.সি. কোচ থেকে যারা নামলেন তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন তাঁর অতিথি। তাঁরই রিকোয়েস্টে ওদের আজ এখানে আসা।

অ্যারেঞ্জমেন্টটা এখনো অবধি তিনি যথাসাধ্য গোপন রেখেছেন। এমনকী বিপ্রদাসকেও এ-ব্যাপারে কিছু বলেননি। কারণ আছে। এই ধরনের কাজে হঠাৎ স্ট্রাইক করতে হয়; না-হলে সব ঘেঁটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিছুদিন আগে এক ট্রান্সপোর্ট-কোম্পানির অফিসে রেইড করার সময় তিনি নিজের চোখে দেখেছেন, পুলিশ এসেছে এই খবরটা পাওয়া মাত্রই চেন্নাইয়ের মেন-সার্ভার থেকে এখানে দুর্গাপুরের টার্মিনালগুলোর সব ডেটা কীভাবে উড়িয়ে দিয়েছিল। আজকে তাই তাঁর প্ল্যান, যতক্ষণ না প্রদীপ কামাথের ল্যাবরেটরির কম্পিউটারগুলোর কন্ট্রোল হাতে পাচ্ছেন, ততক্ষণ শুভময় চ্যাটার্জি আর বলরাম রায়কে চোখের আড়াল হতে দেবেন না। মোবাইলে হাত ঠেকাতেও দেবেন না।

গেস্ট দুজনের মধ্যে একজনের নাম নাম অনির্বাণ মিত্র। বয়স ত্রিশের নীচে। রোগা ছোটখাটো চেহারা। পিঠে ল্যাপটপের ব্যাগ, কানে ইয়ারপ্লাগ। উপরন্তু চুলের রগ-চাঁছা ছাট এবং ঠোঁটের নীচে ছাগলদাড়ি দেখলে তাকে কোনো ব্যাক-অফিসের আই-টি ভাই ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। কিন্তু যারা জানে শুধু তারাই জানে, অ্যানিমিটারের মতন এথিকাল-হ্যাকার ইস্টার্ন রিজিয়নে খুব কমই আছে (ওর মেল অ্যাকাউন্টের নাম অ্যানিমিটার)। ক্যালকাটা পুলিশের সাইবার-ক্রাইম শাখা বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে ওর সাহায্য নিয়ে থাকে। আজ সেরকমই একটা বিশেষ কাজে অনির্বানের দুর্গাপুরে আগমণ।

দ্বিতীয়জনের কথা আমরা আগে একটু শুনেছি। সায়েন্স কলেজের জীববিজ্ঞান বিভাগের প্রধান সত্যপ্রিয় বসাক। বয়স সাতান্ন। গোলগাল বেঁটেখাটো চেহারা। ছটফট করে ঘুরে বেড়ান, তড়বড় করে কথা বলেন। পোশাক-আশাক সবসময়েই গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট। তখনও যেমন, খুব দামি স্ট্রাইপড ফর্মাল শার্টের ওপরে একটা ক্যাটকেটে হলুদ সস্তার উইন্ডচিটার চাপিয়ে প্লাটফর্মের চা-ওলার থেকে ভাঁড়ের চা খাচ্ছিলেন।

সুধীর মাইতি খুঁজেপেতে দুজনকেই কালেক্ট করে নিজের গাড়িতে তুললেন। গতকালই হেড-কোয়ার্টারের পারমিশন নিয়ে উনি এই দুজনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছিলেন। পুলিশের ডাক বলে কথা, কাজেই বিস্তারিত কিছু না জেনেও দুজনেই আসতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন।

তবে তারপরেও মাইতি-সাহেবের একটা দায়িত্ব থাকে কাজের নেচারটা সম্বন্ধে আগে থেকে ওদের একটু ওয়াকিবহাল করে রাখা।

স্টেশন থেকে সিমবায়োটিকের ক্যাম্পাসে পৌঁছতে যে মিনিট কুড়ি সময় লাগে, সেই সময়টুকুই মাইতিসাহেব কাজে লাগালেন। প্রদীপ কামাথের আশ্চর্য আত্মহত্যার কথা বললেন। তাঁর রিসার্চ-অ্যাসিস্ট্যান্ট তিতলি যাদবের অন্তর্ধানের কথা বললেন। এমনকী ফুলবাগানের এক উঠতি মাফিয়ার সঙ্গে যে তিতলি যাদবের যোগাযোগ থাকতে পারে, সে-কথাও লুকোলেন না।

এই অবধি শুনে গাড়ির জানলা দিয়ে পানমশলার পিক ফেলে অনির্বাণ মিত্র বলল, 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি স্যার?'

সুধীর মাইতি বললেন, 'সিমবায়োটিকের ক্যাম্পাসে যাচ্ছি ব্রাদার। ডক্টর কামাথের ল্যাবরেটরিটা কালকের মধ্যে আনসিল করে দিতে হবে। ওপরতলা থেকে হেভি চাপ আসছে। আপনাদের দুজনের কাছে অনুরোধ, তার আগে ওই ল্যাবরেটরি থেকে যতটা সম্ভব ইনফর্মেশন আমাকে জোগাড় করে দিন। ল্যাবরেটরির নোটবুক, ইনস্ট্রুমেন্টস, স্যাম্পল, স্লাইড এগুলো, প্রফেসর বসাক, আপনি দেখে নিন। আর অনির্বাণ ভাই! তুমি ওই রুমের কম্পিউটারগুলো থেকে ডাটা রিকভার করো।'

'ওক্কে'। অনির্বাণ আবার ইয়ারপ্লাগ দুটো কানে গুঁজে, ফেডেড জিনসের হাঁটুর ওপরে আঙুল দিয়ে র‍্যাইপের বোল তুলল।

সত্যপ্রিয় বসাকের প্রতিক্রিয়াটা অত সহজ হল না। সুধীর মাইতির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি বললেন, 'তিতলি নামে মেয়েটি ছিল আমার স্টুডেন্ট। আমিই ওকে ডক্টর কামাথের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে সিমবায়োটিকে রেফার করেছিলাম। আপনি সেটা জানেন নিশ্চয়ই।'

সুধীর মাইতি বললেন, 'জানি স্যার। ওর পার্সোনাল ফাইলে সেই রেকমেন্ডেশন লেটার দেখেছি।'

'আই সি।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে রইলেন প্রফেসর বসাক। তারপর বললেন, 'তারপরেও আমাকেই এই কাজের জন্যে ডাকলেন কেন? অ্যাম আই আন্ডার ইওর স্ক্যানার? আমাকে কি আপনারা কোনোভাবে সন্দেহ করছেন?'

'হা-হা' করে উঠলেন সুধীর মাইতি। 'কী বলছেন স্যার? আপনাকে ডাকলাম কারণ আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ডক্টর কামাথের কাজের যে ফিল্ড, জিন গ্র্যাফটিং না জিন এডিটিং কী যেন বলেন আপনারা, ও-ব্যাপারে আপনিও একজন অথরিটি। ইন-ফ্যাক্ট, আপনারা দুজনে কিছুদিন আমেরিকার একই ইনস্টিটিউটে পড়িয়েছিলেন। দ্বিতীয় একটা কারণও আছে অবশ্য। আমার সন্দেহ তিতলি যাদব কলকাতা থেকে এখানে আসার সময়, আপনাদের সায়েন্স কলেজ থেকে কিছু ডাটা, কিছু নো-হাও চুরি করে এনেছিল। আপনি যদি সার্চ-টিমের মধ্যে থাকেন, তাহলে চট করে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন।'

প্রফেসর বসাক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ব্যাকরেস্টে হেলান দিয়ে বসলেন। নিজের মনেই বললেন, 'তিতলি একটা অদ্ভুত মেয়ে ছিল, জানেন। ওরকম ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট আমি আমার এই পঁচিশ-বছরের টিচিং-লাইফে কমই দেখেছি। যেমন ব্রিলিয়ান্ট তেমনি পরিশ্রমী। জিন গ্র্যাফটিং-এর ফিল্ডে দেশ-বিদেশের কোথায় কী ইন্টারেস্টিং কাজ হচ্ছে, সব খবর যেন ওর নখদর্পণে থাকত। কিন্তু একইসঙ্গে কী বলব একটু যেন অস্বাভাবিকও লাগত ওকে।'

'কেন বলুন তো।' প্রশ্ন করলেন মাইতিসাহেব।

'আমি এর আগে কাউকে এত তৃপ্তি নিয়ে প্যারাসাইটোলজির চর্চা করতে দেখিনি। আপনি জানেন কিনা জানি না, প্যারাসাইটরা যেভাবে হোস্টদের তিলে-তিলে খুন করে সেটা এক বীভৎস ব্যাপার। দেখলে গা গুলিয়ে যায়। আমরা তো কোন ছাড়, স্বয়ং চার্লস ডারউইন অবধি একবার বলেছিলেন, ঈশ্বর প্যারাসাইট সৃষ্টি করেছেন এটা ভাবতে পারি না। অথচ ওই মেয়েটা, ওই তিতলি যাদব, বিশ্বাস করুন ওকে আমি নিজের চোখে দেখেছি হাতের পাতায় বোলতার লার্ভা নিয়ে তাদের চুমু খাচ্ছে। এই প্যাশনটা আমার অস্বাভাবিক লাগত।'

সুধীর মাইতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাদের খুব টর্চারড চাইল্ডহুড থাকে স্যার, তাদের মনটা কোনো না কোনোভাবে বিকৃত হয়েই যায়। তিতলির শৈশব আর কৈশোর কেটেছিল নরকের মধ্যে। ওর পক্ষে এই অস্বাভাবিকতাটাই তাই স্বাভাবিক। চলুন দেখবেন, হয়তো ডক্টর কামাথের ল্যাবরেটরির মধ্যে ওর প্যাশনের আরো কিছু চিহ্ন খুঁজে পাবেন আপনি।'

প্রফেসর বসাক বললেন, 'সম্ভব। খুবই সম্ভব। সেকেন্ড-ইয়ারের শেষদিকে ও আমাদের ইনস্টিটিউটের মধ্যেই এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছিল, যেটা অন্য কোনো স্টুডেন্ট করলে আমি তাকে রাস্টিকেট করতাম। ওকে যে করিনি তার প্রথম কারণ, ও ছিল আউটস্ট্যান্ডিং। চিরকালই মাস্টারমশাইরা ক্লাসের ফার্স্টবয় কিম্বা ফার্স্টগার্লের দুষ্টুমিকে একটু ক্ষমার চোখে দেখেন। কী? দেখেন না? আর দ্বিতীয়ত, আমরা জানতাম ও খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করছে।'

সুধীর মাইতি সামনের সিট থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী করেছিল স্যার।'

'আপনি বিশ্বাস করবেন না, ওই বয়সের একটা মেয়ে, যে তখনো মাস্টার্স করেনি, সে একটা পোকার জিনকে প্রায় এডিট করে ফেলেছিল। তিতলি এটা করেছিল একদম কারেন্ট একটা টেকনোলজি কাজে লাগিয়ে, যেটাকে বলে ক্রিস্পার এনজাইম টেকনোলজি। চিন্তা করতে পারেন, সেই কাজে ভাইরাসের আর.এন.এ.-র বদলে ''লিপিড-ন্যানো-পার্টিকল'' ইউজ করেছিল!'

'সেটা কী জিনিস?'

'সহজ করে বলছি। ধরুন আপনি একটা সেলের জিন-এডিটিং করতে চাইছেন। নতুন জিনটাকে সেলের ভেতরে ঢোকানোর জন্যে আপনি কোনো একটা ভাইরাসের আর.এন.এ.-কে ইউজ করলেন। তখন হবে কি, মাদার-সেলের ইমিউনিটি-সিস্টেম ওই বাইরের ভাইরাসকে চিনতে পেরে সঙ্গে-সঙ্গে তাকে মেরে ফেলবে।

আপনার এক্সপেরিমেন্টটা ফেল করবে। লিপিড-ন্যানো-পার্টিকল সেদিক থেকে অনেক বেটার ক্যারিয়ার। ইমিউনিটি-সিস্টেম লিপিড-ন্যানো-পার্টিকলকে আউটসাইডার বলে বুঝতে পারে না।'

সুধীর মাইতি বললেন, 'তিতলি কী যেন একটা অপরাধ করেছিল বলছিলেন।'

'হ্যাঁ, সেটাই তো বলছি। যখনকার কথা বলছি, তার মাত্র মাস-দুয়েক আগে জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটিতে বসে ডক্টর প্রদীপ কামাথ এই লিপিড টেকনোলজিকে ঘসে মেজে কাজে লাগানোর মতন জায়গায় নিয়ে এসেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা মাস্টারমশাইরাও পুরোপুরি জানতাম না সেই টেকনোলজির কথা। অথচ আমাদের ওই ছাত্রীটি মাত্র বাইশ বছর বয়সে সেই টেকনোলজির কথা জেনেছিল শুধু তাই নয়, আমাদের সায়েন্স-কলেজের ল্যাবরেটরিতে বসেই সেই টেকনোলজি কাজে লাগিয়ে ফেলেছিল।

'ভাবতে পারছেন, একটা জিনকে প্রায় এডিট করে ফেলেছিল ওই মেয়ে। এটা তো অপরাধ। জিন-এডিটিং তো ছেলেখেলা নয়। আমাদের অজান্তেই একটা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তৈরি হয়ে যেতে পারত কিনা বলুন। ভাগ্যিস একেবারে শেষ মুহূর্তে আমাদের এক লেকচারারের চোখে পড়ে যায় ব্যাপারটা, তাই ওগুলোকে নষ্ট করে ফেলা গেছিল।'

সুধীর মাইতির পরের কথাগুলো শুনে বোঝা গেল, তাঁর ভাবনা নিজের লাইন ধরেই এগোচ্ছে। তিনি বললেন, 'তাহলে সিমবায়োটিকের মতন একটা অ্যাডভান্সড ল্যাবরেটরি যদি ওই মেয়ের হাতে এসে যায়, এবং তার সঙ্গে ডক্টর কামাথের লুকোনো নো-হাও, তাহলে ও কী করতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

সত্যপ্রিয় বসাক মাথাটা দু-দিকে নাড়লেন। বললেন, 'সেটা আমি ভাবতে পারছি না। ভাবতে চাইছিও না। দেখুন মিস্টার মাইতি, সিমবায়োটিকের নিজস্ব একটা ইন্টার্নাল-সিকিউরিটি সিস্টেম তো থাকবেই। যে-কেউ ওদের ল্যাবরেটরির মধ্যে যা ইচ্ছে করে যাবে আর ওরা তা জানতে পারবে না, তা তো হয় না।

'আর তাছাড়া ডক্টর কামাথকে আমি খুব ভালো করে চিনতাম। উনি অনেক বছর ধরে বিভিন্ন বণিক-সংস্থার হয়ে কাজ করছিলেন। ওইসব কাজে মন্ত্রগুপ্তি হচ্ছে প্রথম শর্ত। না-হলে সুযোগ পেলেই এক সংস্থার কাজ অন্য সংস্থা চুরি করে নিয়ে পালাবে। তাই ডক্টর কামাথ নিজের নো-হাও সামান্য একজন রিসার্চ-অ্যাসিস্ট্যান্টের হাতে তুলে দেবেন এটাও অভাবনীয়।'

সুধীর মাইতি বললেন, 'যদি এরকম হয় যে, তুলে দিয়েছিলেন বলেই ওঁকে সুইসাইড করতে হল।'

সত্যপ্রিয় বসাক কিছুক্ষণ চোখ বড়-বড় করে মাইতিসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আপনমনেই বললেন, 'সেখানে ক্রাইমের অ্যাঙ্গেল চলে আসছে। দ্যাট ইজ নট মাই কাপ-অফ-টি। ও-ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না।'

রাত ন'টার সময় সুধীর মাইতির পুলিশকার জোরালো হর্ন মেরে সোজা পোর্টিকোর নীচে গিয়ে দাঁড়াল। সিকিউরিটির লোকজন কাউকে কিছু জানানোর সুযোগই পেল না। চটপটে পায়ে শুভময় চ্যাটার্জির অফিসে ঢুকে মাইতি-সাহেব দেখলেন, ভাগ্য ভালো। বলরাম রায়ও ওখানেই বসে আছেন। আলাপ পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হতেই মাইতি-সাহেব বলে দিলেন, আমি পারমিসন না দেওয়া অবধি কম্পিউটারের দিকে হাত বাড়াবেন না। মোবাইলগুলোও টাচ করবেন না। সোজা আমাদের নিয়ে কামাথের ল্যাবরেটরিতে চলুন। আপনাদের সামনে সিল খুলব, আমার এই সহকারীরা কম্পিউটারের কন্ট্রোল নিজেদের হাতে নেবেন। তারপরে ফোনে হাত ঠেকাবেন। ক্লিয়ার?'

চ্যাটার্জি আর রায় দুজনেই হতভম্বমুখে ঘাড় হেলালেন এবং মাইতিসাহেবের টিমকে নিয়ে প্রদীপ কামাথের ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেন। অনির্বাণ চটপট দুটো ডেস্কটপ চেক করে নিয়ে মাইতিসাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রবলেম নেই স্যার। মেন-সার্ভার এখানেই আছে। বাইরে থেকে কেউ কিছু করতে পারবে না।'

এতক্ষণে শুভময় চ্যাটার্জি গলার আওয়াজ খুঁজে পেলেন। বললেন, 'অত্যন্ত আঘাত পেলাম স্যার। আমাদের একটা রেপুটেশন আছে। ওসব ছ্যাঁচড়ামি আমরা করব না।'

সুধীর মাইতি বাঁকা হেসে বললেন, 'সে তো বটেই। রেসপেক্ট আছে বলেই না প্রদীপ কামাথ যখন তিতলির সঙ্গে এই ঘরে শুত, তখন সি.সি. টিভি অফ করে রেখে দিতেন। যাই হোক, এখন আপনারা থাকতেও পারেন, কেটেও পড়তে পারেন। যাবার আগে যখন ঘরটা আনসিল করব, তখন আবার কিছু কাগজপত্রে সই লাগবে। তার আগে অবধি আপনারা ফ্রি।'

ওরা দুজন এক-পা দু-পা করে পিছিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। সেখান থেকেই শুভময় চ্যাটার্জি বললেন, 'আমরা তাহলে নিজেদের ঘরে গিয়ে বসছি স্যার। এখানে বিজয় রইল, আমাদের সিকিউরিটি গার্ড। খুব ভালো ছেলে। যদি কিছু প্রয়োজন হয় ওকে বলবেন।'

সুধীর মাইতি মুচকি হেসে বললেন, 'বিপ্রদাস বলছিল, আপনারা নাকি খুব দামি চা খান। মাঝে-মাঝে আপনাদের সেই চা-টা পাঠিয়ে দেবেন; আর ঘণ্টাখানেক বাদে ডিনার। আর কিছুর প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না। আপনাদের দুজনেরই ফোন নম্বর আমার কাছে আছে। দরকার হলে ফোনেই জানাব।'

'আওয়ার প্লেজার স্যার। এক্ষুনি এক রাউন্ড চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।' এই বলে শুভময় চ্যাটার্জি বলরাম রায়কে সঙ্গে নিয়ে লিফটের দিকে পা বাড়ালেন।

সুধীর মাইতি খেয়াল করেছিলেন ল্যাবরেটরিতে ঢোকামাত্রই প্রফেসর সত্যপ্রিয় বসাকের চোখেমুখে এক-ধরনের মুগ্ধতা ফুটে উঠেছিল। উনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কোন যন্ত্রের দাম কতখানি আর তাদের দিয়ে কী-কী কাজ করানো যায়। তিনি প্রফেসরের পাশে দাঁড়িয়ে গলা নামিয়ে বললেন, 'একধার দিয়ে সবকিছু দেখে যান স্যার। আউটকাম অফ এক্সপেরিমেন্টটা কিছু বুঝতে পারেন কিনা দেখুন।'

প্রফেসর বসাক একবার আড়চোখে মাইতি-সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অত সহজ নয়। এসব জায়গায় কোডেড ল্যাঙ্গুয়েজে ছাড়া কেউ কিছু লেখে না। কম্পিউটারাইসড ইনভেন্ট্রির সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে, শুধু টেস্টটিউব কিম্বা স্লাইড দেখে কিছুই বুঝতে পারব না।'

ওদিকে অনির্বাণ ততক্ষণে ঘরের দুটো ডেস্কটপ কম্পিউটারের মধ্যে একটার সামনে বসে গেছে। একটার পর একটা উইন্ডো ওর মাউসের ক্লিকে খুলে যাচ্ছিল।

একটু বাদে সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মাইতি-সাহেবের দিকে তাকালো। মাইতিসাহেব জিগ্যেস করলেন, 'কী হল?'

'এই ফাইলটা সিকিওর করা ছিল দেখে খুললাম। খুলে দেখছি রিসার্চ-সংক্রান্ত কিছু নয়; সবই মিস্টার কামাথের পার্সোনাল ট্রানজাকশনস। তবে ইন্টেরেস্টিং। ভদ্রলোক প্রতিভাবান ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু জীবনটাকেও উপভোগ করতে জানতেন। মাস্টারমশাই ফস করে এদিকে চলে আসবেন না তো?'

মাইতিসাহেব বললেন, 'আরে না, না। উনি ওইদিকে একটা ইলেকট্রিক গিটারের মতন মেশিনের সামনে বসে তন্ময় হয়ে কী যেন দেখছেন। কী দেখাবে দেখাও না।'

কী-বোর্ডের ওপরে দু-চার ঠোক্করে একটা ফোটো অ্যালবাম খুলে গেল। হালকা দাড়ি এবং শার্প নাক-মুখ নিয়ে প্রদীপ কামাথ সুদর্শনই ছিলেন। ছবিতে তার পরনে ছোট ট্রাঙ্ক আর কাঁধে রঙিন টাওয়েল। চোখে শেডস। সঙ্গে মানানসই এক বিকিনি-সুন্দরী। পটভূমি মনে হয় গ্রীস কিম্বা ইতালির কোনো সমুদ্রসৈকত।

একটা ন্যুডিস্ট-বীচেও অন্য এক সুন্দরীর সঙ্গে প্রদীপ কামাথের বেশ ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের অনেকগুলো ছবি দেখা গেল। সেই সুন্দরীর শরীরে সানক্রিম ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

প্রফেসর বসাকের সাড়া পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে অনির্বাণ ওই অ্যালবাম থেকে বেরিয়ে কেমন করে যেন অবলীলায় কামাথের সিকিওরড ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টে ঢুকে পড়ল এবং মন্তব্য করল, 'তবে সমস্ত একস্ট্রাভ্যাগেন্স সত্ত্বেও প্রদীপ কামাথ স্টিল রিমেইনড আ রিচ ম্যান। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স তো তাই বলছে।'

মাইতি-সাহেব তাই শুনে স্বগতোক্তি করলেন, 'অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয় আরো এক বিপন্ন বিস্ময়। লোকটার জীবনে পয়সার অভাব ছিল না। প্রেমের অভাব ছিল না। তাহলে সুইসাইড করল কেন? জ্যোৎস্নায় দেখিল সে কোন ভূত?'

অনির্বাণ কথাগুলো ঠিকমতন বুঝতে না পেরে শ্রাগ করল। তারপর অন্য ফোল্ডারগুলো চেক করতে শুরু করল। করতে-করতে একটা ফাইলে এসে সে আটকে গেল। মিনিট পনেরো কাজ করার পরেও ফাইলটা ওপেন করতে পারল না। এমনিতেই শীতকাল। উপরন্তু ঘরে হালকা করে এসি চলছিল। তবু ওর কপালে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম জমে উঠল। সুধীর মাইতি কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরে বললেন, 'কী হয়েছে ব্রাদার?'

অনির্বাণ বলল, 'মনে হচ্ছে এই কম্পিউটারটা আগেই কোনো হ্যাকারের হাতে পড়েছিল। কয়েকটা ফাইল এমনভাবে পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রোটেক্ট করেছে যে, খুলতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। তবে খুলে আমি ছাড়বই।'

ওর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল, এবং ওইভাবে টানা চল্লিশ-মিনিট চেষ্টা করার পর শেষ অবধি খুলেও ফেলল সেটাকে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে আড়মোড়া ভেঙে অনির্বান বলল, 'এবার মাস্টারমশাইকে বলুন টেক আপ করতে। এসব আমার ফিল্ড নয়। আমি বরং একটু ধোঁয়া খেয়ে আসি।'

অনির্বাণ কিছু ভুল বলেনি। ও বেরিয়ে যাওয়ার পর সুধীর মাইতি মনিটরে স্ক্রল করে দেখলেন, বিভিন্ন ফাইলে পাতার-পর-পাতা শুধু নানান মলিকিউলের বন্ডিং-এর জটিল থেকে জটিলতর ডায়াগ্রাম, কেমিকাল ইকুয়েশন এবং ডি.এন.এ.-র বিখ্যাত সেই ডাবল হেলিক্স। তার প্যাঁচের একেক জায়গায় একেক রকম রং—বোধহয় জিন এডিটিং-এর সূত্র। তাছাড়াও রয়েছে প্রচুর ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়ার কুষ্ঠি ঠিকুজি।

প্রফেসর সত্যপ্রিয় বসাক তখন অন্যান্য সব মেশিন চেক করা শেষ করে একটা ক্রায়োজেনিক-কনটেনারের ভেতর থেকে একটার পর একটা টেস্টটিউব বার করে কী যেন দেখছিলেন। মাইতি-সাহেব ডাকলেন, 'একটু এদিকে আসবেন স্যার?'

'বলুন।' তাঁর ডাক শুনে এগিয়ে এলেন প্রফেসর বসাক।

'দেখুন, এই কম্পিউটারটায় ডক্টর কামাথের ওয়ার্কিং-শিটসগুলো রয়েছে। এগুলো দেখে আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারবেন, ওঁর কাজ কিরকম এগোচ্ছিল? আচ্ছা, তার আগে ওঁর প্রোজেক্টটার কথা আপনাকে একটু বলে দিই।'

'ওঁর প্রোজেক্টের ব্যাপার আপনি কোত্থেকে জানলেন?'

'এই ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর মিস্টার চ্যাটার্জিকে একটু আগে দেখলেন না? উনিই বলেছিলেন। আমাকে বলেননি অবশ্য। বলেছিলেন আমার সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট বিপ্রদাস মণ্ডলকে।'

মাইতিসাহেব সংক্ষেপে প্রদীপ কামাথের স্পার্ম-সেল মডিফাই করার প্রোজেক্টটা সত্যপ্রিয় বসাককে বুঝিয়ে বললেন। তারপর পকেট থেকে মোবাইলটা বার করলেন। সোয়া-দশটা বাজল। বাড়িতে একটা ফোন করে জানিয়ে দেওয়া উচিত, ফিরতে দেরি হবে। তাছাড়া এই দুজন গেস্টের রাতে থাকার অ্যারেঞ্জমেন্টও করতে হবে, অবশ্য যদি রাতের মধ্যে কাজ শেষ হয় তবেই।

কিন্তু পকেট থেকে ফোনটা বার করে স্ক্রিনের দিকে তাকাতেই সুধীর মাইতির মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি চাপা-স্বরে বললেন। 'ওহ গড। ওহ মাই গড।'

ও.সি. সাহেবের অবস্থা দেখে অনির্বাণ এবং প্রফেসর বসাক দুজনেই নিজেদের চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে তাঁর দু-পাশে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কী হল মাইতিসাহেব?'

'কিছু না। কিছু না। ইউ প্লিজ ক্যারি অন। আমি আধঘণ্টার জন্যে একটু আসছি।'

সিকিউরিটির ছেলেটি অবাক হয়ে দেখল, থানার বড়বাবু লিফটের কথা ভুলে গিয়ে দুড়দাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছেন। শুধু নেমে যাচ্ছেন তাই নয়, নামতে-নামতেই তারস্বরে কাদের যেন অর্ডার দিয়ে যাচ্ছেন।

কয়েকটা কথাই মাত্র শুনতে পেল বিজয় নামে সেই ছেলেটি। ফোর্স রেডি রাখো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্ষুনি বেরোব। বললাম তো যতজনকে পারো ইত্যাদি।

পনেরো মিনিট নয়। আধঘণ্টা বাদে পুলিশের ইউনিফর্ম পরে এক চলন্ত পাহাড় ল্যাবরেটরি-ঘরে এসে ঢুকলেন। অত স্থূলকায় যে-কোনো মানুষ হতে পারেন বিশ্বাস করা মুস্কিল। অনির্বাণ আর প্রফেসর বসাক হা করে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। পাহাড়প্রমাণ লোকটি যখন কথা বললেন, তখন দেখা গেল তাঁর গলার স্বরটা বাচ্চাছেলের মতন সরু। সেই চিকন-গলাতেই তিনি বললেন, 'নমস্কার। আমি সাব-ইনস্পেকটর হরিনাথ পাল। মাইতি-সাহেব আমাকে বললেন, এখানে এসে বসে থাকতে। ওঁরা সবাই থানা ফাঁকা করে বেরিয়ে গেল।'

সত্যপ্রিয় বসাক বললেন, 'কোথায় গেল?'

হরিনাথ পাল উত্তরটা দিতে যাচ্ছিলেন। অনির্বাণ হাত তুলে তাঁকে থামাল। তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনি কিছু বলছেন?'

পাহাড়ের পেছন থেকে শুভময় চ্যাটার্জি যে উঁকি মারছেন, সেটা আর কেউ খেয়াল করেনি। শুধু অনির্বাণই দেখেছিল। শুভময় চ্যাটার্জি বললেন, 'হ্যাঁ। মানে আমাকেও মাইতিসাহেব এইমাত্র ফোন করেছিলেন। বললেন, একটা বিশেষ কাজে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। উনি না ফেরা অবধি পালসাহেব এখানকার চার্জে থাকবেন।'

হরিনাথ পাল গর্বিত-ভঙ্গিতে হাসলেন।

মিস্টার চ্যাটার্জি তখনো দাঁড়িয়েছিলেন। অনির্বাণ বলল, 'আর কিছু বলবেন?'

'আপনাদের ডিনারের ব্যবস্থা করেছিলাম। রাত হয়ে গেছে। তা, আপনারা ডাইনিং-রুমে যাবেন, না এখানেই পাঠিয়ে দেব?'

ওরা কেউ কিছু বলার আগেই সাব-ইনস্পেক্টর পালসাহেব কচি-গলায় বললেন, 'এখানেই পাঠিয়ে দিন। ডিউটি-আওয়ারের মধ্যে আমরা পোস্ট ছেড়ে নড়ি না।'

'ওকে স্যার।' মিস্টার চ্যাটার্জি চলে গেলেন।

অনির্বাণ বলল, 'হ্যাঁ, পালসাহেব, এবার বলুন তো, কী হয়েছে।'

'কী আর বলব স্যার? মাইতিসাহেব একটু আগে নাকি ফোন খুলে দেখেছেন, বিপ্রদাস হোয়াটস্যাপ মেসেজ পাঠিয়েছে। লিখেছে, 'কী হল স্যার আপনাদের? আমি যে লিখে পাঠালাম, আর্জেন্ট চলে আসুন। ওরা তো পালাবার প্ল্যান করছে।'

প্রফেসর বসাক অবাক হয়ে বললেন, 'বিপ্রদাস মানে তো আপনাদের সেকেন্ড-অফিসার। তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন? জানি না বিপ্রদাসবাবু কোথায় গিয়েছেন, কোন কাজে গিয়েছেন। কিন্তু লিখে যখন পাঠিয়েছিলেন, তখন দেরি করা তো ঠিক হয়নি।'

'আরে ধুউউর।' নাক দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করে হরিনাথ পাল একটা চেয়ারে সাবধানে বসলেন। তারপর বললেন, 'পাঠিয়েছিল বোধহয় ওর পেয়ারের ড্রাইভার সুজিতের হাত দিয়ে। সে-চ্যাংড়া তো থানাতে ফেরেইনি। ফিরলে কি আর আমরা বসে থাকি? কোথাও বোধহয় মদ-টদ খেতে বসে গেছে।'

'তারপর?' ওরা দুজনে একসঙ্গেই প্রশ্ন করল। হরিনাথ পাল বললেন, 'তারপর ওই মেসেজ দেখে এই দশমিনিট আগে সবাই ওয়ারিয়ার দিকে দৌড়ল। আমার আবার দৌড়োদৌড়ি, খুনজখম ওসব ভালো লাগে না। মাইতিসাহেব সেটা জানেন। উনি বললেন, হরি! তুমি তাহলে সিমবায়োটিকে চলে যাও। মনে রাখবে, যতক্ষণ আমি না ফিরছি, তুমিই স্টেটকে রিপ্রেজেন্ট করছ। কেয়ারফুল থাকবে।'

কথাটা বলতে-বলতেই হরিনাথবাবু হাতের ধাক্কায় একটা কাচের বিকারকে টেবিল থেকে মেঝেতে ফেলে ভাঙলেন। বিরক্তমুখে বললেন, 'জায়গাটা বড্ড ছোট, তাই না? এদের পয়সা আছে, রুচি নেই। ওই তো খাবার এসে গেছে। রাখুন, এখানে রাখুন।'

যে মেয়েদুটি খাবারের প্যাকেট, জলের বোতল ইত্যাদি নিয়ে এসেছিল, তারা সেগুলো নামিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরোবার আগেই হরিনাথবাবু তাঁর বিশাল থাবায় একটা প্যাকেটের যাবতীয় স্যান্ডুইচ, পেস্ট্রি, সন্দেশ সব একসঙ্গে মুখে পুরে চিবোতে শুরু করলেন। অনির্বাণ আর সত্যপ্রিয় বসাক নিজেদের খাওয়া ভুলে, তাঁর ওই বকরাক্ষস মূর্তি দেখছিল আর মনে-মনে ভাবছিল এর উপস্থিতিতে বাকি কাজটা সারবে কেমন করে।

তবে ঈশ্বর করুণাময়। খাওয়া শেষ করেই হরিনাথ পাল বললেন, 'বিছানাটা দেখে লোভ সামলাতে পারছি না, বুঝলেন। আমি জাস্ট একটু চোখদুটো বুজে গড়িয়ে নিচ্ছি। এরা কোনোরকম নন-কো-অপারেশন করলেই আমাকে ডাকবেন।' এই বলে তিনি সেই হসপিটাল কটের ওপরে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন এবং পাঁচমিনিটের মধ্যে প্রবল নাক ডাকিয়ে স্টেটকে রিপ্রেজেন্ট করতে শুরু করলেন।

সত্যপ্রিয় বসাক একঢোক জল খেয়ে পেপার-ন্যাপকিনে হাত মুছতে-মুছতে বললেন, 'বাঁচা গেল। চলো অনির্বাণ। আমরা কাজটা শেষ করে ফেলি।'

অনির্বাণ একটু কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'স্যার। আপনার কাজ নিয়ে বসার আগে একটু এই ছবিগুলো দেখে যাবেন? এগুলোর কি কোনো গুরুত্ব আছে? তাহলে কপি নেব।'

'কী ছবি? দেখি।' সত্যপ্রিয় বসাক ঘরের অন্য কোনে, যেখানে অনির্বাণ বসে কাজ করছিল সেদিকে এগিয়ে গেলেন এবং দেখলেন ডেস্কটপ ছেড়ে অনির্বাণ একটা ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছে। এটা নাকি একটা আলমারির ভেতরের দিকে রাখা ছিল। অনির্বাণ পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, 'বসুন স্যার। ল্যাপটপটা ডক্টর কামাথ ইউজ করতেন। কিন্তু এর মধ্যে একটা ফাইল বানিয়ে রেখেছেন, যেটার নাম—Titli's Darlings। তিতলির প্রেমিকেরা। আমি ভাবলাম ব্লু টাইপের কিছু হয়ে সে যাক। খুলে দেখি একগাদা পোকা আর মাকড়ের ছবি। আপনি একবার দেখুন তো।'

প্রফেসর মণ্ডল মনিটরের দিকে চেয়ারটা আরেকটু এগিয়ে নিলেন। মিনিট পাঁচেক ভালো করে দেখার পর উনি বললেন, 'সবগুলোই তো দেখছি কোনো না কোনো প্যারাসাইটের host-এর ছবি। অ্যাকচুয়ালি, প্যারাসাইট এদের শরীরে ঢুকে গেছে; সেই অবস্থাতেই ছবিগুলো তোলা হয়েছে। তবে ডক্টর কামাথ ফাইলের নামটা ভুল কিছু দেননি। একটু আগে বলছিলাম না, তিতলি এই প্যারাসাইট গুলোকে চুমু খায়।'

অনির্বাণ বলল, 'স্যার, আমি কিন্তু আই.টি.-র স্টুডেন্ট। প্যারাসাইট ব্যাপারটা যদিও বা আবছা-আবছা বুঝি, host কথাটা তো একেবারেই বুঝছি না।'

'বলছি। প্রাণী জগতে বহু প্যারাসাইট আছে যারা বেঁচে থাকবার জন্যে অন্য কোনো প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল। যাদের ওপর প্যারাসাইট নির্ভর করে সেই প্রাণীগুলোকেই বলা হয় host। একেকটা প্যারাসাইটের হোস্ট নির্দিষ্ট থাকে। মানুষের উকুন যেমন গরুকে ধরে না আবার গরুর গায়ের এঁটুলি মানুষকে কামড়ায় না, বুঝলে?'

'এখন প্যারাসাইট দু'রকম ভাবে হোস্টদের ব্যবহার করতে পারে। এক, সেই হোস্ট এবং প্যারাসাইট নির্বিবাদে সারাজীবন একসঙ্গে কাটাতে পারে। তখন প্যারাসাইটগুলো হোস্টের শরীরটুকু স্রেফ বাসা বাঁধার জন্যে ব্যবহার করে, কিম্বা বড়জোর সামান্য পুষ্টি চুরি করে। তাতে হোস্টের কোনো ক্ষতি হয় না। আমাদের শরীরের মধ্যেও এরকম অজস্র ব্যাকটেরিয়া বাসা বেঁধে আছে। তাদের মধ্যে অনেকে আমাদের উপকারই করে। আমাদের খাবার হজম করতে সাহায্য করে।'

'দ্বিতীয় ধরনের প্যারাসাইটরা কিন্তু হোস্টকে মেরে ফেলে নিজেরা বেড়ে ওঠে। সরাসরি মেরে ফেললে বোধহয় হোস্টদের যন্ত্রণা কম হত। কিন্তু অনেক সময়েই প্যারাসাইটরা তা করে না। তারা নিজেদের সুবিধে মতন হোস্টকে দিয়ে স্বভাববিরোধী নানান কাজ করিয়ে নেয়। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় প্যারাসাইটরা যেন সম্মোহনবিদ্যা জানে। না হলে নিজেদের থেকে লক্ষগুণ বড় হোস্টদের দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করায় কেমন করে?

'এই ফাইলের ছবিগুলোতে এরকমই কিছু হতভাগ্য হোস্টের ছবি দেখা যাচ্ছে।

'এই ছবিটা দেখো। এটা একটা শামুক। দেখলে মনে হবে কোথাও কোনো গন্ডগোল নেই, শুধু শুঁড়দুটো কেমন যেন ডোরাকাটা আর স্বাভাবিকের চেয়ে বড়। কিন্তু ও আসলে অলরেডি একজাতের প্যারাসাইটকে ক্যারি করছে। এই প্যারাসাইটগুলো লার্ভা অবস্থায় শামুকের শরীরে বাসা বাঁধে কিন্তু বড়বেলাটা কাটায় পাখির পেটে। তাহলে একসময় না একসময় তো ওদের শামুকের শরীর ছেড়ে পাখির পেটে ঢুকতে হবে। আর তাহলে পাখিকে শামুক খেতে হয়। কিন্তু পাখি যে মোটেই শামুক খেতে ভালোবাসে না। তাহলে কী করা?

'ওই প্যারাসাইট লার্ভারা যেটা করে, সেটা হল, দল বেঁধে শামুকের শুঁড়ে উঠে বসে থাকে। তখন শামুকের শুঁড়গুলো মোটা হয়ে ফুলে ওঠে। শুধু তাই নয়, কী যেন এক অদ্ভুত উপায়ে লার্ভাগুলো শুঁড়ের রংটাকেও পালটে সবুজ আর হলুদ ডোরা ডোরা করে দেয়। তারপর শামুকটাকে এমন হিপনোটাইজ করে যে সে ব্যাটা গাছের মাথায় উঠে এই নতুন চেহারার শুঁড়দুটোকে আচ্ছাসে নাড়াচাড়া করতে শুরু করে। সব মিলিয়ে তখন ওর শুঁড়দুটোকে মনে হয় দুটো পুরুষ্টু শুঁয়োপোকা, যে শুঁয়োপোকা আবার পাখিদের ভারি পছন্দ। ব্যস, তারপরে আর কী? পাখিতে শামুকের শুঁড় ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পোরে। শামুকটা মরে, কিন্তু লার্ভাগুলো পাখির পেটের ডেস্টিনেসনে পৌঁছে যায়।'

প্রফেসর মণ্ডলের বিবরণ শুনতে-শুনতে অনির্বাণের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। ও বলে উঠল, 'থাক থাক। আর টলারেট করতে পারছি না। ঠিক আছে স্যার, আপনার চেনা জিনিস যখন, তখন এটার আর কপি নিচ্ছি না।'

'দরকার নেই। তুমি বরং একটা কাজ করো অনির্বাণ। এই সমস্ত স্যাম্পেলের কন্টেনারের গায়ে কোড লেখা আছে দেখছ তো? আমি তোমাকে একটা একটা করে কোড বলে যাচ্ছি। তুমি খুঁজে দেখো, ডাটাব্যাঙ্কের মধ্যে সেই কোডের এগেনস্টে কোনো ডেসক্রিপশন খুঁজে পাও কিনা। পেলেই আমাকে বলবে, কেমন?'

অনির্বাণ বলল, 'ঠিক আছে স্যার। আপনি শুধু একটু চেঁচিয়ে বলবেন। হরিপাল-লোকাল যেরকম সিটি মারছে তাতে কিছু শুনতে পাওয়া মুশকিল।'

হরিনাথ পালের নাকের গর্জন বেড়েই চলেছিল।

## নয়

মোবাইলটা সাইলেন্ট-মোডে রাখা ছিল ঠিকই, তবু বিপ্রদাস মাঝে-মাঝেই সেটা পকেট থেকে বার করে দেখছিল। সব থেকে ভালো হত যদি ব্যাক-আপ টিমটা চলে আসত। যদি কোনো কারণে দেরিও হয়, সেটাই একটু ফোন করে জানাতে পারে তো। অবশ্য জানাবেই বা কেমন করে? টাওয়ারই তো নেই।

হঠাৎই দশটা নাগাদ বিপ্রদাস দেখল টাওয়ার ফিরে এসেছে। খুবই উইক-সিগনাল যদিও, তবু এসেছে। সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, যদি মাইতিসাহেব কিম্বা সুজিতের কোনো মেসেজ ঢোকে। না। ঢুকল না। ব্যাপারটা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না বিপ্রদাস। সুজিতকে দিয়ে থানায় খবর পাঠিয়েছে, সেও তো প্রায় একঘণ্টা হয়ে গেল। হাতের চেটোর আড়ালে ফোনটাকে লুকিয়ে সে খুব দ্রুত মাইতিসাহেবকে কয়েকটা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠাল কী হল স্যার আপনাদের? আমি যে লিখে পাঠালাম, আর্জেন্ট চলে আসুন। ওরা তো পালাবার প্ল্যান করছে।

সত্যিই তখন মিশিরজির কোঠার ভেতরে-বাইরে কিছু ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছিল। কিছু-কিছু ঘরে আলো জ্বলে উঠছিল। নিভেও যাচ্ছিল একটু পরেই। দুয়েকজন মেয়ে দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি মেরেই আবার ভেতরে

ঢুকে যাচ্ছিল। বিপ্রদাস আরেকটা হোয়াটস-অ্যাপ মেসেজ পাঠাল। এবার সুজিতকে। 'সুজিত, তুই কি মাইতিসাহেবের হাতে চিঠিটা দিতে পেরেছিস?'

দিব্যদৃষ্টি থাকলে বিপ্রদাস বুঝতে পারত, এই মেসেজটা বৃথা গেল। সুজিতের গাড়িটা তখন মিশিরজির কোঠা থেকে বড়জোর এক মাইল দূরে, ওয়ারিয়া স্ল্যাগ-ব্যাঙ্কের একটা বড় খানার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। গাড়ির পেছনের সিটে পিছমোড়া বাঁধা অবস্থায় শুয়েছিল সুজিত। জ্ঞান ছিল না তার। কানের পেছন থেকে রক্তের একটা সরু ধারা নেমে এসে সিট-কাভারটাকে ভিজিয়ে তুলছিল। রাস্তা থেকে গাড়ি কিম্বা ড্রাইভার, কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না। ওই খানাটার উল্টোদিকে একটা স্ল্যাগের টিলার ওপরে কালো অয়েল-ক্লথে মাথা মুখ ঢেকে বসেছিল তিনজন লোক। তারা কেউই নিরস্ত্র ছিল না। পুলিশের গাড়ির কনভয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল তারা।

সাড়ে-দশটার সময় বিপ্রদাস ওদিক থেকেই প্রথম বোম চার্জের নীল ঝিলিকটা দেখতে পেল। পেটো ফাটার ভোঁতা শব্দটাও কানে এল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই। চালাঘরটার ভেতর থেকে ঘুমন্ত কুকুরটা ছিটকে বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর এলাকার বাকি কুকুরদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তারস্বরে ডাকতে শুরু করল। বস্তির বাসিন্দারা কেউ বেরোলো না। ওরা এধরণের বোমবাজির শব্দে জন্ম থেকেই অভ্যস্ত।

বিপ্রদাস ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, অনেকগুলো জোরালো টর্চের আলোর রশ্মি বৃষ্টির চাদরের গায়ে এলোমেলো ছুরি চালাতে শুরু করেছে। থ্রি-নট-থ্রির ফায়ারিং-এর আওয়াজও কয়েকবার কানে এল। একটু নিশ্চিন্ত হল বিপ্রদাস। টিম এসে গেছে। কিন্তু এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, বিল্টুবাবুর লোকেরা ওদের রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছে। ওই রেজিস্ট্যান্স পেরিয়ে এখানে পৌঁছতে ঠিক কতটা সময় নেবেন মাইতিসাহেব?

সময় যে বড় কম।

ওই তো, দশাসই বিল্টুবাবুর কনুইটা আঁকড়ে ধরে তিতলি দৌড়ে মিশিরজির কোঠা থেকে বেরিয়ে এল। এত অন্ধকারের মধ্যেও তিতলির চুমকিগাঁথা শাড়িটা ঝিকমিক করে উঠল। বিল্টুবাবু আর মেয়েটা উঠে গেল পেছনের ল্যান্ড-রোভারটায়। ওদের পেছন পেছন-পেছনই বেরিয়ে এল আরেক ছোকরা। রোগা, লম্বা। এ কি কোঠির পাহারাদার? তাই হবে। অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না, মনে হল ছেলেটার হাতে একটা অ্যাটাচিকেস রয়েছে। সেটা নিয়ে ও মার্সিডিজটায় উঠে বসতেই দুটো গাড়িরই ইঞ্জিন রাগি চিতাবাঘের মতন গুড়গুড় আওয়াজ করে উঠল।

পরক্ষণেই মার্সিডিজটা স্টার্ট নিল। ল্যান্ডরোভারটাও রাস্তায় উঠবার আগে ব্যাকগিয়ারে একটু পিছিয়ে গেল।

চুলোয় যাক ব্যাক-আপ-ফোর্স। চুলোয় যান মাইতিসাহেব। বিপ্রদাস ট্রাউজারের পেছনে ভিজে হাতের চেটোদুটো মুছে নিয়ে দু-মুঠোয় সার্ভিস-রিভলবারটা চেপে ধরে রাস্তায় উঠে এল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই গাড়ির পেছনের সিটের ডানদিকের দরজা খুলে একটা ছেলে নেমে এল। ক্রুদ্ধস্বরে জিগ্যেস করল, 'কওন বে? নাশেমে হ্যায় কেয়া?'

বিপ্রদাস চোখের কোন দিয়ে দেখল মার্সিডিজটা তিরবেগে ছুটে পালাচ্ছে। ওদিক দিয়েও জি.টি. রোড ধরা যায়, তবে সেক্ষেত্রে জি.টি. রোডে উঠতে হয় দুর্গাপুর শহর ছাড়িয়ে। ওই গাড়িটাকে ওরা আর হাতে পাবে না।

না পাক, ক্ষতি নেই। ওই গাড়িটায় সেরকম কেউ নেই। বিল্টুবাবু আর তিতলি দুজনেই আছে এই ল্যান্ডরোভারটায়। এটাকে আটকে রাখতে হবে অ্যাট এনি কস্ট।

কে যেন বিপ্রদাসের কানে কানে প্রশ্ন করল, 'ইভন অ্যাট দা কস্ট অফ ইয়োর লাইফ, বিপ্র?'

বিপ্রদাস মনে-মনে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। দরকার হলে তাই। ওই দুগগিবাজ মেয়েটাকে আমি পালাতে দেব না'।

তারপরেই সে চিৎকার করে গাড়ি থেকে নেমে-আসা গুন্ডাটার কথার উত্তর দিল। বলল, 'জানিস তো ভালো করেই আমি কে। হাত তোল। হাত তুলে রাখ শয়তানের বাচ্চা! এই! তোমরাও গাড়ি থেকে এক

এক করে নেমে আমার সামনে দাঁড়াও। কোনো চালাকির চেষ্টা করবে না। তোমাদের পেছনে কিন্তু আমাদের আরো ফোর্স আছে।'

মিথ্যে বলেনি বিপ্রদাস। সত্যিই দূরে কয়লাবস্তির রাস্তা-বরাবর তখন চার-পাঁচটা গাড়ির হেডলাইট দেখা যাচ্ছিল। তার মানে বিল্টুবাবুর পোষা-গুন্ডাদের হঠিয়ে দিয়ে থানার ফোর্স এইবার এদিকে আসছে। তবে আসছে খুব ধীরে। গাড়ির দুলুনির সঙ্গে-সঙ্গে হেডলাইটের আলোগুলো একেকবার আকাশের দিকে উঠছে, আবার পাতালের দিকে নামছে।

তবু, কতক্ষণ আর লাগবে ওদের এখানে পৌঁছতে। পাঁচ মিনিট। সাত মিনিট বড়জোর। সেই সময়টুকু কি বিপ্রদাস বিল্টুবাবুদের আটকে রাখতে পারবে না?

বিল্টুবাবু গাড়ির কাচ নামিয়ে মাথা বাড়াল। বলল, 'এই আখতার। এসব নৌটঙ্কি দেখবার সময় নেই আমাদের। চল, গাড়িতে ওঠ।'

বিপ্রদাস দেখল, আখতারের একটা হাত, যেটা এতক্ষণ শরীরের পেছনে রাখা ছিল, সেটা সামনে চলে এল। ওই একহাতেই একটা খতরনাক টাইপের লম্বাটে বন্দুক বিপ্রদাসের বুকের দিকে তাক করে রেখে ও এক-পা, দু-পা করে গাড়ির দিকে পেছোতে শুরু করল। পেছোতে-পেছোতে যেই অন্যহাতটা দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছে, সেই এক-মুহূর্তের অন্যমনস্কতার সুযোগে বিপ্রদাস আখতারের কাঁধে একটা গুলি করেই রাস্তা ধরে দৌড় দিল। চারটে পুলিশ-জিপের প্রথমটা তখন ওর থেকে মাত্র একশোমিটার দূরে।

বিপ্রদাস নিজের টিমের নিরাপত্তায় অনায়াসেই পৌঁছে যেতে পারত, যদি না একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতো। যদি না দেখত যে, গুলি খাওয়ার পরেও গাড়িটা থেকে কেউ নামেনি। বরং ওরা পালাতে শুরু করেছে। ও পরিষ্কার বুঝতে পারল, পুলিশের পুরোনো উইলি-জিপগুলো কিছুতেই আর ওই ল্যান্ডরোভারের নাগাল পাবে না।

দৌড় থামিয়ে বিপ্রদাস উল্টোদিকে ফিরে হাঁটু ভাঁজ করে খোলা-রাস্তার ওপরে বসে পড়ল। তারপর উরুর ওপরে কনুইটাকে সাপোর্ট দিয়ে ল্যান্ডরোভারের পেছনের একটা টায়ারকে টিপ করে গুলি চালাল।

কিন্তু বিপ্রদাস যেটা দেখেনি, সেটা হল, শীতল নামের সেই দ্বিতীয় হেঞ্চম্যানটি ড্রাইভারের পাশের সিটের জানলা থেকে অর্ধেক শরীর বাইরে ঝুঁকিয়ে দিয়ে ওর দিকে বন্দুক তাক করেছে। নিজেকে বাঁচানোর কোনো সুযোগই পেল না বিপ্রদাস। বুলেটটা সরাসরি এসে ওর ভাঁজ করে রাখা ডানদিকের সিনবোনটাকে কয়েকটা টুকরো করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সামনের গাড়িটা থেকে সুধীর মাইতি নেমে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলেন। জ্ঞান হারানোর আগে প্রবল নসিয়ার মধ্যেও বিপ্রদাস একটা কথাই মাইতিসাহেবকে বলতে পারল। 'ল্যান্ডরোভারটাকে আটকান। ওটার মধ্যে তিতলি যাদব আছে।'

একটা গাড়ি অচৈতন্য সুজিত আর বিপ্রদাসকে নিয়ে দুর্গাপুর হাসপাতালের দিকে রওনা হয়ে গেল। অন্য তিনটে গাড়ি চেজ করল ল্যান্ডরোভারটাকে। ওটা তখন ফুলস্পিডে হাইওয়ে ধরে কলকাতার দিকে দৌড়চ্ছিল। গাড়িটাকে ওরা ধরতে পারল প্রায় দেড়ঘণ্টা বাদে, ডানকুনি টোলগেটে।

ইতিমধ্যে হাইওয়ে পেট্রলের কাছেও খবর পৌঁছে গিয়েছিল। সুধীর মাইতির টিম ওখানে পৌঁছনোর আগেই ওরা ল্যান্ডরোভারের আরোহীদের বেঁধেছেঁদে রাস্তার পাশের একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সুধীর মাইতি ঘরটায় ঢুকে দেখলেন, আখতার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ওর বাঁ-কাঁধে একটা মেকসিফট ব্যান্ডেজ। শীতল আর গাড়ির ড্রাইভার হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় এককোনে বসে আছে। বিল্টুবাবু উকিলকে ফোন করছে। তবে এসব গৌণ। যাকে দেখে সুধীর মাইতির বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, সে হচ্ছে গাড়ির মহিলা আরোহিনীটি যাকে ধরার জন্যে আজ তিনজন মানুষের রক্তপাত হল।

না, এ তিতলি যাদব নয়। এও লম্বা, এও শ্যামলা। তিতলির মতোই এরও পিঠের ওপরে দীর্ঘ বিনুনি। কিন্তু এর মুখের চামড়া ঝকঝকে পরিষ্কার। কোথাও অ্যাসিড-অ্যাটাকের চিহ্ন নেই। মেয়েটি নাকি ইতিমধ্যেই

বলেছে তার নাম জিনা ছেত্রী। সে মিশিরজির কোঠায় গত দশবছর ধরে শরীর বিক্রি করছে। আজ বিল্টুবাবু আর কোঠার মাসির হুকুমে তাকে এই গাড়িতে চাপতে হয়েছিল। বাকি আর কিছুই সে জানে না।

তুমুল ক্ষোভে সুধীর মাইতি তাঁর পায়ের কাছে পড়ে-থাকা একটা বিয়ারের খালি ক্যানকে লাথি মেরে উড়িয়ে দিলেন। এমনভাবেই ওড়ালেন যাতে সেটা গিয়ে বিল্টুবাবুর মাথার পেছনে লাগে। তারপর বাইরে বেরিয়ে এলেন। নভেম্বরের রাত তিনটের ঠান্ডা হাওয়াতেও তাঁর মাথার আগুন নিভছিল না। তিনি মনে-মনে ভাবছিলেন, পুরুষের পোশাক পরা তিতলি যাদবকে নিয়ে এতক্ষণে মার্সিডিজটা কতদূরে গেল? খুব বেশিদূর যাবার দরকার নেই অবশ্য। দুর্গাপুর থেকে মাত্র আধঘন্টার দূরত্বে অন্ডাল-এয়ারপোর্ট। রাত একটা-কুড়িতে মুম্বইয়ের প্রথম ফ্লাইট ছাড়ে।

তিনি নিজের টিমকে রিট্রিটের অর্ডার দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। ড্রাইভারকে বললেন সোজা সিমবায়োটিকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে। তারপর দুর্গাপুর ডিভিশনের অ্যাডিশনাল এস পিকে ফোনে আজকের পুরো ঘটনাটা ব্রিফ করে বললেন, যদি মুম্বই এয়ারপোর্ট থেকে তিতলিকে অ্যারেস্ট করা যায় একটু দেখুন।

এস পি বললেন, 'চার্জশিট বানিয়েছেন? মিস যাদবের ক্রাইমটা কী? আমার তো আপনার আগের দিনের কথা শুনে মনে হচ্ছিল, উনি নিজেই অ্যাসিড অ্যাটাকের ভিকটিম। তাহলে মুম্বাই পুলিশকে কোন গ্রাউন্ডে বলব ওকে আটকাতে?'

সুধীর মাইতি চুপ করে রইলেন।

এস.পি. বিরক্ত গলায় বললেন, 'আজকে আপনার টিমের ওপরে অ্যামবুশের সময় সিনে উনি ছিলেন? ছিলেন না। শুনুন মাইতিসাহেব, আপনি আগে কেসটা সাজান। তারপর আমি দেখছি।' এই বলে ফোন রেখে দিলেন।

ভোর পাঁচটায় সুধীর মাইতি আবার প্রদীপ কামাথের ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেন। চোখদুটো লাল, চুল উস্কোখস্কো। ইউনিফর্ম তখনো ভিজে এবং জায়গায় জায়গায় কাদা মাখা। ঘরে ঢুকেই উনি ঘুমন্ত হরিনাথ পালের কাঁধে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে বিছানা থেকে নামিয়ে দিলেন। বললেন, 'নীচে গাড়ি আছে। ওটা নিয়ে বেরিয়ে যাও।' তারপর সত্যপ্রিয় বসাকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যরি স্যার। বড্ড ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম। বলুন, এদিকে আপনাদের প্রোগ্রেস কী? কী বুঝলেন?'

সত্যপ্রিয় বসাক কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে মাইতিসাহেবের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বুঝতে পারছি আপনার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তাই যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বলে শেষ করছি। প্রথমে একটা কথা বলে দিই। এই ল্যাবরেটরির মধ্যে ক্রাইম একটা ঘটে গেছে এ-কথা ঠিক। তার এভিডেন্স হিসেবে যা-যা আপনাদের কাজে লাগতে পারে, আমি আর অনির্বাণ মিলে সব গুছিয়ে রেখেছি। তার মধ্যে ওই ল্যাপটপ আর দুটো সি.পি.ইউ. ও থাকবে। আর থাকবে ওই ক্রায়োজেনিক কন্টেনারটার মধ্যে যা-যা গুছিয়ে রেখেছি, সব। সবক'টা আইটেমেই সিরিয়াল-নাম্বার দিয়ে মার্কিং করে রেখেছি, যাতে আপনার সিজার-লিস্ট বানাতে অসুবিধে না হয়।

'এবার বলি শুনুন। ডক্টর কামাথ ইনফার্টিলিটির লাইনে কোনো কাজই করেননি। জানি না, উনি সিমবায়োটিকের কর্তৃপক্ষের কাছে কী রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে উনি ওই কাজ করেননি।'

সুধীর মাইতি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে গত ছ'মাস ধরে উনি কী নিয়ে এত কাজ করেছেন? কী নিয়ে পাতার পর পাতা ওয়ার্কিং শিট বানিয়েছেন?'

প্রফেসর বসাক কম্পিউটারের সামনের চেয়ারটা ছেড়ে উঠে গেলেন ঘরের এক কোণে রাখা সেই হিমায়িত পাত্রটার সামনে, যেটার ভেতরে রাখা টেস্টটিউবগুলো দেখতেই তিনি এর আগে অনেকটা সময়

কাটিয়েছেন। ঢাকনাটা খুলতেই ভেতর থেকে সাদা ভাপ বেরিয়ে এল। উনি ঝুঁকে পড়ে পাত্রের ভেতর থেকে খুব সাবধানে চার-পাঁচটা টেস্টটিউব তুলে নিয়ে অনির্বাণ আর সুধীর মাইতির সামনে ফিরে এলেন। বললেন, 'ওই ওয়ার্কিং-শিটে এদের কথাই আছে। নাও আই অ্যাম শিওর অ্যাবাউট দেয়ার আইডেনটিটি।'

উনি আবার কিছুক্ষণ মন দিয়ে টেস্টটিউবের গায়ের কোডেড লেবেলগুলো দেখলেন। তারপর সেগুলো ওদের দুজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'যদি জিন-এডিটিং কিছুমাত্র বুঝে থাকি, তাহলে ওঁরা কাজ করছিলেন এইগুলোর ওপরে। যদিও এরা স্পার্মের চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু অনেক হাজার বছর ধরে এদেরও বিচরণভূমি স্ত্রীলোকের যোনিপথ।'

আলাভোলা মানুষটার গলার স্বরে সেই মুহূর্তে এমন একটা কিছু ছিল যে, সুধীর মাইতির শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। সে শুকনো গলায় জিগ্যেস করল, 'ওগুলো কী স্যার?'

টেস্টটিউবগুলো যথাস্থানে রেখে দিয়ে উনি বললেন, 'কয়েকটা মারাত্মক যৌন রোগের ব্যাকটেরিয়া। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সিফিলিস। ডক্টর কামাথ, কিম্বা তিতলি, মোস্ট প্রোব্যাবলি তিতলিই, এগুলোকে বদলে দিয়েছে। কিন্তু বদলে দেওয়ার পরে এদের চরিত্র যে কী দাঁড়িয়েছে, তা তো মানুষের শরীরে প্রয়োগ না করে বলা যাবে না। আর সেই পারমিশন কেউ দেবেও না। বাট ইট ইজ আ ডেঞ্জারাস গেম। সাক্ষাত মৃত্যুদূতদের নিয়ে তিতলি এখানে খেলা করছিল।'

## দশ

এইসব ঘটনার পরে তিনটে বছর কেটে গেছে। তিন বছরে বাইরের দুনিয়ায় অনেক অদল-বদল ঘটে যায়। মানুষের মন অত সহজে বদলায় না।

দুর্গাপুরের কোক আভেন থানায় পুরোনো স্টাফেরা প্রায় কেউই আর নেই। সুধীর মাইতি এখন হুগলিতে পোস্টেড। বিপ্রদাস কলকাতায়।

প্রদীপ কামাথের ল্যাবরেটরি থেকে সেদিন পুলিশ যা-যা সিজ করে এনেছিল, কোর্টের নির্দেশে সবই রিলিজ করে দিতে হয়েছে। দীর্ঘদিন মামলা চলেছিল এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ অবধি গড়িয়েছিল সেই মামলা। কিন্তু মহামান্য হাইকোর্টের বক্তব্য ছিল খুব পরিষ্কার। গবেষণার মধ্যবর্তী স্তরে একজন বিজ্ঞানীর হাত দিয়ে ক্ষতিকারক কোনো বাইপ্রোডাক্ট তাঁর অজান্তে তৈরি হয়ে যেতেই পারে। কিন্তু তিনি কি সেই ক্ষতিকারক প্রোডাক্ট বাজারে ছেড়েছেন? প্রয়োগ করেছেন কারুর ওপরে? তা যদি না হয়, তাহলে অপরাধটা কোথায়? দ্বিতীয়ত, ল্যাবরেটরিটার দায়িত্বে যখন ছিলেন প্রদীপ কামাথের মতন একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, তখন তিতলি যাদবকে এর জন্যে দায়ী করা কষ্টকল্পনা করা ছাড়া আর কিছু নয়। আর, তৃতীয় এবং সবচেয়ে বড় ঘটনা হল ডক্টর কামাথ আর ইহলোকেই নেই। ফলে মামলার অভিযুক্ত কে?

মামলা ডিসমিস হয়ে গিয়েছিল। সামান্য হলেও কালো দাগ লেগেছিল সুধীর মাইতি এবং ইনভেস্টিগেটিং অফিসার বিপ্রদাস মণ্ডলের সার্ভিস রেকর্ডে।

বিজন উপাধ্যায় সেই শুট-আউটের ঘটনার তিন-মাসের মাথায় মারা গিয়েছিলেন। মৃত্যুটা এসেছিল বেশ আশ্চর্যজনক ভাবে।

সেদিনের শুট-আউটের পরে বিজন উপাধ্যায় ওরফে বিল্টুবাবুকেও বেশিদিন হাজতে ধরে রাখা যায়নি। পুলিশের ওপরে গুলি চালানোর অভিযোগে তার দুজন শাগরেদের সাজা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু বিল্টুবাবুর বিরুদ্ধে সেরকম জোরালো চার্জশিট দেওয়া যায়নি। কারণ প্রথম গুলিটা তার দলের লোকেরা চালায়নি, চালিয়েছিল থানার সেকেন্ড অফিসার বিপ্রদাস মণ্ডল। বিল্টুবাবু যে-তিনজন দুঁদে উকিলকে নিয়োগ

করেছিলেন তাঁরা সওয়াল করেছিলেন, ভয় পেয়ে, আত্মরক্ষার জন্যে ওর সঙ্গীরা গুলি চালিয়েছিল। উপরন্তু অস্ত্রগুলোর লাইসেন্স ছিল।

তিনমাসের মাথায় জামিন পেয়েছিলেন বিল্টুবাবু। তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মহা উৎসাহে কয়েকজন চ্যালাচামুণ্ডাও গাড়ি নিয়ে জেলখানার গেটে হাজির ছিল। কিন্তু বিল্টুবাবু সেদিন জেলখানার গেট থেকে বেরিয়ে, সোজা একটা চলন্ত ট্রাকের সামনে দু-হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। লোহার ট্রাকের চাকার নীচে তার শরীরটা পিষে গিয়েছিল।

বিপ্রদাস সেদিনের কাগজটা হাতে নিয়ে সুধীর মাইতির ঘরে ঢুকেছিল। বলেছিল, 'খবরটা দেখেছেন, স্যার? আবার সুইসাইড। এও তিতলির সঙ্গে শুয়েছিল কিন্তু।'

সুধীর মাইতি বিপ্রদাসের দিকে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'ভুলে যাও। আউট অফ প্রোপোরশন কথাটা শুনেছ? এই কেসটা ছিল আউট অফ প্রোপোরশন। আমাদের নাগালের বাইরে। আমাদের মুঠোর চেয়ে অনেক বড়। আমরা কেন, পৃথিবীর ক'টা পুলিশ-ডিপার্টমেন্ট এই কেসকে সলভ করতে পারবে আমার সন্দেহ আছে। কাজেই জাস্ট ফরগেট ইট।'

বিপ্রদাস খবর পেয়েছিল, মৃত বিজন উপাধ্যায়ের ধর্মপত্নী যমুনা দেবী উপাধ্যায় আসানসোল কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন, তিতলি যাদব নামে এক গণিকা তাঁর মৃত স্বামী বিজন উপাধ্যায়কে ভুল বুঝিয়ে তাঁর কয়েক কোটি টাকা নিয়ে পালিয়েছে। যমুনাদেবীর উকিলেরা তিতলির এগেইনস্টে জোর করে সম্পত্তি লিখিয়ে নেওয়ার এবং আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ সাজিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই প্রমাণ করতে পারেননি। বরং উল্টোদিকে এমন অনেক প্রমাণ ছিল, যার থেকে মনে হয়, বিজন উপাধ্যায় তার বেশিরভাগ টাকা সজ্ঞানে বিদেশের কোনো গোপন অ্যাকাউন্টে ট্র্যান্সফার করে দিয়েছেন। কার নামে তা জানা যায়নি আর অভিযুক্তা তিতলি যাদবও নিখোঁজ। ফলে সেই কেসটাও ডিসমিস হয়ে গেছে।

তারপরেও তিন বছর কেটে গেল। তবু বিপ্রদাস কিছুতেই তিতলি যাদবের কথা ভুলতে পারে না। সমস্ত কাজের মধ্যে, সব অবসরের বেলায়, তাকে খেপিয়ে তোলে একটাই চিন্তা। তিতলি তাকে শুধু বোকাই বানিয়ে যায়নি, সারা জীবনের জন্যে খোঁড়া করে দিয়ে গেছে। গুঁড়িয়ে যাওয়া পায়ের হাড়গুলো কোনোদিনই আর আগের অবস্থায় ফিরবে না আর সে-ও কোনোদিন অ্যাক্টিভ-পুলিশ-সার্ভিসে যোগ দিতে পারবে না। তাকে ট্রেনিং-অ্যাকাডেমিতে ক্লাস নিতে হবে কিম্বা আর্মারির মতন নিরাপদ জায়গার দায়িত্ব নিয়ে একটা ঘরে চুপ করে বসে থাকতে হবে।

সে ভাবে, যদি কোনোভাবে একবার জানতে পারতাম আত্মহত্যাগুলোর সঙ্গে ওর যোগ ঠিক কোথায়, তাহলে দেখিয়ে দিতাম কত ধানে কত চাল।

শুধু এইজন্যেই বিপ্রদাস কাউকে না জানিয়ে একটা কাজ করেছিল। সে পটারি-বস্তিতে পয়সা দিয়ে একজন ইনফর্মারকে ফিট করেছিল। কাজটা সে পুলিশ হিসেবে করেনি। এটা তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, খরচটাও সে করত নিজের পকেট থেকে। কারণ, কীভাবে যেন তার মনে হয়েছিল, যখন হোক, তিতলি একবার ওই ছেড়ে যাওয়া এঁদো ঘরটায় ফিরবে। একবছর হোক, দু-বছর হোক, দশবছর হোক। দরকার হলে সারা জীবন বিপ্রদাস অপেক্ষা করবে। ওই ঘরটায় একবার তিতলির মুখোমুখি হতে চাইছিল সে।

সেইজন্যেই বলেছিলাম, মানুষের মনের ভেতরটা অত সহজে বদলায় না।

তিনবছরের মাথায়, যখন বিপ্রদাস প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে, তখন একদিন বিকেলে সেই ইনফর্মার ছোকরা চুপিচুপি তার অফিসঘরে ঢুকে বলল, 'স্যার, একজন মেয়েমানুষ ঘরটার তালা খুলে ঢুকেছে। কিন্তু তিতলিদিদি কিনা বলতে পারছি না।'

বিপ্রদাস অবাক হয়ে বলল, 'সেকি রে! তোর তিতলিদিদিকে তো তিন মাইল দূর থেকে দেখলে চেনা যায়। চিনতে পারছিস না মানে?'

'না স্যার। আপনি একবার গিয়ে দেখুন। অনেকটা তিতলিদিদির মতোই তো লাগল, কিন্তু।' ছেলেটা আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা না করে বেরিয়ে চলে গেল। বিপ্রদাস তার দক্ষিণ কলকাতার অফিস থেকে মেট্রো ধরে দমদমে এসে নামল। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। বছরের যে-ক'টা দিনে এই বস্তির গলিগুলোর মধ্যেও হাওয়া ঢোকে, সেরকম এক বসন্তের সন্ধে। বিপ্রদাস ঘরটার দরজায় নক করল। ভেতর থেকে নারীকণ্ঠে উত্তর এল, 'খোলা আছে। ঢুকে পড়ুন।'

বিপ্রদাস ভেজানো দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকে আবার সাবধানে পাল্লাদুটো ভেজিয়ে দিল। ঘরে একটামাত্র চৌকি। তার ওপরে সস্তার বেডকাভার। আর একটা কাঠের চেয়ার। মহিলাটি ওই চৌকির ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন। পা দুটো হাঁটু থেকে ভাঁজ করে রেখেছিলেন, তাই শাড়ি নেমে গিয়ে নিটোল দুই জঙ্ঘা উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। যেন নরম পলিমাটি দিয়ে গড়া দুটো প্রদীপের পিলসুজ। তিনি একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। তারপরেই ধড়মড় করে উঠে বসলেন। বললেন, 'ছোটবাবু! আপনি এই অভাগা তিতলিকে ভোলেননি? তাকে দেখতে এসেছেন! এ আমার কি সৌভাগ্য ছোটবাবু!'

বিপ্রদাস অবাক হয়ে বলল, 'আপনি তিতলি!'

'বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি যদি তিতলি না হই, তাহলে আপনাকে চিনলাম কেমন করে? বসুন। ওই চেয়ারটায় বসুন।'

বিপ্রদাস চেয়ারটায় বসে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছল।

মহিলা বললেন, 'আমিই তিতলি যাদব। অবশ্য এখন সমস্ত কাগজপত্রে আমার নাম টিমোথি র‍্যান্ডেল। মুখটা দেখে সন্দেহ করছেন তো। ও কিছু না। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি একটা ইনস্টিটিউটে প্লাস্টিক সার্জারি করিয়েছিলাম। সে-ও হয়ে গেল প্রায় আড়াইবছর।'

সত্যিই তিতলির মুখের সেই বিভৎস পোড়া দাগ অনেকটাই মিলিয়ে গেছে। এমনকি ডান চোখের খোবলানো জায়গাটাও খুব সুন্দর একটা নকল চোখ দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। খুব সুন্দর দেখতে লাগছে ওকে।

ব্যাপারটা বোধগম্য হওয়ামাত্র বিপ্রদাসের হতচকিত ভাবটা কেটে গিয়ে ফিরে এল সেই জমিয়ে-রাখা ঘৃণা। সে বলল, 'দামি ইনস্টিটিউটে অপারেশনটা বিল্টুবাবুর টাকায় করিয়েছিলেন তো?'

'ঠিক বলেছেন। তাছাড়াও মেলবোর্নে একটা ছোট বাড়ি আর লাইব্রেরি বানানোর খরচও উঠে গিয়েছিল। তবে তারপরেই হাত খালি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি তো প্যারাসাইট। নতুন হোস্ট খুঁজে বার করতে আমাদের সময় লাগে না। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, আপনি টিমোথি র‍্যান্ডেল কিম্বা হ্যারিস র‍্যান্ডেলের নাম শোনেননি, তাই না?'

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়ল। বলল, 'শোনা উচিত ছিল কি?'

তিতলি বলল, 'না। আমারই ভুল। আপনার তো বায়োসায়েন্সের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। তবে প্যারাসাইটোলজির ফিল্ডে আমি আর আমার স্বামী দুজনে মিলে অনেকগুলো পাথ-ব্রেকিং কাজ করেছি। আমার স্বামীর নাম ছিল হ্যারিস র‍্যান্ডল। বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। ওঁর আন্ডারেই মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করেছিলাম।'

'পাস্ট টেন্স ইউজ করছেন কেন?' প্রশ্ন করল বিপ্রদাস।

'উনি রিসেন্টলি মারা গেছেন। খুব প্যাথেটিক ডেথ। নিজের ল্যাবরেটরিতেই একটা জারের মধ্যে শ-খানেক পাহাড়ি কাঁকড়াবিছে রাখা ছিল। সেগুলো কীভাবে যেন ছাড়া পেয়ে ওঁকে ছেঁকে ধরেছিল। আশ্চর্যের বিষয়, উনি চেঁচাননি। আমি অবশ্য পুলিশকে বলেছিলাম, উনি প্রবল চিৎকার করেছিলেন। বলেছিলাম, আমি নিজেও বিছেগুলোকে তাড়াবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। আসলে করিনি। করিনি, কারণ হ্যারিস নিজেই জার খুলে ওগুলোকে নিজের গায়ে ঢেলে নিয়েছিল।'

বিপ্রদাস ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'তিননম্বর আত্মহত্যা?'

'এগজ্যাক্টলি। প্রদীপ কামাথ। বিজন উপাধ্যায়। হ্যারিস র‍্যান্ডেল। তিনজন।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? আবার আমি কয়েক-লাখ ডলারের মালিক।' তিতলি খিলখিল করে হেসে উঠল।

হাসতে-হাসতেই তিতলির মুখটা যেন কেমন করুণ হয়ে উঠল। সে এই প্রথম বিপ্রদাসকে 'তুমি' সম্বোধন করে বলল, 'তুমি এত বেশি বোঝো কেন বিপ্রদাস? যদি বুঝতেই পারো, তাহলে এই সামান্য মুখপোড়া মেয়েটার ওপরে এত রাগই বা পুষে রেখেছ কেন? তুমি বুঝতে পার না, প্যারাসাইটদের নিজের ক্ষমতা নেই বলেই তারা প্যারাসাইট হয়। আমার নিজের কী ছিল বলো। কিছুই না। তাহলে আমি কী করব? আমার কি ভালো থাকার ইচ্ছে থাকবে না?'

বিপ্রদাস বলল, 'শোনো তিতলি। ইচ্ছে থাকলেও আমি আর তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারব না। বুঝতে পারছি, তুমি এখন অনেক উঁচুতে উঠে গেছ আর আমি ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছি। শুধু একটা উপকার কর। একবার শুধু বলে যাও, আমি যা সন্দেহ করেছিলাম তা সত্যি। আজ কোলিগদের মধ্যে অনেকেই আমাকে ব্যঙ্গ করে। আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। বলে, আমি নাকি একটা গল্প বানিয়ে সবাইকে ছুটিয়ে মেরেছিলাম। তুমি বলো, ওগুলো গল্প ছিল না।'

তিতলি বিপ্রদাসের চোখে চোখ রেখে বলল, 'একেবারেই গল্প ছিল না। এবং আমি তোমাকে বলছি বিপ্রদাস, তোমার মতন ইনটেলিজেন্ট মানুষ, তোমার মতন স্টিলের নার্ভওলা পুরুষমানুষ আমি জীবনে দেখিনি। তুমি যা ভেবেছিলে সবই সত্যি। তোমার জন্যেই আমাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হল। এখানে থাকলে তুমি একদিন না একদিন আমাকে ধরতেই। তুমি জানো, আর কোথাও কোনো প্রমাণ না থাকুক, আমার শরীরের ভেতরে সব প্রমাণ পাওয়া যাবে। তুমি সেই রাস্তাই নিতে।'

বিপ্রদাসের মুখে অনেকদিন বাদে সুখের হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, 'আমার ধারণাগুলো আমি বলে যাই, তিতলি। কোথাও যদি ভুল করি, তুমি আমাকে ধরিয়ে দিও।'

'তুমি প্রথমে সিমবায়োটিকের ল্যাবরেটরিতে যৌনরোগের বীজাণুর জিন-এডিটিং করেছিলে। সেই বীজাণুগুলো হয়ে গেছিল অন্যরকমের ক্ষমতাসম্পন্ন প্যারাসাইট। তুমি নিজের শরীরে ওদের ঢুকিয়ে নিয়েছিলে।'

'ওরা যৌনরোগের বীজাণুর মতনই তোমার যোনির মধ্যে বাস করে আর সঙ্গমের পর ছড়িয়ে পড়ে পুরুষমানুষের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে। তখন সেই পুরুষ শুধু তোমার কথাই শোনে। তোমার মঙ্গলকামনা ছাড়া তার মাথায় আর কিছুই থাকে না; নিজের ভালোমন্দের কথাও ভুলে যায়। অথচ বাইরে থেকে তাদের দেখলে কিছুই বোঝা যায় না।'

তিতলি সম্মতি জানিয়ে ঘাড় হেলাল।

বিপ্রদাস বলে চলল, 'তুমি হয়তো অত তাড়াতাড়ি নিজের শরীরে ওদের ঢুকতে দিতে না। আরো কিছু সময় নিতে। চেষ্টা করতে, কোনো ভলান্টিয়ারের শরীরে অল্পমাত্রায় ওদের প্রয়োগ করে দেখতে। কিন্তু আমার ধারণা, তার আগেই প্রফেসর কামাথ তোমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন।'

তিতলি বলল, 'হ্যাঁ, আমি যে ওনার অ্যাবসেন্সে ল্যাবরেটরিটা ব্যবহার করছিলাম, সেটা উনি সেটা ধরে ফেলেছিলেন।'

বিপ্রদাস বলল, 'বাধ্য হয়েই প্রফেসর কামাথকে বশ করার জন্যে ওর সঙ্গে তুমি সহবাস শুরু করলে। এটাও হয়তো ওই প্যারাসাইট-প্রদত্ত ক্ষমতা। তুমি কোনো পুরুষকে ডাকলে সে না করতে পারে না। তারপর তোমার শরীর থেকে বীজাণু ছড়িয়ে পড়ল ওঁর মাথায়। উনি তখন আর সবদিক দিয়ে স্বাভাবিক, শুধু তোমার কাছে ভেতরে-ভেতরে উনি ক্রীতদাস। এবার তুমি নিশ্চিন্তে তোমার গবেষণার বাকি কাজটা শেষ করার দিকে মন দিলে।'

তিতলির ঠোঁটের কোনায় একটা বিষাক্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বলল, 'এইটুকুই চেয়েছিলাম বিপ্রদাস। যে বীজানুগুলো আমার মাকে মেরে ফেলেছিল, সেই বীজাণুগুলোকে দিয়েই আমি আমার একটার পর একটা ইচ্ছে পূরণ করব। ছোটবেলায় আমার মা যখন সুরেশ সিংকে শরীর দিত, তখন আমি এই নোংরা ঘরটার মেঝেয় উপুড় হয়ে শুয়ে দেখতাম, কেমন করে একটা ছোট্ট বোলতা তার চেয়ে দশগুণ বড় একটা আরশোলাকে শুঁড় ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আরশোলাটা বুঝতেও পারছে না যে, তার জন্যে কী বীভৎস মৃত্যু অপেক্ষা করছে। আমি চেয়েছিলাম ওই প্যারাসাইটদের মতনই মাইন্ড কন্ট্রোলের ক্ষমতা। এবং সেটা পেয়েছিলাম।'

বিপ্রদাস বলল, 'কিন্তু ভাগ্য তোমাকে তখনই আরেকবার মারল। সুরেশ সিং তোমার মুখটা অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেল। লাকিলি, তুমি যেখানে গিয়ে উঠলে সেটা একটা প্রস-কোয়ার্টার এবং আবারো লাকিলি, সেখানে তুমি পেয়ে গেলে তোমার দ্বিতীয় শিকার বিজন উপাধ্যায়।'

তিতলি বলল, 'বেচারা বিল্টুবাবু। সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র পুরুষ, যে একজন কুৎসিত মেয়ের জন্যে প্রাণ দিল।'

বিপ্রদাস তিতলির নিষ্ঠুর মন্তব্যটা হজম করতে একটুসময় নিল। তারপর বলল, 'এইমাত্র জানলাম, শুধু টাকা নয়, তোমার ছোটবেলার স্বপ্ন পাণ্ডিত্য তার অধিকারও তুমি পেয়ে গিয়েছ তোমার এই প্যারাসাইটের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে। এনটিমোলজিস্টদের জগতেও তুমি আর ব্রাত্য নও। অবশ্য জানি না, ঠিক কোন পাপে মিস্টার র‍্যান্ডেলকে মরতে হল। ওঁর কানে কেন তুমি সুইসাইডের মন্ত্র দিলে। কেন উনি কাঁকড়াবিছের জারের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন।'

তিতলি বলল, 'উনি বীজাণুগুলোকে চিনে ফেলেছিলেন যে। নিজের শরীর থেকে ওদের সংগ্রহ করে ওদের জিন অ্যানালিসিস করিয়েছিলেন। আর বেশি দেরি করলে উনি আমাকে ধরিয়ে দিতেন।'

'বুঝলাম। শুধু আজও যেটা বুঝতে পারি না, ওরা সুইসাইড করে কেন?'

তিতলির মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'এটাই আমার আবিষ্কারের একমাত্র দুর্বল জায়গা। আমি অনেক চেষ্টা করেও এটাকে ঠিক করতে পারিনি। তিনমাসের বেশি আমার শরীরের স্বাদ না পেলে, প্যারাসাইট-আক্রান্ত পুরুষের শরীরের ভেতরের জীবাণুগুলো একরকমের হর্মোন ক্ষরণ করতে শুরু করে, যে-হর্মোন মানুষকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেয়। এটা আমি আন্দাজ করেছিলাম প্রদীপ কামাথের ঘটনায়। ভেবে দেখো, মৃত্যুর আগের তিনমাস উনি আমাকে পাননি। কনফার্মড হলাম বিল্টুবাবুর আত্মহত্যার কথা জেনে। হিসেব করো, আমার পালিয়ে যাওয়ার ঠিক তিনমাসের মাথাতেই ও সুইসাইড করেছিল। আর এই ফেনোমেননটাকে কাজে লাগালাম মিস্টার র‍্যান্ডেলের বেলায়। তিনটে মাস আমি ইচ্ছে করেই ওকে আমার শরীর ছুঁতে দিইনি। তারপরেই ও সুইসাইড করল।'

বিপ্রদাস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বন্ধ ঘর। কোথাও কোনো জানলা দরজা খোলা নেই, তবু হঠাৎই একটা নেশা-ধরানো গন্ধে ঘরটা ভরে উঠল। তিতলির ডানচোখের নকল মনির ভেতর দিয়ে একটা নীলচে আলোর ঝলক বেরিয়ে এল।

বিপ্রদাস নাক কুঁচকে বলল, 'এটা কীসের গন্ধ? সঙ্গমের রাসায়নিক আহ্বান? তোমার ব্যাকটেরিয়া-ইনফেক্টেড শরীর থেকে বেরোচ্ছে? ডাকছ আমাকে?'

তিতলি বোধহয় এই প্রথম নিজের অস্ত্রকে বিফল হতে দেখল। সে অবাক হয়ে বিপ্রদাসের দিকে তাকিয়ে রইল। বিপ্রদাস বলল, 'শোনো তিতলি। মনে হচ্ছে, তোমার এই সম্মোহন তাদের ওপরেই কাজ করে যারা তোমাকে পেতে ইচ্ছুক। প্রফেসর কামাথ ছিলেন কামুক ধরনের মানুষ। বিজন উপাধ্যায়ও তাই। আর বৃদ্ধ প্রফেসর র‍্যান্ডেল তো তোমার মতন তরুণীর প্রেমে পাগল হয়েই ছিলেন। কিন্তু আমি তো তোমাকে ঘৃণা করি। আমার ওপরে তোমার সম্মোহন কাজ করবে না।'

তিতলি দু-পা এগিয়ে এসে বিপ্রদাসের হাত ধরে বলল, 'এখন তাহলে কী করবে? তুমি কি আমাকে ধরিয়ে দেবে?'

বিপ্রদাস বলল, 'জানি না কী করব। শরীরের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। তার-ওপরে তুমি নিশ্চয় এখন আর ভারতের নাগরিকও নও। তোমার অনিচ্ছায় তোমার শরীরের পরীক্ষা তো আমরা কেউ করতে পারব না। আর সেটা না করলে প্রমাণও করা যাবে না যে তুমি আসলে একটি প্যারাসাইট।'

তিতলি হঠাৎ পাগলের মতন হাসতে শুরু করল। খিলখিল হাসিতে লুটিয়ে পড়ল বিছানার ওপরে। বিপ্রদাস ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক হয়ে বললে, 'কী হল?'

কোনোরকমে হাসি থামিয়ে তিতলি বলল, 'তুমি আমাকে যত বড় গবেষক ভাবছ, তত বড় গবেষক আমি নই স্যার। আর তুমি নিজে যতটা মনস্তত্ত্ব বোঝো বলে ভাবছ, ততটা বোঝো না। না-হলে আমাকে একবার অন্তত জিগ্যেস করতে, আমি এই ঘরটায় আজ ফিরে এসেছি কেন।'

বিপ্রদাস অবাক হয়ে বলল, 'এসব কথার মানেই তো আমি বুঝছি না।'

'এই দেখো।' তিতলি বিপ্রদাসের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে, ঘাড়ের ওপর থেকে চুলের গুছিটা দু-হাতে সরিয়ে ধরল। বিপ্রদাস দেখল, তিতলির ঘাড়ে একটা দগদগে ঘা। সে প্রশ্ন করল 'এর মানে?'

'মানে? মানে হচ্ছে, জেনেটিকালি মডিফাই করেও যৌনরোগের বীজানুগুলোর মধ্যে থেকে তাদের মূল চরিত্র পালটাতে পারিনি। হয়তো তারা প্যারাসাইটের মতন মাইন্ড-কন্ট্রোল শিখেছে, কিন্তু একইসঙ্গে মেয়েদের কুরে কুরে খেয়ে নিতেও পারে। আমার মাকে যেমন খেয়েছিল, আমাকেও ঠিক সেইভাবেই খাচ্ছে।

'আমি খুব অসুস্থ বিপ্রদাস, বিশ্বাস কর। পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন এ জীবনে আর পূরণ হবে না। কতদিন আর বাঁচব? এক মাস, বড় জোর দু-মাস। মরার আগে একবার আমার মায়ের ঘরটা দেখতে এসেছিলাম।'

তারপর হঠাৎই আকুল হয়ে বিপ্রদাসের বাহুটা আঁকড়ে ধরে তিতলি বলল, 'আচ্ছা, আমি মরে যাওয়ার পরে তুমি কি সবাইকে সব কিছু বলে দেবে? আমার শরীরটা নিয়ে তোমরা কাটা ছেঁড়া করবে?'

বিপ্রদাস এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর খুব নিরাসক্ত গলায় বলল, 'নাঃ! তার আর দরকার কী? শরীরটা ছাই হয়ে গেলে তার ভেতরের প্যারাসাইটগুলোও তো মরে যাবে, তাই না?'

তিতলির বাঁ-চোখ থেকে একটা জলের ফোঁটা গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছিল। সেই অবস্থাতেই সে বলল, 'ঠিক। ঠিক।'

